আজকের আমেরিকা

ভূপর্যটক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পর্যটক প্রকাশনা ভবন
১৫৬, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীমাধবেন্দ্র মিত্র
পর্যটক প্রকাশনা ভবন
১৫৬, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

মূল্য— তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৪১
দ্বিতীয় সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৪৩
তৃতীয় সংস্করণ—এপ্রিল, ১৯৪৫

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মুদ্রাকর
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বোস প্রেস
৩০, ব্রজ মিত্র লেন, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিংগাপুর হতে রওয়ানা হয়ে মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন, কোরিয়া, জাপান হয়ে কেনেডা যান। কেনেডা হতে ফেরার পথে তিনি ফিলিপাইন দ্বীপ এবং বালী হয়ে জাভায় পৌঁছেন। জাভা হতে তিনি ফের সিংগাপুরে এসে ব্রহ্মদেশ হতে ভ্রমণ শুরু করে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লাবানন, তুর্কী, বুলগেরিয়া, যুগশ্লাভিশা, হাংগেরী, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, জার্মেনী, হলেণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ডে যান। তথা হতে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে দেশে ফিরেন এবং তারপর শরীর ঠিক করে আফ্রিকায় গিয়ে কেনিয়া, উগানডা, টাংগানিয়াকা, ন্যাসালেণ্ড, উত্তর এবং দক্ষিণ রডেসিয়া, পর্ত্তুগীজ—পূর্ব আফ্রিকা, ট্রান্সভাল, নাটাল, কেইপ প্রভিন্স হয়ে আবার লণ্ডন যান এবং তথা হতে ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা এবং কেনেডা ভ্রমণ করে ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগে দেশে ফিরেন।

আজকের আমেরিকার বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থকার অনেক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেছেন, এবং "হলিউডের আত্মকথা"য় আমেরিকায় বাকি ভ্রমণটুকু প্রকাশ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

কলিকাতা,
এপ্রিল, ১৯৪৫

প্রকাশক

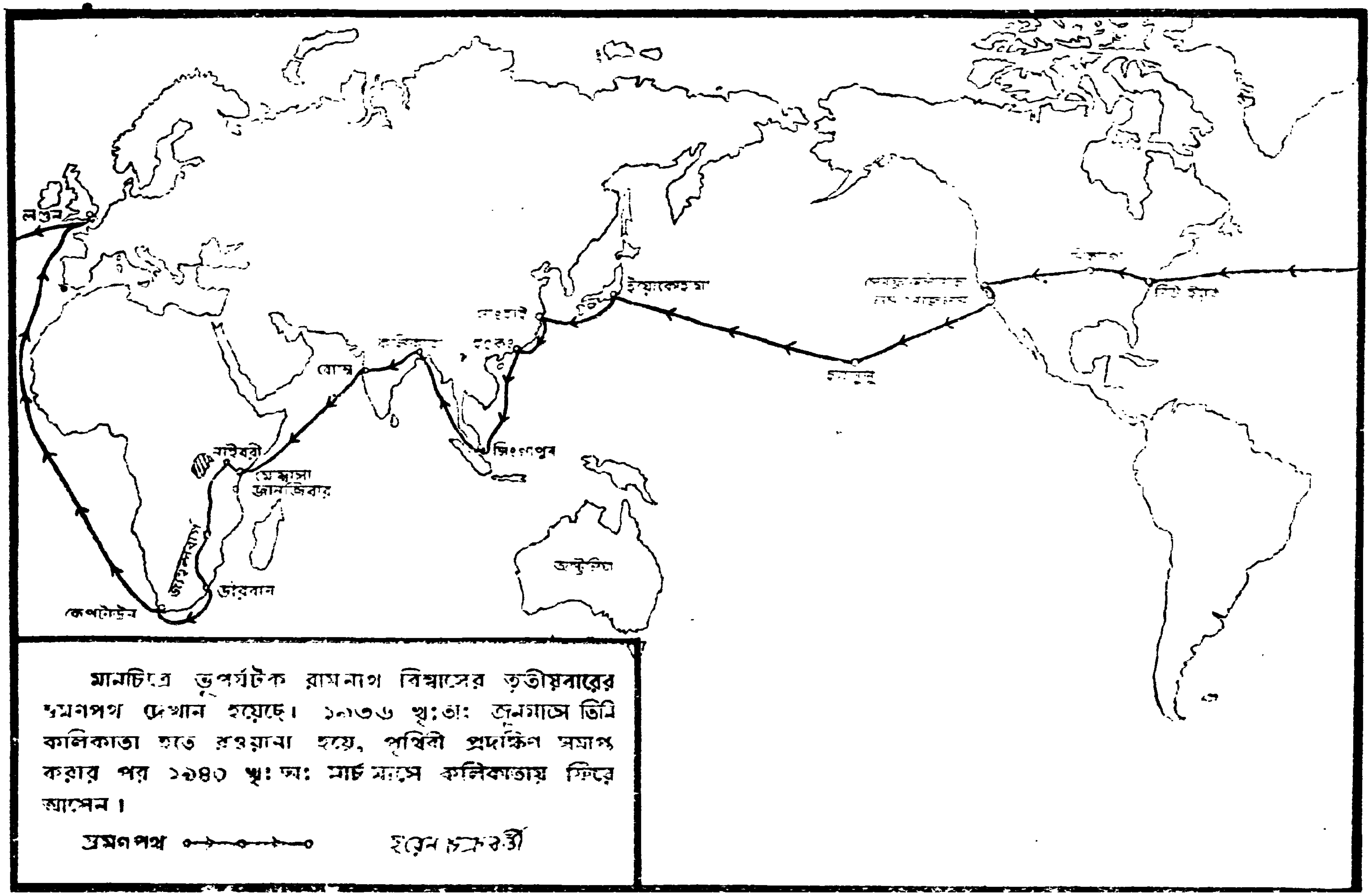

মানচিত্রে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের তৃতীয়বারের ভ্রমণপথ দেখান হয়েছে। ১৯৩৬ খৃঃঅঃ জুনমাসে তিনি কলিকাতা হতে রওয়ানা হয়ে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করার পর ১৯৪০ খৃঃ অঃ মার্চ মাসে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

ভ্রমণপথ ০—৮—০—৮—০

হরেন চক্রবর্তী

আজকের আমেরিকা

——)ঃ০ঃ(——

আমেরিকার পথে

আমি একজন ভবঘুরে। পৃথিবীতে দেখেছি অনেক, জেনেছি অনেক। আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিবার মত যদি কিছু থাকে দেশবাসী হয়ত তা গ্রহণ করবেন, সেই আশা নিয়েই পুনরায় আমি আমার যাযাবর জীবনের কাহিনী লিখতে বসেছি।

এবার আমি আমার আমেরিকা ভ্রমণের কথা এখানে বলব। আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, জর্জ ওয়াশিংটন ও লিন্‌কনের কথা এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধি এই দেশটি দেখবার জন্যে আমার অন্তরে একটা তীব্র আবেগ জাগিয়ে রেখেছিল। এতদিন পরে যখন সেই আমেরিকার পথে পা বাড়ালাম মন তখন আশা ও আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কেনেডা থেকে একবার আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার কারণ দেখান হয়েছিল—আমি গরিব, গরিবের স্থান কেনেডায় নাই। আসল কথা তা নয়, আমি ভারতবাসী ; তাই ইমিগ্রেসন বিভাগের সু-নজরে পড়তে পারিনি। আমার উপর কড়া হুকুম হল কেনেডা ছেড়ে চলে যাবার

জন্য। আমেরিকা যাবার ইচ্ছা আমার মোটেই দমল না। ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে যখন দরকারী টাকা যোগাড় করতে সমর্থ হলাম, তখন আমেরিকা যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা হতে আমেরিকায় যাবার পথ আমার রুদ্ধ ছিল। আমাদের দেশের দক্ষিণ আফ্রিকার এজেন্ট জেনারেলগণ সে কথা ভাল করে জানতেন কিন্তু কখনও এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করেন নি। যদি তাঁরা প্রতিবাদ করতে যেতেন, তবে তাঁদের নিশ্চয়ই কাজে ইস্তফা দিতে হত। চাকরির মায়া ছেড়ে যদি চার পাঁচজন এজেন্ট জেনারেল এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করতেন, তবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়ার সরকারের কান খাড়া হয়ে উঠত। ভারতের গণ্যমান্য লোক বুঝতেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা। ফলে হয়ত আমাদের কষ্টের অনেকটা প্রতিকার হত।

আমাদের দেশের লোক শুনেছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে "কালার বার" আছে। তার স্বরূপ কি তা অনেকেই বুঝতে পারে না, যারা বুঝেছে তারা আবার বলতেও চায় না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের মাঝে দুটি দল আছে; সে দল হিন্দু-মুসলমানের নয়—কংগ্রেস এবং কলোনিয়্যাল-বর্ণ (Colonial Born)। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কলোনিয়্যাল-বর্ণ অর্থাৎ উপনিবেশে জাতদের দল এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্মদাতা হলেন মিঃ মণীলাল গান্ধী। পিতা যা গড়েছেন পুত্র তা ভাংতে না পেরে নতুন দল গঠন করেছেন। আমি এই দুটা প্রতিষ্ঠান হতেই পৃথক্‌ভাবে থাকবার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি।

অনুনয় বিনয় করার অভ্যাস আমার নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস দল কিন্তু তার অনেকটা পক্ষপাতী। 'কালার বার' যারা নীরবে সহ্য করতে পারে, তারা অনুনয় বিনয়ের পক্ষপাতী না হয়ে

নায় কোথায় ? যাদের আত্মসম্মান বোধ নাই, তারা মোটেই বুঝতে পারে না – অনুনয় বিনয় মানসিক অধোগতির একটা প্রত্যক্ষ ফল। আমি খাঁটি মানুষের সংগে থেকে সে তথ্য বুঝতে পেরেছিলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অবস্থিতির সময়ই বুয়ার সরকার কংগ্রেসীদলকে স্বীকার করেছিলেন। কলোনিয়্যাল-বর্ণ এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে এখনও স্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না। স্বীকার না করার নানা কারণও আছে। যত লোক কালোনিয়্যাল-বর্ণ, তারা হল ইউরোপীয়ান মেজাজের। ইউরোপীয়ান ধরণে খাওয়া-পরা ত আছেই, উপরন্তু এদের মেজাজটা নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকায় কংগ্রেস এবং বুয়ার সরকার একটু বিপদে পড়েছেন। এখন ইউরোপীয়ান মেজাজ কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলি। আমাদের দেশে লণ্ডনের গাওয়ার স্ট্রীট ফেরতা বাবুদের দেখে আমরা বলি তারা ইউরোপীয়ান মেজাজী হয়েছেন। আসলে কিন্তু তা নয়। হ্যাট কোট পরলে এবং মদ খেলেই যদি ইউরোপীয়ান মেজাজ হত, তবে গাধাও সিংহ হয়ে যেত। অনেক স্কচ্-ম্যান্ পর্যন্ত Inferiority of complexion হতে বাদ পড়ে না ; কিন্তু তারাও আমাদের দেশে বড়লাট হয়। Inferiority of complexion যদি দূর করতে হয়, তবে সকল সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়, মরতে হয় তাও বরণ করে নিতে হয়। মাথা নত না করাই হল ইউরোপীয় মেজাজ। দক্ষিণ আফ্রিকায় কলোনিয়্যাল-বর্ণরা সে দলের লোক। তারা ভাল করেই জেনেছে ভারতীয় জাতিভেদ ভারতের কত অনিষ্ট করেছে, তাই তারা জাতিভেদ মোটেই মানে না। তারপর তারা এটাও বুঝতে পেরেছে কালার বার মানুষকে কত খাট করে ফেলে। তাই আজ তারা মানুষ বলে পরিচয় দেয় এবং মানুষের প্রাপ্য সম্মান তারা আজ যদি না পায় একদিন তারা তা আদায় করবেই। তারা তাদের দাবী মিটাবার জন্য

কারো কাছে কিছুই ভিক্ষা চায় না অথবা সাহায্য পাবার জন্য প্রত্যাশাও রাখে না।

যাদের জন্ম ভারতে হয়েছে কিংবা ভারতে যারা অনেক দিন থেকেছে তাদের মতিগতি অন্য ধরণের। তারা ধর্মের কথা বলে, টাকা জমায় এবং আরও ধনী হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ঔপনিবেশিকরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সভা করে, দরকার হলে লড়াই করে, তারপর বুয়ার সরকারকে মাঝে মাঝে হুমকাও দেখায়। মহাত্মা গান্ধী তাদেরই অনুগ্রহে দক্ষিণ আফ্রিকাতে সত্যাগ্রহ করে কৃতকার্য হয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলতে পারি না, অনিচ্ছায় সেই দলেই মিশে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

ডারবান, ইস্টলণ্ডন, পোর্ট এলিজাবেথ এবং কেপ্‌টাউনই হল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ বন্দর। যাত্রী জাহাজ ডারবান এবং কেপটাউনে ছুঁয়ে থাকে। কার্গোবোটগুলি অন্য দুই বন্দরে নিয়মিতভাবে এসে দাঁড়ায়। আমেরিকা যাবার ভিসা পেয়েছিলাম, জাহাজ ভাড়ার টাকা পকেটে ছিল, তবুও আমার পথ বন্ধ ছিল। ধর্ম আমাকে এখানে সাহায্য করতে পারে না, আমার টাকা এখানে অচল, কারণ টাকারও মূল্যের তারতম্য আছে। সাদা লোকের হাতে আমারই হাতের টাকা যখন চলে যায় তখন তার মূল্য বাড়ে। অবশ্য এরূপ তারতম্য অনেকে পছন্দ করেন না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি অনেক ইংলিশম্যান্ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একগুঁয়েমী করে এর প্রতিকার করবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগেন, কিন্তু রোগের কারণ না জেনে ঔষধ দেওয়ায় যে ফল হয় এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়ে থাকে।

ডারবানে আমেরিকা যাবার টিকেট কেনার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু টিকেট কেনা আমার দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। জাহাজের এজেন্টরা

কেউ বলে, সকল বার্থই ভাড়া হয়ে গিয়েছে, গতকল্য যদি আসতেন তবে নিশ্চয়ই একটা বার্থ পেয়ে যেতেন। কেউ বলে আগামী ছয় মাসের জন্য সমগ্র জাহাজটাই ভাড়া হয়ে গেছে। এসব কথা শুনে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। বন্ধুবান্ধবদের কাছে সাগর পার হবার উপায় খোঁজবার ভার দিয়েছিলাম এবং নিজেও খুঁজতেছিলাম।

রেডিওতে লেকচার দেওয়া তখন আমার একটা পেশা হয়ে গিয়েছিল, কারণ সকলেই বিদেশের খবর শুনতে বড়ই উৎসুক ছিল। ডারবানে এসে টিকেট কেনার কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে মন দিতে পারিনি কিন্তু হঠাৎ একদিন একজন রেডিও ব্রোকার বলল যে, প্রধান এনাউন্সার হলেন একজন প্রাক্তন সৈন্য এবং অনেক জাহাজ কোম্পানীর লোকের সংগে তার সম্বন্ধও রয়েছে। হয়ত রেডিওতে লেকচার দিলে তিনি জাহাজের টিকেট কেনার কোনরূপ সুবিধা করে দিতে পারেন। আমি তৎক্ষণাৎ ডারবানের বেতারে লেকচার দিতে স্বীকৃত হলাম। লেকচার দিবার পর প্রধান এনাউন্সার আমার টিকেট কেনায় সাহায্য করেন। তিনি যদি টিকেট কিনতে আমাকে সাহায্য না করতেন, তবে আমাকে অন্য কোন উপায়ে বিলাত যেতে হ'ত।

টিকেট কেনা হয়ে গেলে ইস্টলণ্ডন হয়ে পোর্ট এলিজাবেথ হতে কেপটাউনে যাই এবং সেখান থেকে ক্যাসেল লাইনের যাত্রী জাহাজে সাউথহামটনের দিকে রওনা হই।

কেপটাউনে আমাকে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। কেপটাউন দেখার জন্য অনেক আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান লালায়িত। এতে কেউ সফলকাম হয়, আর কেউ হয় না। যারা কেপটাউন দেখার চেষ্টা করে কৃতকার্য হয়নি, তারাও কেপটাউন সম্বন্ধে বই লিখেছে; সেরূপ বই আমি পাঠ করেছি। দেখেছি, যারা কেপটাউন না দেখেই বই লিখেছে, তাদের

লেখাতে অনেক সার কথা রয়েছে। আর যারা কেপটাউন দেখে বই লিখেছে তাদের লেখায় অনেক এলোমেলো ভাব রয়েছে। আমি যখন কেপটাউন সম্বন্ধে বই লিখব, হয়ত তখন অনেক এলোমেলো ভাব তাতে থাকবে, কিন্তু তাতে দুঃখ নাই। কেপটাউন স্বচক্ষে দেখতে পেরেছি এই আনন্দেই আমার বুক ভরা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি আঁকার ইচ্ছা আজ আমার হচ্ছে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকদিন থাকবে। কিন্তু মানুষের মনের ভাব বদলায় অতি সত্বর। সেই পরিবর্তনশীল মনকে জানতে আমি পছন্দ করি। কেপটাউন সম্বন্ধে যখন কিছু লেখব তখন আজকের দিনের কথাই লেখব আর যারা ভবিষ্যতে সুখময় পৃথিবীতে আসবে তারা তুলনা করে দেখবে তাদের পূর্বপুরুষ কত বর্বর ছিল।

এখনও কয়েকটা কাজ আমার বাকি রয়েছে তা সমাপ্ত করতে হবে। প্রথম কাজ হল, যে পন্চাশ পাউণ্ড জমা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রবেশ করেছিলাম, তা ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয় কাজ হল, দেখতে হবে কেবিনটি কোথায়।

টাকার রসদটা ফিরিয়ে দিবার সময় তাতে প্রাপ্তিস্বীকারের স্থানে নাম সই করে দিলাম এবং পাউণ্ডগুলি গুণে পকেটে রেখে বিদায় নিলাম। কেবিনটা দেখে বেশ আনন্দই হল। কেবিনে আর একজন লোক ছিলেন, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী। দুঃখের বিষয় যখন আমি কেবিন দেখতে গিয়েছিলাম তখন তিনি কেবিনে ছিলেন না। কেবিন হতে বাইরে এসে আমার কেপটাউনের বন্ধুবান্ধবদের সংগে কথা বলতে লাগলাম। মিঃ কল্যাণজী (হিন্দু সভার পৃষ্ঠপোষক), মিঃ কেশব (হিন্দু সভার সেক্রেটারী), মিঃ পালসেনীয়া (কেপটাউনের কংগ্রেসের সেক্রেটারী) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কতকগুলি স্কোলী বালকও

(Scholl Boys) আমার মমতা ত্যাগ করতে পারেনি। তারা ডকের উপর দাঁড়িয়ে নানারূপ শ্লোগান বলতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনখানা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি একসংগে এসে আমার বিদায় বাণী ও মন্তব্য শুনতে চাইলেন। আমি তাদের বললাম, "দক্ষিণ আফ্রিকার জল এবং ফলের তুলনা অন্য কোন দেশের জলের এবং ফলের সংগে হয় না। জোহান্সবার্গের স্বর্ণ-খনি এবং কিম্বার্লির হীরার খনি জগৎ বিখ্যাত ; কিন্তু ঐ 'কালার বারটা" আমার মোটেই সহ্য হয়নি। "কালার বারের" দুর্গন্ধ নাক হতে ছাড়াবার জন্য লণ্ডনে গিয়ে অনেক দিন থাকতে হবে এবং যে পর্যন্ত কালার বারের দুর্গন্ধ নাক হতে না যায় সে পর্যন্ত লণ্ডন পরিত্যাগ করব না।

"আমি জানতাম না কালার বার কেমন হয়। এখন জেনেছি এবং বুঝেছি কালার বার কাকে বলে। এতে আমার যদিও ক্ষতি হয়েছে অনেক, কিন্তু শিক্ষা হয়েছে ক্ষতির চেয়েও বেশী। আমি জগতে এসেছি ছাত্র হয়ে, আজীবন ছাত্রই থাকব তাই যতদূর পারি শুধু শিখে নিতেই চাই।

"জগতের লোক, বিশেষ করে যারা ধর্ম নিয়ে চর্চা করে, তারা বলে পূর্বে জগৎ ভাল ছিল এখন খারাপ হয়েছে কিন্তু তারা বুঝে না কিংবা বুঝতে চেষ্টাও করে না জগৎ যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। জগতের উন্নতির গতি বুঝবার উপায় আছে এবং উন্নতি যাতে হয় তার চেষ্টাও করা দরকার। নিরপেক্ষ মানুষেরা এবং স্বাধীনচেতা লোকেরা তাই বলবে। ধর্মের ঘাড়ে সকল দায় চাপিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। ধর্মগুলি জগতকে উন্নতির পথে অনেক টেনেছিল, কিন্তু ধর্মের তেজ ক্ষণস্থায়ী। দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারিত কালো, ব্রাউন এবং বাদামী একত্র হও, যাতে মানুষ বলে পরিচয় দিতে পার। ধর্ম তোমাদের সাহায্য

করবে না. করতেও পারে না, উপরন্তু তোমাদের মাঝে ভাংগন এনে দিবে। ইউরোপীয়ানরা নিজেদের 'আফ্রিকানেরার' বলে পরিচয় দেয়, তোমরা নিজেদের আফ্রিকান্ বলে পরিচয় দাও দেখবে স্বাধীনচেতা মানুষ, পরাধীন ভারতবাসী, মরণ-বিজয়ী চীন তাতে যোগ দিবে। মুষ্টিমেয় বুয়ার তোমাদের পদদলিত করে রাখতে পারে না, পারবেও না।" এই বলে আমি সাংবাদিকদের কাছ হতে বিদায় নিয়েছিলাম।

এদিকে ইমিগ্রেসন বিভাগ আমাকে খোঁজ করবার জন্য অন্ততঃ পাচটা লোক পাঠিয়েছে। যে ই আমার কাছে আসে সে-ই দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনে, ফিরে আর যায় না। তারা সকলেই 'কালার্ড ম্যান'। তারপর ইমিগ্রেসন অফিসার নিজে এসে একটু দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবে আমাকে বললেন, "মহাশয়, দয়া করে পাচ মিনিটের জন্য এদিকে আসুন।" ইমিগ্রেসন বিভাগে ইউরোপীয়ান অফিসার বোধহয় দু'তিন জন থাকে। একজন বল্লেন, "মহাশয়, দয়া করে আপনার আংগুলের টিপ দিতে হবে।" আমি বল্লাম, "অন্যান্য ইউরোপীয়ানরা তো আংগুলের টিপ দেয় না আমি তা দিব কেন?"

"আপনি যে ভারতবাসী সেকথা আপনার স্মরণ রাখা দরকার। ভারতবাসীর দস্তখতে হয় না, অনেকে দস্তখত বদলিয়ে ফেলে. কিন্তু আংগুলের টিপ বদ্লাতে পারে না।" কোন কথা না বলে আংগুলের টিপ দিয়ে চলে এলাম।

যে সকল স্কোলী বয় আমাকে বিদায় দিতে এসে শ্লোগাণ ঝাড়ছিল তাদের চিৎকার জাল চার্লী চ্যাপলিন্ এসে থামিয়ে দিল। আসল চার্লী চ্যাপলিন্ থাকেন হলিউডের এক কাণা গলিতে তা দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে নানারূপ গল্পও শুনেছি। অবশ্য এসব বাজে কথা এখানে

বক্তব্য নয়। জাল চাবুলার দিকে কৌতূহলী দর্শকরা ছয় পেনী এবং এক শিলিং-এর রৌপ্যমুদ্রা বর্ষণ করছিল। যাত্রী এবং ছাত্র-সেপাইগণ আনন্দে চিৎকার করছিল। আমাদের মন সেদিকে ক্ষণিকের তরে আকৃষ্ট হল।

কেপটাউন! যদিও তোমার সৌন্দর্য আমার মনকে মুগ্ধ করেছে, তোমার বুকের অনেক সন্তান আমাকে আপন করে গ্রহণ করেছে, তবুও তোমার কথা ভুলার জন্য আমাকে অনেকদিন অন্যত্র গিয়ে থাকতে হবে। কারণ তোমার শরীরে এমন এক ক্ষত আছে, যা আমি সহ্য করতে পারি না, যা আমার মনকে বিচলিত করে তোলে। তোমার সন্তানগণ যদিও সে ক্ষত দেখে ক্ষণিকের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করে, তারপরই কিন্তু সব ভুলে যায়।

তারা জানে তাদের মায়ের শরীরে ক্ষতের কারণ তাদেরই আপন ভাই, আর সে ভাই কত দুর্দান্ত। হয়ত একদিন তোমার দুর্দান্ত ছেলেকে তারা শাসন করবে, সেদিনের জন্য অপেক্ষা কর, আর আমাকে বিদায় দাও। আমাকে যেতে হবে বহুদূর। আমার কাজই হল পুরাতনকে ভুলে গিয়ে নূতনের স্বরূপ চিন্তা করা। আমি এখন আমেরিকার পথে।

জাহাজ ছাড়তে এখনও অনেক দেরী। যারা জাহাজের যাত্রী নয় তাদের নেমে যাবার আদেশ হয়েছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণও জাহাজ পরিত্যাগ করে নীচে নেমে গিয়ে জেটিতে দাঁড়ালেন। জেটিতে শ্বেতকায়দের ভিড় ছিল। তাদের গা ঘেঁসে আমার বন্ধুদের দাঁড়ান খুব নিরাপদ ছিল না। ইউরোপীয়ানরা বন্ধুদের বিদায় দেবার শোকে যদিও মুহ্যমান, তবু পাশে কালা আদমী এসে দাঁড়ালে সে শোক মুহূর্তে ক্রোধে পরিণত হয় এবং অসহায় নিরীহ ভারতীয়দের উপর অসৎ ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং ভারতীয়দের বাধ্য হয়েই বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হল। কিন্তু স্কোলী বালকরা অন্যরূপ। তারা শ্বেতকায়দের

কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সাদাদের বুটের লাথির ভয় তারা রাখে না। তারাই আমাকে লাল নীল সবুজ সাদা নানা রংএর ফিতা দিয়ে গিয়েছিল উপরের ডেক হতে ছাড়বার জন্যে। আমি ফিতাগুলি ছাড়লাম। কয়েকটা ফিতা তারা ধরল এবং আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল। জাহাজ নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে জেটি ছেড়ে বাহিরে সমুদ্রে এসে মোড় ফিরেই দম বাড়িয়ে দিল। জাহাজের খালাসী থেকে কাপ্তান সকলেই শ্বেতকায়, তারা সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে সকল জাহাজ চলাফেরা করে, তাদের কতকগুলি আইন মানতে হয়। সর্বপ্রথম আইন হল, ডেক প্যাসেন্‌জারের কোন ব্যবস্থাই নাই। দ্বিতীয় নিয়ম হল, এশিয়াটিক ফুড অর্থাৎ চীনা খাবার কোনও যাত্রীকে খেতে দেওয়া হয় না। জাহাজের টিকেট কেনার মানেই হল, সবর্বাদীসম্মত খাদ্য তোমাকে খেতেই হবে।

আমি টিকেট কিনেছি তৃতীয় শ্রেণীর। প্রশান্ত মহাসাগরের, চীন সমুদ্র তীরের এবং ভারত মহাসাগরের জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীকেই ডেক প্যাসেন্‌জার বলা হয়। এখন আটলাণ্টিক মহাসাগরের ডেক প্যাসেন্‌জার বা তৃতীয় শ্রেণীর লভ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে একটু সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি। কেপটাউন হতে সাউথহাম্‌টন তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চৌত্রিশ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের দেশের সাড়ে চারশ টাকা। আমাদের কেবিনে দুখানি বার্থ, তাতে বিছানা পরিপাটিরূপে সাজানো ছিল। তিনটি আলো ছিল। একটা কেবিনের মধ্যস্থলে, আর দুটা আলো প্রত্যেক বালিশের পেছনে। বই পড়তে বেশ আরাম। ছোট শিকলে টান দিলেই বাতি জ্বলে উঠে, আবার সেই ছোট শিকলে টান দিলেই বাতি নিবেও যায়। ভিতরেই হাতমুখ ধোবার জন্য গরম এবং ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া পাঁচটা

কেবিনের পরই একটি করে স্নানের ঘর। ডাইনিং রুম, স্মোকিং রুম, লাইব্রেরী, খেলবার নানারূপ সরন্‌জাম, রুম স্টুয়ার্ট, স্নানাগারের স্টুয়ার্ট—এসকল ত ছিলই। দৈনিক সংবাদপত্র জাহাজে ছাপান হ'ত এবং সকাল বেলায় ঘুম ভাংতেই প্রত্যেকের হাতের কাছে একখানা করে সংবাদপত্র দেবার ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য দাম দিতে হ'ত না। ডিনারের পর সিনেমা দেখান হ'ত। প্রত্যেক কেবিনেই কলিংবেল-এর ব্যবস্থা ছিল। বেল বাজালেই বয় দৌড়ে আসত। কোনও এক সময়ে ইংলণ্ড ও স্পেন হতে যখন যাত্রীরা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় যেত তখন ছিল ডেক প্যাসেন্‌জারের ব্যবস্থা। এতে অনেক লোক পথেই মরত, আর যারা বেঁচে থাকত তারাও আমেরিকায় পৌছবার পর কয়েক মাসের মাঝেই মরত। এরূপ মৃত্যু হবার পর ডেক প্যাসেন্‌জার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সমুদ্রে গরম বাতাস থাকার জন্য ডেক প্যাসেন্‌জারের ব্যবস্থা এখনও রয়েছে, এবং আমাদের নিয়ম কানুন অর্থাৎ ধর্মের গোড়ামী থাকায় আমরাও ডেক প্যাসেন্‌জারী পছন্দ করি। এতে আমাদের কত হীন হতে হয়, কত অপমান সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নাই। এসব জেনে শুনেও আমরা এসবের প্রতিবাদ করি না।

জাহাজ এখন গভীর সমুদ্রে। আমার কেবিন দেখা হয়েছে, এবার আমাকে জাহাজ দেখতে হবে। তাই জাহাজের একদিক থেকে অন্যদিকে দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী সবই দেখলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার যে কোনও শহরে জাপানী এবং তুরুক ছাড়া অন্য কোন এসিয়াবাসী বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারে না, আমি কিন্তু হেঁটেছি। জাহাজে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে ভয় পাব কেন? কিন্তু সকলের তা সহ্য হয় না। দু'একজন এরই মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছেন, "এই, তুই কি প্যাসেন্‌জার?" আমার জবাব ছিল, "হ্যাঁ, তোর মতই!" আমার মনে

হয় এই লাইনে যে সকল ভারতবাসী ভ্রমণ করেছে, তাদের মাঝে আমিই বোধ হয় সর্বপ্রথম অভদ্র এবং স্বাধীন যাত্রী।

আমার ইচ্ছা হল কেবিনে যে ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর সংগে একবার দেখা করি এবং কথা বলি। কিন্তু কেবিনে এসে তার দর্শন পেলাম না। আমি স্মোকিং রুমে বসে একটু আরাম করেই বাইরে এসে চায়ের আদেশ দিলাম। চায়ের তখনও সময় হয় নি, তবুও বয় চা এনে হাজির করল এবং বলল, চারটার সময় চায়ের ভাল বন্দোবস্ত হবে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম।

একদল যাত্রী আমারই কাছে ভিড় করে বসে নানা রকমের গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে উঠল, কিন্তু আমার তা মোটেই ভাল লাগছিল না। আমার মন যেন ক্রমশই নিরুৎসাহে দমে আসছিল। আমি যে গদি আঁটা বেন্‌চিটাতে হেলান দিয়ে বসেছিলাম, তাতে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও কেউ আমার কাছে এসে বসছিল না অথচ অন্যান্য আরাম কেদারায় ঠেসাঠেসি করে তারা বসছিল। তার কারণ আর কিছুই নয়, আমার সংগে বসলে ওদের সম্মান থাকবে না।

কেবিনে এসে দেখি ভারতীয় ভদ্রলোকটি মুখ নত করে বসে আছেন। তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। তিনি তাঁর পরিচয় সংক্ষেপে দিয়ে আমার বোঁচকার দিকে দৃষ্টি ফিরালেন এবং বললেন, "এরূপ পুঁটলি নিয়ে বিলাত চলেছেন, এটা দেখে লোকে যে হাসবে!" আমি তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ না করে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাইনিং রুমে আপনি কোন্ দিকে বসে খান?" গম্ভীর হয়ে বললেন—কেবিনে তাঁর খাবার এনে দেওয়া হয়। আমি বললাম, "কেবিন তো শোবার জন্য খাবার জন্য ডাইনিং হল্ রয়েছে, সেখানেই গিয়ে আমরা খেয়ে আসতে পারি।" তারপরই বললাম, "চলুন এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে আসি।" ভদ্রলোক দুই চোখ কপালে

তুলে বললেন—যান, অপমানিত হয়ে আসুন। ভদ্রলোকের কথার ভাবে বুঝতে পারলাম স্মোকিং রুমে গেলেই অপমানিত হতে হবে, তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, যদি কিছু ঘটে তার জন্য আমি দায়ী হব আপনি চলুন। তিনি বিয়ার খেতে রাজি ছিলেন কিন্তু স্মোকিং রুমে যেতে রাজি ছিলেন না, তবুও একরকম জোর করেই তাঁকে বিয়ারের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্মোকিং রুমে গিয়েই দু'গ্লাস বিয়ারের জন্য আদেশ করলাম। বোধ হয় পনের মিনিট পর বিয়ার নিয়ে একজন ইংরেজ ছোকরা এল। তাকে বিয়ারের দাম বাবদ এক শিলিং দিয়ে আর একটি শিলিং দিলাম বখ্‌শিস স্বরূপ। অন্যান্য যাত্রীরা তিন পেনীর বেশী কেউ বখ্‌শিস দেয়নি সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল। এখনও পৃথিবী টাকার বশ। এক শিলিং বখ্‌শিস পেয়ে ইংলিশ বয় আমাদের অনুগত হয়ে পড়ল এবং কোন কিছুর আদেশ দিলেই সর্বাগ্রে আমাদের হুকুমই তামিল করতে লাগল।

আমার কেবিন-সাথীটি হলেন ব্যবসায়ে ধোপা। তাঁর আয় বৎসরে পাচ হাজার পাউণ্ড। তিনিও প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনতে পারেননি। তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিন্‌তে পেরেছিলেন, আমারই টিকেটের লেজ ধরে। যাহোক, আমাদের মাঝে মোটেই মনের মিল ছিল না—কারণ তিনি ধনী আর আমি দরিদ্র। এই যে শ্রেণীযুদ্ধ, আজ পর্যন্ত কেউ তাড়াতে পারেনি, এড়াতেও পারা যায় না। শ্রেণীযুদ্ধের অবসান হয়েছে রুশিয়ায়, লেনিনের ভালবাসায় এবং ষ্ট্যালিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে। যদিও আমরা দুজনই ইণ্ডিয়ান, দুজনের একই ধর্ম, কিন্তু আমাদের আকাশ-পাতাল ভেদ রয়েছিল। ধনী শতকষ্ট সহ্য করতে রাজি, কিন্তু যার রক্ত শোষণে ধনীর শরীর পুষ্ট হয়েছে, তার কাছে বসতেও রাজি নয়। আমার ধনী বন্ধু বুয়ারদের লান্‌ছনা নিঃশব্দে হজম করে

তাদের সংগেই মিলামিশা করবার জন্যে আগ্রহান্বিত কিন্তু আমার সংগে কথা বলতেও রাজি নন যদিও আমার চামড়া তাঁরই মত কালো !

বিয়ার খেয়েই যেন তার অনেকটা জ্ঞান হল, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন স্মোকিংরুমে যেতে কোনদিনই তাঁর সাহস হয়নি। আমি সংগে থাকায় আজ তাঁর সে সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি ডারবানে জাহাজে উঠেছিলেন এবং ডি ডেকে তাঁর দুদিন কেটেছিল। আমি তাকে বললাম, পূর্বেও একবার আমি লণ্ডন দেখেছি এবং সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেছি তাই বুয়ারদের দেখে আমার ভয় হয় না। আমার সাহস দেখে সহযাত্রী ভারতীয়টির মনে বেশ আনন্দ হয়েছিল। তিনি আমাকে নাবিকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকরা একদিন আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনেক কথা শুনার পর অনেকেই আমার বন্ধু হয়েছিল।

সেদিন বিকালে সাতটায় আমরা কেবিনে খানা না আনিয়ে ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে গেলাম। আমাদের দুজনের জন্য ডিনার রুমের এক পাশে একটা ছোট টেবিলে খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। ওয়েটার অন্য সকলের চেয়ে আমাদের ভালভাবে পরিবেশন করতে লাগল। সেই আপ্যায়ন আমাদের টাকার মহিমায় নয়, কথার দ্বারা, ভাবের আদান-প্রদানের দ্বারা। আমাদের প্রতি ওয়েটারের পক্ষপাতিত্ব অনেকেরই মনে অসহ্য হয়ে উঠছিল এবং তার জন্য আমাকে জাহাজের কেরানির কাছে কৈফিয়ৎও দিতে হয়েছিল। মনে আমার যাই থাকুক, কৈফিয়ৎটা দিয়েছিলাম একটু ঘুরিয়ে যাতে দুকূল বজায় থাকে। কারণ বাণিজ্যপোতের যে আইন, নৌবিভাগেও একই আইন। বাণিজ্যপোতের বয়দেরও কড়া ডিসিপ্লিন মানতে হয়।

সমুদ্র নীরব নিস্তব্ধ। জাহাজ চলেছে প্রবল বেগে। আমরা তারই মাঝে কখনও ঘুমাচ্ছি, কখনও বেড়াচ্ছি, কখনো বা আপন আপন মনের কথা একে অন্যের কাছে বলছি। আমাদের মন সর্বদাই নানা সন্দেহ জালে আচ্ছন্ন ছিল। আগেকার দিনে ধর্মের কথা নিয়ে তর্ক ও আলোচনা হত এবং সেই তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়েই মন গড়ে উঠত। এযুগের কথা অন্য রকমের। আগে ছিল মোহম্মদ বুদ্ধ খৃষ্ট এদের কথা। এখন হয় ষ্ট্যালিন হিটলার মুসোলিনী দালাদিয়ের আর চেম্বারলেনের কথা এবং এখনকার মতবাদ হলো ইম্পিরিয়্যালিজম্, ফ্যাসিজম্, নাজিইজম্ আর কমিউনিজম্। আমরা দুজনেই ছিলাম সকলের দৃষ্টি পথে সকল সময়। আমার ভারতীয় সংগীর এসব কোনও মতবাদ নাই তা প্রকাশ করতে গিয়ে একদিন বললেন, তিনি পলিটিক্সের কোন ধার ধারেন না। তাঁর কথা শুনে সকলে হাসল, তারপর আমার দিকে একজন তাকিয়ে বলল, "আপনারও বোধহয় একই মত?" আমি তার প্রতিবাদ করে বললাম, যেদিন এই পৃথিবীতে আমার জন্ম হয়েছে সেদিনই আমি পলিটিক্সের আওতায় এসেছি। পলিটিক্স ছাড়া মানুষ কোন মতেই বাঁচতে পারে না। দুজনের দুদিকে মতিগতি দেখে সকলেই নানা মন্তব্য করতে লাগল। আমি ওদের মন্তব্যে মোটেই কান দেইনি। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, এই পৃথিবীতে শরীরের রংএর জন্য যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মের গোঁড়ামীতে যে ছোট বড় বলে একটি নকল আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার যাতে ধ্বংস হয়, তাই আমি দেখতে চাই। মানুষ সম্পর্কে মানুষের মনের সংকীর্ণতা না ঘুচলে উন্নত সভ্যতার দাবী চলে না।

জাহাজ গোল্ডকোষ্ট পার হবার পরই বুয়ার এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের মতিগতি পরিবর্তন হতে লাগল। অনেকেই মন

খুলে আমার সংগে কথা বলতে লাগল। কিন্তু আমার বন্ধুটি কোন কথাতেই ছিলেন না। কি করে বড় একটা কাপড় কাচার মেশিন কিনবেন এবং কি করে তার কলকব্জা ঠিক হবে, সেই নিয়েই তাঁর মন পড়ে রয়েছিল।

আমি সকলের সংগে অবাধে মিলামিশা করতে লাগলাম। ইউরোপীয়ান, এয়ার সকলেই আমার সংগে নানা কথা বলতে লাগল। তাদের প্রধান জিগ্‌গাস্য বিষয় ছিল, মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রভাব ও তাঁর কৃতকার্যতা সম্বন্ধে। সেই সংগে সুভাষ ও জওহরলালের কথাও এসে পড়ছিল। আমি অনেক সময় তাদের কাছে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যেসকল তীব্র মন্তব্য করতাম, সে কথাগুলি বোধ হয় তাদের মনে বেশ লাগত। আমার চিন্তার ধারা ও কথা শুনে ওরা ভাবত, হয়ত আমি অনেক বই পড়েছি। তাই একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কার্লমার্কস্‌এর বই পড়েছি কিনা। আমি যখন বলতাম কার্লমার্কস্‌এর বই চোখেও দেখিনি তখন তারা অবাক হয়ে যেত। আমি তাদের বুঝিয়ে বলতাম, দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতাই আমাকে এই দৃষ্টি ভংগী এনে দিয়েছে।

আমি অনেক সময়ই দেশের কথা ভাবতাম। মধ্যবিত্ত লোকের অর্থের অভাব, তাদের পরাধীনতার অনুভূতি, দরিদ্রতার লান্‌ছনা, তাদের প্রতি ধনীদের উৎপীড়ন এসবের প্রতিকার কিসে হয় তার চিন্তা এখন বোধহয় তাদের মাঝে এসেছে। হরিজনরা কোনদিন মুখ খুলে তাদের দুঃখের কথা কারো কাছে বলেনি। তারা এখন শুধু দুঃখের কথা বলে না, যাতে তাদের দুঃখ মোচন হয় তার দাবীও বোধহয় করে। যে হরিজন একদিন অপরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করত এখন তারা আর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে না। এখন উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে তারাই যারা এই অসৎ নিয়মের প্রবর্তন করেছিল। আমি আরও ভাবতাম এখন দেশে আর বোধ হয়

আধ্যাত্মিকতার বাচালতা চলে না। এখন বোধ হয় সাধুদের কথায় কেউ কান দেয় না, বোধ হয় এখন দেশে আর জাতিভেদ নাই। আমি ভাবতাম আমি যেন অনেক বৎসর আগে দেশ ছেড়ে এসেছি। কিন্তু সুখের চিন্তা মিলিয়ে যেত যখনই আতলান্তিকের ঢেউ লেগে জাহাজ কেঁপে উঠত।

দেখতে দেখতে পাঁচটা দিন জাহাজে কেটে গেল। বিরাট্ সমুদ্র আর অন্তহীন আকাশ দেখে মন একঘেয়ে হয়ে উঠছিল। রাত এখনও কাটেনি। সিনেমা দেখে অনেকেই স্মোকিংরুমে এসে বসেছিল। কেউ হুইস্কি, কেউ বিয়ারের গ্লাস সামনে রেখে গল্প করছিল। আমিও এক গ্লাস বিয়ারের আদেশ দিয়ে একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম। আলাদা বসলাম এই ভেবে যে, এখন গভীর রাত, অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যদি ওদের টেবিলে গিয়ে বসি আর মদের নেশায় শ্বেতবর্ণাভিমান ওদের জেগে ওঠে, তবে আমাকে লড়তে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু এতগুলি লোকের সংগে আমি কোন মতেই পেরে উঠব না।

মিনিট দুই পরই একটি স্কচ্ ম্যান্ এসে আমারই টেবিলের কাছে একখানা ছোট চেয়ার টেনে এনে বসল এবং বলল, আমার কোন অসুবিধা হবে কি? আমি বললাম, "নিশ্চয়ই না!" স্কচ্ ম্যানটি দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা, ডাচ ভাষা বেশ ভালই জানে। সে ডাচ ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল। ডাচ আর স্কচ ভাষায় যত মিল আছে, ইংলিশ এবং স্কচ ভাষায় তত মিল নাই। স্কচ লোকটিকে জানিয়ে দিলাম, আমি ডাচ ভাষা মোটেই জানি না এবং এ জীবনে আর ডাচ ভাষা শিখবার বাসনাও রাখি না। আমার কথা শুনে স্কচম্যান বলল, "আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি প্রবৃটিশ।" আমি বললাম, "হয়ত আপনি ভাবছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছি, অনেক বৃটিশের পাল্লায় পড়েছি, তাই আমি প্রবৃটিশ।" স্কচম্যানটি হেসে বলল, "আপনি এখন কোন্ দেশের

যাত্রী ?” আমি বললাম, “আমেরিকার।” তিনি বললেন, “আমেরিকায় যান. সেখানে গেলে আপনার চোখ খুলবে। দেখবেন সাম্রাজ্যবাদীদের তাণ্ডব নৃত্য। দেখবেন ওরা নিগ্রোদের উপর কত অত্যাচার করছে। আমার মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ডুয়েল এডমিনিস্ট্রেশন্ থাকায় ভারতীয়দের বেশ ভালই হয়েছে।” কথাটা বুঝলাম এবং তা মেনে নিতেও হল। প্রকাশ্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, “আমার ভ্রান্তি দূর হয়েছে।”

আমাদের আলাপ যখন বেশ জমে উঠেছে এমন সময় একটি সুদর্শন নির্ভীক বালক এসে আমার কাছে দাঁড়াল। ছেলেটি ইংলিশ। তার সোণালী রং-এর চুলগুলি রক্তাভমুখের উপর পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ছেলেটির বয়স বার-তের বছরের বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে তার মুখে কর্মদক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। ছেলেটি আমাকে ইংগিত করে ডাকল। তার ইংগিত বুঝতে পেরে তখনই উঠে আসলাম।

প্রথমত আমরা “ডি” ডেকে নেমে জাহাজের সামনের দিকে চললাম। জাহাজ ছোট নয়, দশ মিনিটে আমাদের গন্তব্য স্থানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। অনেকগুলি সিঁড়ি উঠানামা করে তারপর গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হয়েছিল। আমাদের পথে ছোট ছোট বাতি মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। আমার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ এবং চলতে পারছি না দেখে ছেলেটি আমার হাত ধরে এগিয়ে চলছিল। আমরা একটা বড় কেবিনের দরজায় এসে টোকা দিলাম। দরজা খুলে দিবার পর কেবিনে ঢুকেই দেখি, অন্তত পন্চাশ জন লোক বসে আছে এবং আমার অপেক্ষা করছে। স্কচ, ইংলিশ, আইরিশ, ডেনিস, চেক, সব জাতের লোকই তাতে ছিল। সকলের সংগে পরিচয় হল। এরা মজুর আর আমি পর্যটক। এদের যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন কাটাতে হয়, আমারও অবস্থা তেমনি।

এদের এবং আমার মাঝে পার্থক্য হল—এরা বিদ্যা অর্জন করেছে বই পড়ে, আমার যা শিক্ষা তা চোখের দেখা বাস্তব হতে। এরা আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চায়, আমিও তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাই। কলমে অনেক বিষয় বিবৃত করা যায় না, মুখের ভাষায় তা প্রকাশ করা চলে; তাই এরা আমার মুখের কথা শুনতে চেয়েছিল।

জাহাজের মজুরদের সংগে কথার যেন শেষ হচ্ছিল না। তারাও বলছিল আমিও বলছিলাম। উভয়পক্ষে যদি জানারই মতলব থাকে তবে এরূপই হয়ে থাকে। সময় চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তিনটা হয়েছে। এত রাত্রে ঘুমালে সকালে উঠবার কোন উপায়ই থাকে না। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে খানার টেবিলে যদি না যাওয়া যায় তবে জাহাজের নিয়মমত কারো জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রাখা হয় না। তাই কাছে-বসা টেবিল ষ্টুয়ার্টকে বললাম, "দয়া করে সকাল বেলা উঠিয়ে দিবেন নতুবা সকালে খেতে পাব না।" টেবিল ষ্টুয়ার্ট সম্মতি জানাল। আমি আর তথায় বসে থাকলাম না। রুমে এসে দেখি আমার কেবিন-সাথী গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। তাকে বলার মত অনেক কথা ছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল একে উঠিয়ে আজ আমার প্রাণের কথা তার কাছে বলি, কিন্তু ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতে নাই জানতাম বলেই তাকে আর ডাকিনি।

মেডিরা

মেডিরা দ্বীপ আমাদের পথে আসবে তাই এখন থেকে সকল যাত্রীই মেডিরার কথা বলতে শুরু করেছে। দুঃখের বিষয় আমাদের জাহাজ সেণ্ট হেলেনা হয়ে আসেনি। সেজন্যই মেডিরা দেখবে বলে সকলের প্রাণে এত আনন্দ। আমার মনে হল মেডিরা বোধহয় তার ঠিক উচ্চারণ নয়, মদিরা হবে এবং মেডিরায় পৌঁছে বুঝতে পেরেছিলাম আমার অনুমান সত্য। জাহাজী সংবাদে একদিন বের হয়েছিল, জেনারেল ফ্রাংকো মেডিরা দ্বীপে সকল জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে যে হের হিটলারের ইংগিত আছে, কিংবা মুসোলিনীর কোনও চালবাজী আছে, তা নিয়ে আলোচনা সর্বত্রই চলছিল। পরে ঐ জাহাজী সংবাদেই প্রকাশিত হয় চেম্বারলেন কি একটা অঘটন ঘটিয়েছেন যাতে করে সকল তর্কের অবসান হয়ে গেছে। নতুনকে সম্বর্ধনা করার আনন্দের চিন্তাধারা পুনরায় সকলের মাঝেই জেগে উঠল।

আমাদের জাহাজ মেডিরা গিয়ে ভিড়বে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সকলেই খেলার দিকে ঝুঁকে পড়ল। আমার ভারতীয় সংগীকে বললাম, "ভায়া, এই বেলা হাতের মুঠা খুলে রেখ, দেখা যাক এরা আমাদের কাছে আসে কিনা।" উত্তরে তিনি বললেন, "ওরা টাকা নিবে কিন্তু খেলতে দিবে না।" আমি বললাম, "তার ভার আমার উপর রইল, আমি ওদের বেশ ভাল করে দেখে নিব।" আমার অনুমান ঠিক হয়েছিল। চাঁদার খাতা হাতে করে এক মিশনারী আমাদের কাছে এসেছিল। আমি চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বললাম, "আফ্রিকায় বাইবেল হাতে নিয়ে নিগ্রোদের যেমন ঠকাচ্ছেন, আমাদের কিন্তু সে রকম

টকাতে পারবেন না, আমরা টাকা দিব কিন্তু প্রত্যেক খেলাতে আমাদের নাম দিতে হবে। যদি আমাদের সংগে দয়া করে কেউ না খেলেন, তবে আমরা মোটেই দুঃখিত হব না আমরা দুজনাতেই খেলব। আমরা খেলতে চাই এবং আমরা খেলবই এটুকু মনে রাখবেন।” ক্ষণিকের জন্য লোকটার মুখ লাল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই তার মুখের অবস্থা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। আমি তাকে বললাম, “আপনি বেশ আত্মগোপন করতে পারেন, সেদিকে আপনি বাহাদুরী পেতে পারেন, নতুবা কি করে আফ্রিকায় নিগ্রোদের সর্বনাশ করতে পেরেছেন ? এখন বলুন আমাদের কথায় রাজি আছেন কি ?” অতি মিষ্ট স্বরে অতি মধুর কথায় বিনয় নম্রভাবে আমাদের বাবাজী বললেন, “নিশ্চয়ই খেলবেন।” আমরা প্রত্যেকে পনর শিলিং করে চাঁদার খাতায় সই করে দিলাম।

দুতিন দিনের পরই হয়ত আমরা সাউথ্হাম্টনে পৌঁছব। আজ প্রভাতী খানা খেয়েই সবাই খেলায় লেগেছে। আমরা উপরে গিয়ে একটা বেন্চে বসে নানারূপ খেলা দেখছিলাম। মাঝে মাঝে আমরাও খেলায় যোগ দিয়েছি। আমাদের খেলার সাথী হত সাধারণত ইহুদীই।

ইহুদীরা আমাদের সংগে খেলার সময় বেশ হাসত, আমোদ করত, আর দেখাত তারা আমাদের বন্ধু। আমার সাথী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী, সে বুঝতে পারত না কে ইহুদী এবং কে ইউরোপীয়ান, তাই সে সকলকে সমানভাবেই ঘৃণা করত। অনেক দিন তাকে বলতে বাধ্য হয়েছি, একটি ব্যক্তিবিশেষকে ঘৃণা করা যায় তা বলে একটা জাতের উপর এতটা বিদ্বেষ অন্যায়। অর্থ-পিশাচরূপে ইহুদীদের যে বর্ণনা সেক্সপীয়ার দিয়ে গিয়েছেন তাঁর শাইলক চরিত্রে তা সত্য হতে পারে কিন্তু ইহুদীদের মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য অনেক মহৎ কাজ করে গেছেন।

মাথার উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ। সূর্য ডান দিক হতে উঠেছে এবং বাঁ দিকে অস্ত যাচ্ছে। নীচে সমুদ্র শান্ত তাতে কোনওরূপ ঢেউ নাই— আমাদের দেশের বড় পুষ্করিণীর জলের মত ধীর এবং স্থির। আমরা সেই দৃশ্যই দেখছিলাম। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ো মাছ জাহাজের কাছে জল থেকে উঠে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল এবং আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করছিল। বাস্তবিক দিনটা কাটছিল আনন্দেই। কিন্তু গত রাত্রে একটা বই পড়েছিলাম তাতে লেখক সমুদ্রের ভীষণতার কথা লিখেছিলেন। সমুদ্রের সংগে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই এরূপ লেখক সমুদ্রের কত কাল্পনিক কাহিনীই না লিখেছেন। তাদের কল্পনার চোখের সামনে সমুদ্র সর্বদাই ভয়সংকুল হয়ে আছে, কল্পিত দৈত্যদানবের মত কত অতিকায় প্রাণী সমুদ্র তোলপাড় করছে। আমি বাস্তব সমুদ্রের আর কল্পিত কাহিনীর তুলনা করছিলাম এবং ভাবছিলাম, উচ্ছ্বাস ভাবপ্রবণতা কবিত্ব—এ সকল আর যার জন্যই হোক আমার মত বাস্তববাদীদের জন্য নয়। আমার ভাবনার অন্ত ছিল না, কখন যে আমাদের পাদরী আমার কাছে এসে বসেছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি। পাদরী তাঁর ডান হাতটা আমার কাঁধের উপর রাখতেই আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে গেল।

পাদরী বললেন, "ভাববেন না, আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই সাউথ-হাম্টনে যাব, ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন।" পাদরীকে বললাম, "মহাশয় দয়া করে ভগবান এবং তাঁর পুত্রদের কথা আমাকে শুনাবেন না। আমার মংগলামংগল আমার হাতে। ভগবান এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। এ সকল কথার উৎপত্তি হল ভয় হতে এবং এ সকল কথা শুধু ভয়েরই সৃষ্টি করে। সাময়িক উত্তেজনাও আনে বটে মদের নেশার মত, কিন্তু এর পর যখন মন দমে যায় তখন আর বুঝতে পারা যায় না কোথায় চলেছি। অতএব ক্ষমা করুন। কয়েকটি

রজত মুদ্রার বিনিময়ে চোখে যে ঠুলি বেঁধেছেন তা অপসারণ করতে চেষ্টা করুন, দেখবেন বাস্তু, কালার্ড হিন্দু এরাও মানুষ। এদের জন্য পৃথক করে চার্চ তৈরী করতে হবে না।"

জাহাজের যাত্রীরা সবাই খেলার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। আমি ও আমার ভারতীয় বন্ধুটিও চুপ করে বসে ছিলাম না, যখনই ফাঁক পাচ্ছিলাম তখনই খেলায় যোগ দিয়ে সেই আনন্দের অংশ গ্রহণ করছিলাম। জাহাজের একটানা জীবনের মধ্যে সমস্ত দিনের অলস একঘেঁয়েমার পর প্রাণে চন্‌চল সজীবতা ও বৈচিত্র্য লাভ করা যায় এই খেলার সময়টিতে।

আমাদের সংগে খেলায় যোগ দিলেন তুজন ইহুদী। খেলার মধ্য দিয়েই তাদের পরিচয় পেলাম নিবিড়ভাবে এবং বুঝলাম আমাদের প্রতি এদের একটা প্রীতির বন্ধন হয়ে গেছে এরই মাঝে। খেলা শেষ হতেই ইহুদী তুজন আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে গল্প আরম্ভ করে দিলেন এবং বললেন, "আমাদের ইচ্ছা ছিল আপনাদের সংগে আলাপ করি কিন্তু পাছে কথা বলার জন্যে জাত যায়, সে ভয়ে কথা বলতে এতদিন সাহস করিনি।" আমাদের দেশে কথা বললে জাত যায় না, ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়। ইহুদীরা বল্‌লেন, "পৃথিবীর যদি উন্নতি করতে হয়, তবে কথায় নয়, শক্তির সাহায্যে আইন প্রনয়ণ করে। যে পাপ করে, তাকে শাস্তি না দিয়ে পাপের উৎপত্তির কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পাপের কারণকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। দেখছেন তো আমরা আপনাদের স্বেচ্ছায় হিংসা করছি না, আমাদের সমাজ বাধ্য করেছে আপনাদের হিংসা করতে। আমরা সমাজের কুনিয়ম মেনে নিচ্ছি। আমাদের এরূপ ক্ষমতা নাই যে এই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হই, কারণ আমরা ইহুদী। মানুষের সমাজে আমাদের স্থান অতি হালকা, তারপর যদি অত্যাচারীদের সংগে

যোগ দেই তবে আমরাও যে অত্যাচারিত হব।" এরূপ খাঁটী কথা খুবই কম শুনতে পাওয়া যায়। আমরা ইহুদীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবিনে চলে এলাম।

আমাদের ষ্টুয়ার্ট-ওয়েটারদের তখন অবসর সময় ছিল। তাই তারা সবাই মিলে এই সময়টাতে নানা রকমের বই পড়ছিল। আমাদের কেবিনের কাছেই চিফ্-ষ্টুয়ার্ট-এর কেবিন। কার কোন্ বই পড়া উচিত তিনিই সে সব ঠিক করে দেন। সেই বই দেওয়ার ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে দেখলাম একটু। লাইব্রেরীতে ছোট ছোট প্যামফ্লেট ছিল, বড় বড় বইও অনেক ছিল। তার দু-একটির নামও চোখে পড়ল। বইগুলি দেখে মনে হল এই জাহাজ বৃটিশের নয়, রুশ সোভিয়েটের। যত বই সবই সোভিয়েট সংক্রান্ত। অবশ্য এসব বই পাঠ করা আমার মত ইংরেজী জানা লোকের শোভা পায় না। সুন্দর সরল ভাষা। কিন্তু মাঝে মাঝে যে-দুএকটা শব্দ রয়েছে তার অর্থ যদি না বোঝা যায়, তবে সমগ্র বইটা পাঠ করেও কোন গ্যান হয় না। আমি কখনও কাউকে বলি না যে আমার ইংরেজী ভাষায় দখল আছে। তাই যে বইখানা চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম তা ফিরিয়ে দেবার বেলা বললাম, "মশায় কিছুই বুঝলাম না।" রুম-ষ্টুয়ার্ট বললেন, "বেশ এতে এমন কি আছে যে বুঝতে পারেন নি?" "ঐ যে দেখছেন একটা শব্দ এর অর্থের সংগে সমুদয় বইটার সম্বন্ধ।" রুম-ষ্টুয়ার্ট হেসে বললেন, "যদি সময় পাই, তবে মেডিরাতে গিয়ে আপনাকে কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দিব।" কিন্তু সে কথাটির অর্থ তিনি আর বলেননি।

আমাদের জাহাজ ক্রমশই মেডিরার কাছে এসে পড়ছিল। এই দ্বীপপুন্জ পর্তুগীজ-এর অধীনে। দূর থেকে এর মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দ্বীপপুন্জের অবস্থান অনেকটা ট্রপিক্যাল আবহাওয়ার মাঝে, তবুপ গাছপালা দেখে মনে হয়েছিল এতে পুরা ট্রপিক্যাল আবহাওয়া

লাগে নি। জাহাজ ধীরে ধীরে জেটিতে লাগল। অগণিত লোক জাহাজের যাত্রীদের দর্শনের জন্য তীরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজ থেকে নেমে একাই পথে বেড়িয়ে পড়লাম মেড়িরা শহরটিকে ঘুরে দেখবার জন্যে। আমার ভারতীয় বন্ধুটি আর এলেন না কারণ তাঁকে এই অবসরে জাহাজের লণ্ড্রী দেখতে হবে।

পর্তুগীজদের বাড়িঘর গীর্জা সব ছোট ছোট; পাথরে বাঁধান পথ যেমন হয় মেডিরাতেও ঠিক সেরূপই। মদের দোকানগুলি ইউরোপীয় ধরণে সজ্জিত। বিক্রেতা সকলেই স্ত্রীলোক। মদের দোকানগুলির দিকে তাকিয়ে আমার এই কথাই শুধু বার বার মনে হচ্ছিল যে, একটা জাত আরেকটা জাতকে কি ভাবে গ্রাস করে ফেলে। ইউরোপীয় সভ্য জাতগুলির মধ্যে ফরাসী পর্তুগীজ এবং স্প্যানিশ জাত যে-সকল দেশকে অধীনস্থ করেছে এবং তাদের সংগে তারা যেমন সহজে মিশে যেতে পেরেছে অন্য কোন জাত আজ পর্যন্ত তা পারেনি। মদের দোকানের একটি মেয়েকে দেখেই মনে হল এ মেয়েটি নিশ্চয়ই বর্ণসংকর, তার চুলই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তৎক্ষণাৎ মনে হল, এটা ঠিক করা চাই এই দ্বীপের আদি অধিবাসী নিগ্রো না পর্তুগীজ।

ঐতিহাসিক সংবাদ আমি রাখি না, চোখের দেখা এবং অনুমান আমার এক মাত্র পন্থা। দেখেশুনে যতটুকু অনুমান হল তাতে বুঝলাম এখানকার আদি বাসিন্দা নিগ্রোই ছিল। নিগ্রোদের সংগে শ্বেতকায়গণ শক্তির সাহায্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। আবার এমনভাবে সেই সম্বন্ধ স্থির করেছে যে, নিগ্রো আর নাই বললেও চলে, সকলেই বর্ণসংকর ইউরোপীয়ান হয়ে গেছে।

মদের দোকান দেখেই আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি বলে, যেখানে মদ তৈরী হয় সেখানে গেলাম। শ্বেতকায় ম্যানেজার আমাকে সাদর সম্ভাষণ

করলেন এবং কয়েক কাপ্ মদের নমুনা দিলেন চোখে দেখবার জন্য! মদের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল না, আমার দৃষ্টি ছিল ম্যানেজার তাঁর বর্ণসংকর কর্মচারীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করছেন তার প্রতি। এমন কি, কথা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করেও ফেললাম, "প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে কোন বর্ণবৈষম্য আছে কি?" শ্বেতকায় ম্যানেজার বললেন, "এখানে কোনরূপ বর্ণ বৈষম্য নাই।" আমি বল্লাম, "যদি তাই হয়, তবে জিজ্ঞাসা করব মজুরীর দিক দিয়ে কোনও বর্ণ বৈষম্য আছে কি অর্থাৎ যদি আপনার জায়গায় একজন অর্ধ-পর্তুগীজ কাজ করে, তবে আপনার অনুরূপ মাইনে পাবে কি? দ্বিতীয়ত ওদের এই ধরনের কাজ পেতে কখনও বেগ পেতে হয় কি, অথবা তাদের সেরূপ কাজ হতে বন্চিত করা হয় কি?' পর্তুগীজ ম্যানেজার হেসে বললেন, "সে রকম কিছুই নাই। তবে দরিদ্রের রক্ত শুষে ধনী যে অট্টালিকা তৈরী করে তা থেকে আমরাও বাদ যাই না। পথে ঘাটে চলাফেরা করলেই তা দেখতে পাবেন। আরও দেখবেন দরিদ্রতার জন্য মানুষের জীবনে যে অবনতি আসে, তা হতে আমরাও বাদ যাইনি। ধনীদের দোষনীয় বাসনা বড়ই প্রবল হয়। সেই দুষ্ট বৃত্তিকে দমন করার জন্য আমেরিকা এবং ইউরোপ হতে ধনীরা মেডিরাতে আসে। আজ যে সকল যাত্রী এই জাহাজে করে আসল সকলেই মেডিরা বেড়িয়ে দেখতে আসেনি, তারা এসেছে নানারূপ পাপ বাসনা পূরণ করতে। তাদের পাপবাসনাতে আহুতি দেবার জন্য অনেক যুবক যুবতী তৈরী হয়ে আছে। তাদের সংখ্যা কম নয়।" ম্যানেজারের কথায় মনে এমন একটা ধাক্কা এসে লাগল যা সামলাতে অনেক সময় লেগেছিল। আর কথা হল না, বেড়িয়ে চলে আসলাম। পথে দেখা হল কতকগুলি বুয়ার সেপাইদের সংগে।

বুয়ার সেপাইদের বড়ই আনন্দ। তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নাই তাই

দুহাতে খরচ করছে। মাঝে মাঝে উপরওয়ালা অফিসার এদের সাবধান করেও দিচ্ছিল ;

এখানে নূতন ধরনের গরুর গাড়ি দেখলাম। এক একটি গাড়িতে দুজন করে লোক বসতে পারে। প্রত্যেকটি গাড়ি দুটা বলদ টানে। এমন পুষ্ট পরিষ্কার বলদ আমাদের দেশে দেখেছি বলে মনে হয় না। গাড়িতে জোতা বলদগুলিকে যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা একটা চাবুক দিয়ে বলদগুলিকে মারবার ভান করছিল মাত্র। লম্বা পাতলা চিক্কণ বাঁশের লাঠির উপরে বাঁধা সূতা আকাশে ঘুরিয়ে যখন ঠাস্ করে শব্দ করে তখনই বলদ হুঁশিয়ার হয়ে চলতে আরম্ভ করে। বলদ একটু পরিশ্রান্ত হলেই যাত্রাদের নামিয়ে দেওয়া হয়, তাতে যাত্রার সুবিধা হোক আর অসুবিধা হোক আসে যায় না। বুঝলাম যারা বৃষ মাংস ভক্ষণ করে তারা বৃষের সুখ সুবিধার দিকেও চায়, আর যারা বৃষ মাংস খায় না, তারাই বৃষের ল্যাজে সবচেয়ে বেশী মোচড় দেয়।

মেডিরাতে বোধহয় অনেক কিছু দেখার ছিল, কিন্তু আমার আর ভাল লাগল না তাই জাহাজে ফিরে এলাম। জাহাজে এক রকমের মেলা বসেছে। নানারূপ পণ্য নিয়ে ব্যবসায়ীদের ভিড় জমে উঠেছে। দর-কষাকষি এমন চলেছে যে যার দাম এক পাউণ্ড বলছে তার দাম এক শিলিং-এ নেমে আসছে। আমাদের দেশেও তা হয়। এই ধরনের দরাদরির জন্য বিদেশীরা আমাদের নিন্দা করে এবং বই লিখে কুৎসা রটায়, কিন্তু এখানে তার উল্টা। এখাকে এটাকে আমোদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে বারবণিতার সংখ্যা নিয়ে দেশবিদেশের লোক নানারূপ গল্প করে। আজ তাদের বারবণিতা তাদেরই ক্রোড়ে এই জাহাজের ডেকের উপর নীল আকাশের নীচে তাদেরই স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করছে। এসব বিভৎস কদর্য দৃশ্য দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগল না। এদিকে

শহরে যে কয় কাপ মদ আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল তার সবটাই বাহাদুরী করে উদরসাৎ করায় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। যখন এরূপ অস্বস্তি অনুভব হয় তখন কোন মতেই ঘরের বাইরে যাওয়া অথবা নিজের স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ইউরোপে দেখেছি মাতাল অবস্থায় অনেকেই অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে, সেজন্য কেউ দায়ী হয় না, পুলিশও সাহায্য করতে পারে না। তাই কেবিনে যাওয়াই একান্ত কর্তব্য ভেবে কেবিনে প্রবেশ করে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সাতটার সময় সেদিন ডিনার খাবার বন্দোবস্ত হয়নি। ডিনারের বন্দোবস্ত হয়েছিল রাত বারটায়। নির্দিষ্ট সময়ে যখন ডিনারের ঘণ্টি বাজল তখন শরীর ঠিক হয়ে গিয়েছিল। খাবার সমাপ্ত করে নানারূপ গল্প করার সময় শুনলাম আগামী পরশু বিকালের দিকেই আমরা সাউথ্‌হ্যাম্‌টনে পৌঁছব। এই সংবাদ পরের দিন জাহাজী সংবাদপত্রে বার হল। সংবাদ বার হওয়া মাত্র সকল যাত্রীর মুখেই আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠল। সবাই পেট ভরে মদ খেতে লাগল। তারপর বিকালে হল একটা সভা। সভায় জাহাজের ক্যাপ্টেন সভাপতিত্ব করলেন। সকলেই কিছু কিছু বললেন। আমার বন্ধুটি একদম নীরব থাকাই পছন্দ করলেন। সেজন্য আমাকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের পক্ষ হয়ে এবং খাস ভারতবাসীর পক্ষ হয়েও কথা বলতে হয়েছিল। বলার নির্ধারিত সময় ছিল পাঁচ মিনিট, কিন্তু অর্ধঘণ্টা বলার পর উপসংহারে বললাম, "আর সময় ক্ষয় করে লাভ নাই, ভারতের সুখ-দুঃখের হিসাব ভারতবাসী যদি না করে তবে আর কেউ তার কূল-কিনারাও করতে পারবে না, অতএব আমার স্বদেশের এবং স্বদেশবাসী যারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাস করছেন তাদের দুঃখের কথা বলে এতক্ষণ আপনাদের আনন্দে বাধা দিয়েছি বলে ক্ষমা করবেন।" এই বলেই আমি আমার কথার শেষ করেছিলাম। সভা যখন সমাপ্ত হয়েছিল তখন

সভায় আগত প্রত্যেকে এক একজন করে আমার করমর্দন করেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলাম সাদা কথার এখনও মূল্য আছে।

সাউথ্‌হাম্‌টন অতি কাছে। এর পূর্বেও আমি লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেবারে আমি ছিলাম ক্লান্ত রিক্তহস্ত এবং পেটের ক্ষুধায় জর্জরিত। এবার কিন্তু তা নয়। এবার খেয়ে খেয়ে ডিস্‌পেপসিয়া ধরেছে। পকেটে টাকা আছে। টাকা এবার মনে আনন্দ এনে দিয়েছে। তাই সে আনন্দকে বাড়িয়ে তোলার জন্য লণ্ডন দেখার একটা ফর্দ করে নিলাম এবং ঠিক করলাম এবার লণ্ডন প্রাণ ভরে দেখে নিব।

দূর থেকে সাউথ্‌হাম্‌টনের লাইট হাউসের আলোক রেখা দেখে মন উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আমাদের ও নেটিভদের আনন্দ সমান নয়। তাদের হল মাতৃভূমি আর আমাদের হল বিদেশ।

পিঠ-ঝোলাতে সামান্য জিনিষপত্র চড়িয়ে দিয়ে জাহাজ হতে নেমে পড়লাম। আমরা সবাই গিয়ে বসলাম রেলষ্টেশনের কাষ্টম হাউসে। সেখানে জিনিষপত্র পরীক্ষা হবে। কাষ্টম হাউসে একটি রেঁস্তোরাও ছিল, তাতে সকলে চা পানে ব্যস্ত ছিল। আমিও চায়ের আদেশ দিলাম।

সাউথ্‌হাম্‌টনে একটা সুন্দর নিয়ম আছে। যেই বিদেশ হতে একটা বড় জাহাজ এল অমনি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাকেও নেটিভদের সংগে স্পেশাল ট্রেনে ওয়াটারলু ষ্টেশন পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আমাদের জন্য বসবার স্থানের রিজারভেসন ছিল না বলেই সর্বত্র বসবার অধিকার ছিল। নিশ্চিন্ত মনে একটা কামরাতে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি ছাড়ল এবং চলল লণ্ডনের দিকে। ওয়াটারলু ষ্টেশনে নামার পর আমার পরিচিত কালো আদমীদের দ্বারা পরিচালিত ওয়াই. এম. সি. এ-তে গিয়ে উঠলাম। এখানে এসে মনে হল দক্ষিণ আফ্রিকার অমানুষিক

'কালার বারের' গন্ধ কিছু টা দূর হয়েছে। এখানে তবুও কতকটা স্বাধীনতা আছে। যারা বলেন ইংলণ্ডে কালার বার নাই তারাও কিন্তু সত্য কথা বলেন না। এখানেও কালার বার আছে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকার মত নয়। আমেরিকার দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে আসছি দেখে মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল।

লণ্ডন

লণ্ডন নগরের নাম কে না জানে? সকলেই লণ্ডন দেখতে চায়, কিন্তু পেরে উঠে না। তাই অনেকেই ভ্রমণ কাহিনী পড়ে মনের পিপাসা মিটায়। যারা লণ্ডনে যায়, তারা সব সময় নগরের সত্য বর্ণনা দিতে পারে না। সেখানে ভালও আছে মন্দও আছে। মন্দের দিকটা সাধারণত চাপা থাকে কারণ অধীন জাতির পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর কুৎসা করা অকর্ত্তব্য। যেখানে কথা বলবার ক্ষমতা রয়েছে, লেখবার ক্ষমতা রয়েছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান, সেখানে গিয়ে ভারতবাসী সামান্য দুঃখকষ্টের কথা ভুলে যায়।

দেখবার এবং জানবার প্রবল বাসনা আমার মনকে নাচিয়ে তুলেছিল। লাফালাফি করতে হলে পেট ভরে খেতে হয়, শুতে হয় উত্তম শয্যায়, তবেই চিন্তাধারা ঠিক পথে চলে। এবার আমার খাবারের চিন্তা মোটেই ছিল না, কারণ লণ্ডনের রেঁস্তোরাতে প্রবেশ করতে আমাকে কেউ মানা করছিল না। কিন্তু কোথায় থাকব এই হয়েছিল ভাবনা।

ওয়াটারলু ষ্টেশনে পৌঁছেছিলাম বোধ হয় বারটার সময়। তার পর হতেই ঘরের খোঁজে বাহির হই। যার হাতে টাকে আছে তার ঘর খোঁজার

দরকার নাই, যে কোনও হোটেলে গেলেই হয়। কিন্তু অনেক দিনের দরিদ্রতার ফলে একটু বেশী রকম মিতব্যয়িতার জ্ঞান অর্জন করেছিলাম এবং সে জ্ঞান সহজে বর্জন করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠছিল না। ঘরের খোঁজে বার হয়েছি সস্তায় থাকব বলে। ইউস্টন্ স্কোয়ার হতে এলগেট্ পর্যন্ত ঘর খুঁজেছি কিন্তু কোথাও ঘর পাইনি। এই পথটার মাঝে অন্তত দুই শত জায়গায় ঝুলছিল ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপন। কিন্তু ঘরগুলি আমার মত কালো আদমির জন্য নয়, সাদা চামড়ার জন্য। এক স্থানে একজন লোক বেরিয়ে এসে অতি নম্রভাবে বললেন, "এই মাত্র সব ঘরই ভাড়া হয়ে গেছে কি করি বলুন তো?" আমি বললাম, "বিজ্ঞাপনটি উঠিয়ে যদি নিতেন তবে আর আমাকে কষ্ট করতে হত না।" ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ভদ্রতা করে বিজ্ঞাপনটি উঠিয়ে ঘরে নিয়ে রেখে দিয়ে ফের বাইরে এসে আমাকে বললেন, "এমন করে আপনার ঘর খোঁজা অনর্থক হবে। যে সব পাড়ায় ভারতীয় ছাত্ররা অথবা মজুররা থাকে সেখানে যান সুবিধা হবে—আপনার জন্য কেউ ব্যবসার ক্ষতি করবে না।" ব্যাপারটা বুঝলাম; আমার কালো মুখই ঘর পাবার প্রতিবন্ধক ছিল। বিলাত-ফেরতা সুধীজন কি এসব কথা দেশে এসে কখনও কারো কাছে বলেছেন? তারা এসব কথা বলতে পারেন না কারণ এসব কথা বললে যে তাদেরই বাহাদুরী চলে যাবে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ডকে যাবার ইচ্ছা ছিল না কারণ এখন আমি ধনী আর যেসকল ভারতবাসী সেখানে থাকে তারা দরিদ্র। কিন্তু এ অভিমান আমার বেশীক্ষণ রইল না। চললাম ডকের দিকে সর্বহারাদের কাছে। তাদের কিছু নাই, তাই অভিমান তাদের কাছে ঘেঁষে না। ভরসা এই তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না। ৭০ হাই ষ্ট্রীটে একটি হিন্দুস্থানী এসোসিয়েসন আছে। ভাবলাম, সেখানে গিয়ে মুসলমানদের সংগেই

রাত্রিটা কাটিয়ে আসি। গিয়ে দেখি দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে, 'চাবি উপরে আছে'। আমি উপরে উঠে চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে তিনটা বেন্‌চ একত্র করে হাতটা বালিশ করে মহানন্দে শুয়ে পড়লাম। পরিশ্রম করলে আপনা হতে ঘুম আসে। ঘুম এসে আমার সকল ব্যথার অবসান করেছিল।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। বোধ হয় রাত্রি তখন এগারটা হবে, একটি মহিলা এসে আমাকে জাগালেন। মহিলার সম্মান রক্ষা করা পুরুষের কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে মহিলাকে সম্মান জানালাম। মহিলা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করার নিয়ম যদিও তাদের মাঝে নাই তবুও আমার পরিচয় চেয়েছিলেন এবং আমার পরিচয় পেয়ে মহিলাটি আমাকে বসতে বলেই কাছের বাড়িতে গিয়ে একটি যুবককে ডেকে এনে আমার সংগে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যুবক অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সংগে আলাপ করে নিয়ে বললেন, "এই তো মোটে সন্ধ্যা হল, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি, আজ রাত্রে আর বাসা ভাড়া হবে না।" উভয়ে কাছের ছোট রেঁস্তরাঁ থেকে চা খেয়ে টিউব ষ্টেশনে নেমে পড়লাম এবং ট্রেনে হাইড পার্কের কাছে এসে উঠলাম।

হাইড পার্কে অনেক দিন বেড়িয়েছি। হাইড পার্কের যদি তুলনা দিতে হয়, তবে একমাত্র হাইড পার্কই তার তুলনা। লণ্ডনের হাইড পার্ক স্বাধীনতার কেন্দ্রস্থল। ছোট স্টেণ্ডএর উপর দাঁড়িয়ে যা ইচ্ছা বলে যাও, কেউ কিছু বলবে না। সেখানে যীশু, মোহম্মদ, বুদ্ধ, শঙ্করের যেমন শ্রাদ্ধ হয়, তেমনি হয় চেম্বারলেন, দালাদিয়ের, মুসোলিনী, হিটলার ও স্টালিন প্রভৃতির। শুনতে ভাল লাগে শোন, নতুবা পথ দেখ, কারণ এটা হাইড পার্ক, বাক্‌-স্বাধীনতার পীঠস্থান। ভারতের সংবাদপত্র ধর্ম নিয়ে কথা

বলতেও ভয় পায়। ভয় এই যে, হয়তো গ্রাহক কমে যাবে নয়তো ছোরার আঘাতে সম্পাদকের প্রাণহানি হবে। কিন্তু হাইড পার্কে সে ভয় নাই। যারা স্বাধীনচেতা তারা ছোরা মারে না, তারা নীরবে সবই সহ্য করে যায়।

হাইড পার্কের বিজলি বাতিগুলি যেন সভ্যজগতের কলংকের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে অন্তত একটুখানি জায়গাকে স্বর্গীয় ছটায় আলোকিত করে রেখেছে, যেখানে মানুষ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। হাউড পার্কের স্নিগ্ধ মৃদু মন্দ বাতাস নরনারীর মনকে উদার ও নির্ভীক করে। হাইড পার্ক আনন্দময়। যুবক যুবতী জোড়া বেঁধে একে অন্যের কাছে আপন আপন সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করে। একে অন্যের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে এবং যতদূর সম্ভব নিজের কাজের জন্য অপরের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখে। যেখানে সহিষ্ণুতা বিদ্যমান সেখানেই স্বাধীনতার অংকুর গজায়, সেখানে সুখ এবং শান্তি আপনা হতে এসে দেখা দেয়।

সেই শান্তিময় স্থানে গিয়ে আমি এবং আমার বেকার সাথী একটি গাছের তলে বিশ্রামার্থ শুয়ে পরলাম। চিন্তা আমাদের আচ্ছন্ন করল। আমার কাছে অর্থ আছে তবুও ঘর পাচ্ছিলাম না, সাথীর শরীরে প্রচুর শক্তি, মুখে যৌবনশ্রী ছিল তবুও তার চাকরি জুটছিল না। এটা কি চিন্তার বিষয় নয়? আমি হাইড পার্ককে কেন স্বর্গ বলতে চেয়েছি তাও জানা উচিত। সেই কারণটি হল হাইড পার্কে বসে বা দাঁড়িয়ে, কলে কৌশলে নয়, সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় আপন মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। এটা কি কম কথা?

ভারতের বেকারে এবং ইউরোপের বেকারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ভারতের বেকার আপনার কপাল ঠুকে আর বলে, "ভাগ্য মন্দ, তাই খেতে পাচ্ছি না, কাজ পাচ্ছি না।" সেই ভাবকে পোষণ করার জন্য

হলিউড থেকে নূতন ধরনের ছায়াচিত্র ভারতে চালান দেওয়া হয়। হলিউডে ঐ ছবি বিনামূল্যেও কেউ দেখে না। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ নট তাতে সাহায্য করে না। ব্রিটেনেও এসব ছায়াচিত্রের স্থান নাই। সময়ের পরিবর্তনের সংগে মজুরদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন হচ্ছে। ব্রিটেনের মজুর এখন ভাবে, কাজ করার অধিকার তার আছে, কাজ পাবে না কেন? কে তার অন্তরায়? সাথী নেটিভ আমাকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলল। আমি মন দিয়ে তা শুনলাম। তারপর মন্তব্য করতে বাধ্য হলাম। আমি তাকে বললাম, "মজুর-জগতে যেরূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, আমার মনেও ঠিক সেইরূপ পরিবর্তনের অংকুর অনেক দিন পূর্বে গজিয়ে ছিল; এখন পত্রপুষ্পে শোভিত হয়েছে। পূর্বে আমি ভাবতাম, জীব আপন কর্মফলে কষ্ট পায়, এখন দেখেছি, তা সত্য নয়। এখন দেখছি, কতকগুলি বিশেষ লোকের কথায় নরসমাজ অন্ধ হয়ে তাদের উপদেশ মত চলে। আত্মবিস্মৃত হয়ে যারা অপরের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে, তারা নিজেদের সর্বনাশ ত করেই, উপরন্তু তারা নিজের সমাজকেও অপরের পদানত করে।" গভীর রাত্রে আমরা হাইড পার্ক পরিত্যাগ করে ইস্টলণ্ডনের এলগেটের কাছে একটি সেলভেশন আর্মির বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা করলাম।

সকালে উঠেই নেটিভ সাথীটি আমাকে সেলভেসন আর্মির বাড়ি দেখাতে লাগল। বাড়িটা তিনতলা। সকলের নীচের তলায় রেঁস্তরা, বসবার স্থান এবং সর্বহারাদের সামান্য কাপড় চোপড় রাখবার জন্য 'সেল' রয়েছে। অনেক সর্বহারা চা খেতে বসেছে। তাদের শরীরের দুর্গন্ধ উল্লেখযোগ্য। সেই সর্বহারাদের এমন পয়সা নাই যে দু'পেনি খরচ করে সপ্তাহে একবার স্নান করতে পারে। মোজাতে ঘাম লেগে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তার কথা বলতে আমি অক্ষম। এই সর্বহারাদের মোজা

পরিবর্তনের ক্ষমতা নাই। অন্য একটি থাকলে তবে তো বদ্‌লাবে? দ্বিতীয় মোজা জোড়া কিনার ছ'পেনি পাবে কোথায়? তাদের সংগে বসেই এক পেয়ালা চা খেলাম। চায়ে চিনি অতি অল্পই ছিল। চিনি কেন এত কম দেওয়া হয় জিজ্ঞাসা করলাম। ওয়েটার বলল, "এই ভদ্রলোকেরা গরম জলের বেশী পক্ষপাতী, তাই গরম জল বেশী করে দেওয়া হয়।" মাখনের পরিবর্তে মার্‌গ্যারিন্ ব্যবহার হয়। মার্‌গ্যারিন্ চর্বি হতে প্রস্তুত। খেলেই পিত্ত হয়। কিন্তু এই সর্বহারাদের পিত্তের ভয় করতে হয় না, পেটের ক্ষুধায় পিত্ত পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। বাড়িটার দুতলা এবং তিনতলা বেড়িয়ে দেখে এলাম। সারি সারি বিছানা সাজান রয়েছে। প্রত্যেক বিছানার নীচে একটি করে পাত্র রয়েছে। সর্বহারাদের ঘুমাবার পোষাক নাই, তাই তারা খালি গায়ে রেস্ট রুমে যেতে পাবে না, রাত্রে ঐ পাত্রে মূত্রত্যাগ করে।

ঘরের খোঁজে অনেক সময় কাটালাম। অনেক দরজার সামনে 'টু লেট' লেখা রয়েছে। নেটিভ সাথী যখন জিজ্ঞাসা করে ঘর খালি আছে কিনা, তখন ঘরের মালিক বলে, "নিশ্চয়ই খালি আছে।" ঘরের ভাড়া ঠিক হয়, অনেক রকম সুবিধার লোভ দেখান হয় কিন্তু যেই নেটিভ সাথী বলে, ঘর ভাড়া করা হচ্ছে আমার জন্য, তখনই সকল চুক্তির অবসান হয়। এইভাবে অর্ধেক দিন কাটিয়েও যখন ঘর পাওয়া গেল না, তখন আমরা চললাম যথাস্থানে—যেখানে কালো লোকেরা থাকে। মর্‌নিংটন্ ক্রিসেন্ট নামক স্থানে যাবার পর ঘরের সুব্যবস্থা হল, রান্নার বন্দোবস্ত হল, জিনিসপত্র আনা হল। দস্তুর মত ছোট একটা সংসার পেতে এবার লণ্ডন দেখার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রিজেন্ট পার্ক হতে আরম্ভ করে ছোট বড় অনেক পার্ক দেখলাম। প্রায় সকল পার্কেই বোমা পড়া এবং গ্যাস হতে রক্ষা পাবার জন্য ছোট

ছোট গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে ঘর প্রস্তুত হয়েছে। নেটিভ সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আগামী যুদ্ধে এইসব ঘর গ্যাসের হাত থেকে তাদের সত্যিই রক্ষা করতে পারবে কি? আমি তার মুখখানা ভাল করে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কখনও চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়েছেন।" "হ্যাঁ, গিয়েছিলাম" বলে নেটিভ সাথী জবাব দিল। আমি বললাম, "আর আমাকে জবাব দিতে হবে না, নিজেরটা নিজেই বুঝুন।" এ বিষয়ে আমরা আর আলোচনা না করে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। উপসংহারে গ্যাস সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তাতে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, সভ্যতার বাইরে যারা আছে, তারাই বাঁচবে আগামী যুদ্ধে, আর সকলেরই একরকম দম বন্ধ হবে যদি গ্যাসের ব্যবহার হয়।

নিউইয়র্ক রওনা হবার পূর্বে লণ্ডনে প্রায় আট সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম প্রত্যেক দিন নানারূপ চমকপ্রদ বিষয়ের আলোচনাতেই কাটত। যেখানে কথা বলবার অধিকার আছে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কথা বললে পুলিস এসে দরজায় ধাক্কা দেয় না, সেখানে আলোচনায় সুখ পাওয়া যায় প্রায়ই নানারূপ লেকচার শুনতাম, আলোচনাতে যোগ দিতাম, এতে মনে বেশ আনন্দ হ'ত। এখানকার লোক মুখ লুকিয়ে মোটেই কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে ভাবতাম আইরিশরা এত গণ্ডগোল করছে, সেজন্য তাদের পক্ষেই সভা হচ্ছে, বিপক্ষের ত কোন কথাই কেউ শুনছে না? যা হোক আমার রুমের কাছে একজন আইরিশ থাকত এবং সে এসে নানা কথা বলে বিরক্ত করত। সেজন্য স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ১৬ নম্বর মর্নিংটন্ ক্রিসেণ্ট হতে ১৮ নম্বর বাড়িতে এই কারণেই সরতে বাধ্য হলাম। এ বাড়িটার সামনেই এক বিরাট কারখানা। সেই কারখানাতে "ক্রাভান এ" নামক সিগারেট তৈরী হয় আইরিশরা এই কারখানাকে আতংকগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। যে

বাড়িতে এসেছি তার মালিক হলেন একজন স্ত্রীলোক। তাঁর জন্মস্থান বার্মিংহামে, মিঃ চেম্বারলেনের বাড়ির কাছে। এই মহিলার স্বামী একজন চীনা ভদ্রলোক, তাই তাঁর গৃহে আমার স্থান হয়েছিল।

পুলিস কারখানা বাড়িটা বেশ পাহারায় রাখার বন্দোবস্ত করেছিল কিন্তু সেই পুলিস-পাহারার দিকে লক্ষ্য করত না। লোকে কোনরূপ ভয়ও করত না। লোক চলছে নির্বিকার চিত্তে। আইরিশদের কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করত না। সে ভুল ইচ্ছাকৃত নয়, কারণ সে বিষয়টা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। বোমা ফাটছে, লোক মরছে, ঘর ধ্বংসে পড়ছে তবুও বিষয়টা গ্রাহ্যের নয়! এই অগ্রাহ্যের ভাব কাদের দ্বারা সম্ভব? লক্ষ লক্ষ আইরিস লণ্ডনে বাস করছে, তাদের মাঝে এমন কেউ সংবাদপত্র মারফতে দুঃখও প্রকাশ করছে না। তার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, শুধু বিষয়টা অগ্রাহ্য। যারা বিপদে পড়লে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে, তাদের কাছে বিষয়টার গুরুত্ব আছে। ১২ নম্বর গাওয়ার স্ট্রীটে এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে তার প্রচার আছে, কিন্তু লণ্ডনের কোনও ক্লাব তার কথা মোটেই ভাবছে না, সংবাদপত্রগুলিও তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যারা বীর তার সামান্য বিষয় নিয়ে হৈচৈ করে না, তারা তৎপর হস্তে বিক্ষোভ দমন করে।

এ অন্চলে অনেক সাইপ্রাসবাসী থাকে। তাদের নাক মুখ এবং শরীরের গঠন দেখবার মতই। একজন সাইপ্রাসবাসীর সংগে ভাব করে তাকে নিজের ঘরে এনে নানারূপ কথা বলেছিলাম। লোকটি রুটি বিক্রি করত। তার চেহারা দেখলে মনে হয় না সে ফরসা। তার ব্যবসা বেশ ভাল, কিন্তু যদি তার চেয়ে ভাল রংএর কোনো কাশ্মীরী ঐ ব্যবসা করতে আরম্ভ করে, তবে তার ব্যবসা চলে না। অনেক কাশ্মীরী

যতক্ষণ নিজেকে ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় না দেয়, ততক্ষণ তাদের সকল ব্যবসাই চলে। যেই তার পরিচয় বের হয় অমনি তার কারবার বন্ধ হয়ে যায়।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, একদিন মিঃ চেম্বারলেনের বাড়িটা গিয়ে দেখে আসি। ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের কথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যেখানে সেখানে শোনা যায়। কলোনিয়্যাল অফিস, ইণ্ডিয়া অফিস, এ সবই কাছে কাছে অবস্থিত। তাই সামান্য সময় সেদিকে কাটলে মন্দ হবে না ভেবে ডাউনিং স্ট্রীটে গেলাম। তখন বেলা দশটা। লণ্ডনে কোনদিন আমি এত সকালে ঘুম থেকে উঠিনি। আমার নিয়ম ছিল প্রাতে তিনটায় শোয়া এবং বারটায় শয্যা ত্যাগ করা। কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ঘুম ভেংগে গেল, তাই এত সকালে সেখানে যেতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম ১০নং বাড়ির সামনে অনেক সেপাই থাকবে, ইনফরমার, গুপ্ত পুলিস এ সব তো নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখি সেই গলিটায় একটা লোকও নাই। সেকেলে ধূসর বর্ণের উঁচু বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। দেখার মত কিছুই নাই, তাই চলে আসলাম।

বিকালে দশটায় ঘুম থেকে উঠে নেটিভ সাথীটিকে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। সর্বপ্রথমই গেলাম একটি চায়ের দোকানে। চা খাওয়া হয়ে গেলে আমরা চললাম টেমস নদীর তীরে। রাত তখন গভীর। পথে লোকজনের চলাচল কম। মাঝে মাঝে দু-একটা মোটরকার একটু বেশী জোরে ছুটে চলেছে। সামনেই টেমস নদী যেন কলকাতার গংগা। নদীর জলে আলো পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। নদীর জল নীরবে সাগরের দিকে চলেছে। দেখলাম, আমাদের মত আরও অনেকে নদীর সৌন্দর্য দেখতে এসেছে। তাদের অনেকের শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ বস্ত্রে আবৃত। শুধু পুরুষ নয় স্ত্রীলোকও আছেন। সবাই নীরবে চলেছে।

পুরুষরা সব সময়েই মেয়েদের সম্মান দেখায় এটা ইউরোপীয় সমাজের একটা সুন্দর রীতি। আমি তার অনুকরণ করতে ভুলিনি। যখনই অসাবধানে কোনও স্ত্রীলোক আমার উপর এসে পড়ছিলেন তখনই আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম কিন্তু ফল তাতে সুবিধাজনক হয় নি। রমণীরা ভেবেছিলেন আমার কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। আমি পরাধীন ভারতবাসী কিনা, তাই দু-একবার আমার নেটিভ সাথীটিকে পথচারী মহিলাগণ সাবধান করে বলেছিলেন "এমন লোকের সংগে চলছ কেন?" তা ওদের দোষ নয়; আমাদের দেশের নাবিক, ছাত্র এবং ভদ্রলোক অনেক সময় লণ্ডনে গিয়ে ভুলে যান যে তারা লণ্ডনে কি কলকাতায়। অশিষ্টতায় তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেন। টটেনহামকোর্ট রোডে যদি কোনও ইণ্ডিয়ান নাবিক এসে বিকালে দাঁড়ায়, তবে পুলিস অমনি গলাধাক্কা দেয়, কখনও বা ধরেও নিয়ে যায়। সেরূপ নালিশ আমার কাছে অনেকবার অনেকে করেছিলেন। এর প্রতিবাদ করবার জন্য টটেনহামকোর্ট রোডে একদিন গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলাম, কারণ ভাল করেই জানতাম এখানকার পুলিস অমানুষ নয় মানুষ, আমাদের দেশের পুলিসের মতন তারা নয়। টটেনহামকোর্ট রোডে পুলিশ আমাকে পথে দাঁড়াবার জন্য ধরেছিল! যখন আমি এ বিষয়ে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলাম তখন পুলিস আমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। পুলিস বুঝতে পেরেছিল আমি অসৎ লোক নই।

ইউরোপীয়দের মাঝে চোর লম্পট ডাকাত সবই আছে কিন্তু তাদের মাঝে নারীধর্ষণ কমই হয়। "ওয়ার্ল্ড নিউজ" নামক পত্রিকা ব্রিটিশ জাতির যত দোষ ও নিন্দার বিষয় সর্বদাই প্রকাশ করে। পড়লে দেখা যায় নারীধর্ষণের বিবরণ তাতে অতি অল্পই আছে। আমাদের দেশে নারীধর্ষণ তো সমাজের অংগের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশী রাত্রি

পর্যন্ত আর বাইরে থাকলাম না, কারণ আমার নেটিভ সাথীটি কাল পল্টনে ভরতি হবে। পেটে কিছু দিতে হলে, মাথা গোঁজবার স্থান পেতে হলে, এ ছাড়া আর উপায় তার ছিল না।

এই জগতে প্রগতিশীল জাতি একটা মাদকতার মাঝেই থাকতে ভালবাসে। জার্মান, ইতালিয়ান, রুশ, জাপানী এই সব জাতির মধ্যে সেই মাদকতা আছে, তাই তারা কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করে না কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সে মাদকতা নাই। সেই একঘেঁয়ে রক্ষণশীল দলের একই ধরনের কথা' ঐ যায় ঐ ধরি'। আমার ধারণা, বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয়তার অভিব্যক্তি ব্যাহত হয়। যাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব আছে পার্লামেণ্টে তাদের দল হালকা। বিদ্রোহের ভাব না থাকলে জাতীয় মানসিকতায় উন্মাদনা আসে না। বিদ্রোহের ভাব জাতীয়তায় ঔদার্যও আনে। সেই কারণে মানুষ দেশের জন্য, জাতির জন্য প্রাণ তো দূরের কথা, তার চেয়েও মূল্যবান জিনিষ যদি কিছু থাকে, তাও দান করবার প্রেরণা পেয়ে থাকে।

রুশিয়ার সংগে প্যাক্ট কর, অতি সত্বর তা কাজে পরিণত হউক, এ কথা সকলের মুখে, সকল সংবাদপত্রে প্রত্যেক দিন লেখা হচ্ছে। মিঃ লয়েড জর্জ থেকে আরম্ভ করে পথের পথিক পর্যন্ত এই মতের পোষক। হাইড পার্কে লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে কত বক্তা রুশিয়ার সংঙ্গে প্যাক্টের উপকারিতার কথা প্রচার করেচেন তার আর ইয়ত্তা নাই। হাইড পার্কের বক্তৃতা শোনাটা আমার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক গণ্যমাণ্য ভারতবাসী বলে থাকেন হাইড পার্কে নাকি কোনও ইউরোপীয় ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন না। এ সব লোকের কথা মোটেই সত্য নয়। তথাকথিত ভারতীয় ভদ্রলোকেরা তথায় যান না। অন্তত আমি একজন ইণ্ডিয়ানকেও তথায় যেতে দেখিনি। সেদিন এক পার্লামেণ্ট সদস্য

বক্তৃতা দিবেন, সেজন্য হাইড পার্কে অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম এই বুঝি ইংলিশ ভদ্রলোকের প্রথম আগমন। তাঁরই বক্তৃতা শুনতে আগ্রহ করে দাঁড়ালাম গিয়ে। তিনি রুশিয়ার সংগে প্যাক্ট করার যুক্তি দেখালেন। তিনি বলেছিলেন, যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হয় তবে রুশিয়ার সংগে মিতালি অবশ্য কর্তব্য। প্রশ্ন করার সময় আমি বলেছিলাম, "এ যে আদায় কাঁচকলায় মিলন, এও কি সম্ভব ?" তিনি বলেছিলেন—"Pact is adjustable because it is nothing but a pact." সংগে সংগে এ কথাও বলেছিলেন, "আদা আর কাঁচকলার মিলকেই বলে প্যাক্ট।"

নেটিভ সাথীটি যাবার বেলায় আমার অন্য এক সাথী জুটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। ইনিও বেকার। এর পল্টনে ভরতি হবার উপায় ছিল না। জাতিতে ইনি গ্রীক। এখনও তিনি বৃটিশ নাগরীক হতে সক্ষম হননি তাই আমার সংগে বন্ধুত্ব করতে একরকম বাধ্যই হয়েছিলেন। এর মতবাদটাও অন্য রকমের। এঁর পিতা বাধ্য হয়ে এথেন্স পরিত্যাগ করেছিলেন। এঁদের মত হল, গৃসে রিপাব্লিক গভর্ণমেণ্ট হওয়া চাই। যেদিন রাজা জর্জ এথেন্স পৌঁছেছিলেন, সেই দিনই মিঃ হরেসিও, এঁর পিতা, সপরিবারে ইউরোপের নানা দেশ বেড়িয়ে শেষটায় লণ্ডনে এসে পৌঁছেন। ডিমক্র্যাসি আর হিপক্র্যাসি শব্দ দুটো আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, যেন একটা ফ্যাশন। আমি কিন্তু এ দুটা কথা ব্যবহার করতাম না কারণ যার দেশ স্বাধীন নয় তার কাছে ডিমক্র্যাসি আর হিপক্র্যাসি একই কথা। আমার নবাগত বন্ধু হিপক্র্যাসি শব্দটাই ব্যবহার করতেন বেশী।

নূতন বন্ধু আসার সংগেই নূতন আতংকের সৃষ্টি হল। তিনি বরাবর বলতে লাগলেন, "আপনি আমেরিকা যাবার টিকিট কিনে রাখুন। যদি

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তবে মহা বিপদে পড়বেন।" নূতন সাথীটিকে বলেছিলাম, "এ দেশ ছাড়বার আগে একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখতে হবে।" কথাটা তিনি বুঝতে পারেননি, কারণ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সাধারণের কাছে শুধু 'ইয়ার্ড' নামে পরিচিত। অনেক কথার পর যখন বুঝলেন তখন বললেন, "এতে আর কি, গেলেই হল।" এ যেন আমাদের দেশের যাত্রাগানের আসর, কষ্ট করে গেলেই যেখানে হ'ক ঠেসাঠেসি করে বসতে পাওয়া যাবেই। আমি ভাবছিলাম, আবেদন-নিবেদন করব, তারপর পাস আসবে, কত কি হবে, তারপর বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হয়তো মনের বাসনা পুরাতে হবে। নূতন সাথীটি একদিন ঘুম থেকে উঠেই বললেন, চলুন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দেখতে যাই।

বাসে যাওয়া ঠিক হল। অটোগ্রাফের বইটা সংগে করে নিলাম, উদ্দেশ্য যদি বড় কর্তার দেখা পাই তবে তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে আসব। আমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই আমার নূতন বন্ধু বললেন, "এখানে আপনি একা যান, তাতে ভাল হবে, নেটিভ সংগে থাকলে ওদের সন্দেহ হবে।' হন্‌হন্‌ করে একটা অফিসে গিয়ে টোকা দিলাম। প্রবেশের অনুমতি পেলাম। ঢুকে অভিপ্রায় জানাতেই শুনলাম, "আরে না মশায়, এটা নয়, পাশের দরজায় গিয়ে টোকা দিবেন।" একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। আসার উদ্দেশ্য ?"

"আসার উদ্দেশ্য, দেখা, এর বেশী নয়।"

"এটা যে মিউজিয়ম নয় চিড়িয়াখানাও নয়, তা কি মহাশয় জানেন ?

"আজ্ঞে হাঁ, তা বেশ জানা আছে। ইংলিশ উপন্যাস পড়লেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর কথা পড়তে হয়। আমার ইচ্ছা হয়েছে, একবার স্থানটাকে দেখে আসি, তাতে উপন্যাসের পাতা উলটাতে সুবিধা হবে।"

ভদ্রলোক আমার কথা শুনে সংগে একজন লোক দিলেন, সেই লোকটি আমাকে অন্য এক রুমে রেখে চলে গেল। একে একে সেখানে অনেক অফিসার এলেন। যদিও কেউ কিছু বললেন না তবুও তাদের চাহুনি দেখে বুঝলাম সবাই যেন আমাকে প্রশ্ন করতে উৎসুক। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে একে একে সকলেই চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন লম্বা এবং গম্ভীর লোক এসে আমায় কাছে বেশ আরাম করে বসে বললেন, "আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি ?"

"আজ্ঞে সেরূপ কিছু নয়, তবে বাড়িঘরগুলি দেখলে আনন্দিত হব, হয়তো বই লেখার পক্ষে সুবিধা হবে।"

"তবে আপনি লেখক, তা কি দেখবেন চলুন।" এই বলেই তিনি চললেন আমি তাঁর পেছনে চললাম। অনেক দেখলাম কোথাও বিভীষিকা নাই। সর্বত্রই সহজ ও সরল ভাব। ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে থার্ড ডিগ্রি কোথায় দেওয়া হয় সে স্থানধা একটু দেখতে চাই।" ভদ্রলোক বললেন, "থার্ড ডিগ্রির ব্যবস্থা আমাদের শাসিত দেশগুলিতে রয়েছে যেখানে ভয় দেখিয়ে অসভ্যকে সভ্য করতে হয়।" আর দেখতে ভাল লাগল না। বিদায়ের বেলা সেই লম্বা এবং গম্ভীর ভদ্রলোকটির অটোগ্রাফ নিয়ে আসতে ভুলিনি। পথে আসার সময় কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যই তো, অসভ্যকে সভ্য করতে হলে ভয় দেখানো দরকার। আমরা কলোনিয়েল দেশের লোক, তবে কি আমরাও অসভ্য ?

এবার আমেরিকার টিকিট কেনার পালা। ভেবেছিলাম, টাকা ফেলব আর টিকিট নিব। কিন্তু আমেরিকা কেন, যে কোনও বিশেষ দেশে যেখানে একটু অর্থাগমের পথ খোলা আছে, সেখানকার টিকিট কিনতে ভারতীয়দের বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। বাংগালী ও পলাতক

জার্মান ইহুদী দ্বারা পরিচালিত একটা নূতন টুরিস্ট কোম্পানীতে টিকিট কিনতে গেলাম। তারা ত আমাকে পেয়েই খুশী। তারা হয়ত জানত না যে ভারতবাসীর পক্ষে আমেরিকার টিকিট কিনা তত সহজ নয় নতুবা এমন অনুগ্রহ এবং আগ্রহ দেখাত না। আমি চুপ করে বসে ওদের চালচলন দেখতে লাগলাম। এদিকে জাহাজ কোম্পানীতে টিকিট কেনার জন্য লোক পাঠান হল। জাহাজের নাম জর্জিক, আটাশ হাজার টন, অল্প 'রলিং' এ নড়বেও না। কিন্তু টিকিট নিয়ে আসছে না কেন? বেলা তিনটা পর্যন্ত বসে বললাম, "মহাশয়রা টিকিট খানা আসলে রেখে দিবেন, আমি কাল এসে নিয়ে যাব।" এই বলেই চলে আসলাম।

নূতন সাথীটি আমাকে বলতে লাগল, টিকিট বিক্রি না করার কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না, যুদ্ধ তো বাধে নি?" ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদীরা কত যে হীন করে রেখেছে, তা সামনে দাঁড়িয়েও ঐ গ্রীক যুবক বুঝতে পারছিল না। ভারতবাসীর দরজা চারিদিক থেকে বন্ধ। যারা লণ্ডনে যায়, তারা একথা হাড়ে হাড়ে বোঝে, কিন্তু সেকথা স্বদেশে এসে বলে না। চড় খেয়ে চড় হজম করে। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম তখনও টিকেট আসেনি। অফিসের চাপরাসীকে নিয়ে জর্জিকের অফিসে গেলাম। ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে ছোট কর্মচারী পর্যন্ত বলতে লাগল, ভিসা পেলেই তো হবে না, ফিরে আসার টাকা জমা দেওয়া চাই। এটি না হলে যেন টিকিট বিক্রিই হতে পারে না। তাদের কথা শুনে ব্যাংকের জমা একশত পাউণ্ড-এর একখানা রসিদ দেখালাম জর্জিক জাহাজে প্রচুর স্থান ছিল। জাহাজের মানচিত্র দেখে জাহাজের মধ্যস্থলে আমার ক্যাবিন ঠিক করতে বললাম। অনেক চিন্তা করে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হল, কারণ তখনও জাহাজে অনেক জায়গা

ছিল। স্বর্ণময় চকচকে মুদ্রাকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল ক্রুগার যেমন পদাঘাত করতে পেরেছিলেন, তেমন আর কেউ পারেন নি। লণ্ডনের জাহাজ কোম্পানীও টাকার গোলাম, তারা স্বর্ণ মুদ্রাকে মাথায় করার বদলে কি পদাঘাত করতে পারে? অনেক কষ্ট করার পর যখন আমার টিকিট কেনা হল, আমি তখন শান্তিতে নূতন সংগীকে নিয়ে রিজেণ্ট পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম। রিজেণ্ট পার্কের ঘাসের উপর বসতে আমি বড়ই ভালবাসতাম তাই রিজেণ্ট পার্কে গিয়ে তথায় বৃক্ষতলে বসে পবিত্র বায়ুতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে লাগলাম। লণ্ডন নগরের অসংখ্য কলকারখানার চিমনি থেকে কয়লার ধুঁয়া বের হয়, তা নিয়তই শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেইজন্যে লণ্ডনের অধিবাসীরা দুটি করে রুমার রাখে। রিজেণ্ট পার্কের বাতাসে সেই কদর্যতা ছিল না, সেখানে বসতে ভাল লাগার সেও একটা মস্ত কারণ।

আতলান্তিক সাগরের বুকে

উত্তরে মেরু হতে শুরু করে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত আতলান্তিক সাগর বিস্তৃত। কেপটাউন হতে লণ্ডনে আমি জাহাজে করেই এসেছি কিন্তু তাতে আতলান্তিকের গন্ধ যেন পাইনি বলেই মনে হয়েছিল। এবার আমি খাঁটি আতলান্তিক সাগর পার হব। এই উদ্দীপনা যদিও আমার মন আমেরিকার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তবুও লণ্ডন নগর পরিত্যাগ করতে কি যেন একটা সংকট এসে দেখা দিচ্ছিল। এখানে বসে ইউরোপের তাজা সংবাদ যেমন পাওয়া যায় আমেরিকায় গেলে কি সেরূপ তাজা খবর পাব ? ইউরোপ হবে রণাংগণ, ইউরোপই হবে ভবিষ্যতের মানব জাতির ইতিহাস গড়বার স্থান ; সেই ভাংগা গড়ার দৃশ্য দেখব, না আমেরিকায় গিয়ে নতুন পৃথিবী দেখব তাই নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয়েছিল। এদিকে জাহাজের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, যদি তাই না হ'ত তবে হয়ত আমেরিকা যেতামই না।

লণ্ডনে ভারতবাসীর যেমন সভা সমিতি হচ্ছিল, তেমনি গ্রীক, তুরুক, স্লাভ, ফ্রেন্চ, আরব, জু এসবের রেঁস্তোরায়ও ভবিষ্যতের যুদ্ধ নিয়ে বেশ আলোচনা চলছিল। আরব এবং জু একই টেবিলে বসে যখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করত, সে দৃশ্য দেখতেও আমার ভাল লাগত। আরব এবং জুতে যে প্রভেদ গড়ে উঠেছে তা বাস্তবিক তৃতীয় পক্ষের দ্বারা সাময়িক ভাবে তৈরী করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরব এবং ইহুদীতে যে মনোবিবাদ থাকবে না তার শুধু ইহাই প্রমাণ নয়, এসম্বন্ধে আরও দেখেছি আরও শুনেছি। এসব দেখবার জন্যই লণ্ডন তখনকার দিনে আমার কাছে বেশি আরামদায়ক ছিল।

বিদেশী ব্যবসায়ী মহলেও যাওয়া-আসা করেছি। এদের মধ্যে তুরুক, বুলগার, শ্লাভ, মাঝারু, জার্মান, স্প্যানিস, ইটালিয়নো—অনেকের সংগে কথা বলেছি। প্যালেস্টাইনের ইহুদী এবং আরবদেরে একই রেস্তরাঁয় বসে খেতে দেখেছি। সকলের মুখে এক কথা,—এমন করে জীবন আর কয়দিন কাটবে। যেন সকলেই কিছু একটা পরিবর্তন চায়। সে পরিবর্তন কোন্ দিক দিয়ে কি প্রকারে আসে, তাই দেখবার জন্যে যেন সকলেই উৎসুক। মাঝে মাঝে দৈনিক 'ডেলি ওয়ারকার্' পাঠ করতাম। তার সম্পাদক আমাদের দেশের লোক। সেই সংবাদপত্রে কন্‌টিনেণ্টের রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা থাকত এবং ভারতের সংগে তার তুলনাও হত। শুনলাম, ভারতীয় ছাত্রেরা এই সংবাদপত্র পাঠ করতে ভয় পায়।

লণ্ডন পরিত্যাগ করার দিন পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে মিঃ দত্ত এবং গ্রীক সাথীটিকে সংগে নিয়ে ওয়াটারলু স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। প্রত্যেক গাড়িতে যাঁরা যাত্রী তাঁদের নাম লেখা ছিল। আমারও নাম লেখা ছিল। আমার কম্পার্টমেণ্টে তুজন প্রফেসর এবং একজন ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন, আমাকে নিয়ে চারজন। আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির কথা মনে হওয়ায় বড়ই তুঃখ হল। কম্‌পার্টমেণ্টে উঠে মনে হল সংবাদপত্রের কথা তাই সাথীদের সংবাদপত্র কিনে দিতে বললাম। সাথীরা সেদিন সকালের পাঁচখানা সংবাদপত্র কিনে আমার হাতে দিয়ে বিদায় নিলেন। গাড়ি চলল সাউথ্‌হাম্‌টনের দিকে। গাড়ি কোথাও থামল না। আমি একাগ্রভাবে পথের তুদিকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। পথের তুদিকের সৌন্দর্য আমাদের দেশের মতই। ফ্রান্‌সের সৌন্দর্য বোধে এবং ব্রিটেনের সৌন্দর্য বোধে অনেক প্রভেদ। ফ্রেন্‌চরা গাছের ডাল কাটে যখন গাছে নতুন পাতা গজায়। এরা শুকনা ডালও ভাংগে

না। আমাদের দেশে অভাবে পড়ে অনেকে আজকাল হয়ত শুকনা ডাল ভাংগে কিন্তু পূর্বে তা করত না। এখানে ফ্রেন্চ রুচি এবং ব্রিটিশ রুচিতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

গাড়ি সাউথ্হামটনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি ইচ্ছা করেই সকলের শেষে নামলাম। আমি জানতাম কষ্ট আমার পথ আগলে বসে আছে। গাড়ি হতে নেমে জর্জিক জাহাজের দিকে অগ্রসর হলাম। পাশেই দাঁড়ানো নরম্যানডিও আমেরিকায় যাবে। জর্জিকে যারা যাবে, তারা জেঠির পথ ভিড় করে বন্ধ করেছে। আমার তাতে লাভই হল, আমি দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম। চীনা যুবকগণ নিজেদের দেশের সৈনিকের পোষাক পরে জাহাজে উঠছে, তারা চলেছে লড়তে জাপানীর সংগে। তাদের সকলের মুখেই হাসি। অন্যান্য জাতের লোকও বুক উঁচু করে পথে চলছে। শুধু আমারই মুখ ম্লান। আমি বোধহয় এতবড় ডক্টাতে একমাত্র ভারতবাসী ছিলাম।

সকলে পাসপোর্ট দেখিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল আমার বেলা কিন্তু অন্য রকমের ব্যবহার। আমার মুখ দেখেই পাসপোর্ট অফিসারের পিলে চমকে গেল। একজন অফিসার আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। আমি গিয়ে একটা বেন্চে বসলাম এবং নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবছিলাম আজ হায়দরাবাদের নিজাম যদি আমার মত এখানে এই অবস্থায় পড়তেন, তা হলে তাঁর অবস্থা কেমন হত? অবশ্য জাহাজ আমাকে ফেলে যাবে না তা আমি ভাল করেই জানতাম। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "এ টিকিট কে আপনাকে বিক্রি করেছে?"

"জাহাজ কোম্পানি।"

"আমেরিকার ভিসা আছে?"

"আছে।"

"কৈ দেখি ?"

"এই দেখুন।"

"বহু পুরাতন।"

"তা পুরাতন বটে।"

"সংগে কত টাকা আছে ?"

"এ কথা তো অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করেননি, আমার বেলায় কেন ?"

"আমার ইচ্ছা। এ জাহাজে হয়ত আপনার যাওয়া হবে না।"

"আপনাদের অনুগ্রহ।"

পাসপোর্ট এবং টিকিট নিয়ে অফিসারটি আর এক অফিসারের কাছে দৌড়াল। উভয়ে মিলে কোথায় টেলিফোন করল, তার পর ফিরে এসে বলল, "আপনি এই জাহাজেই যেতে পারেন।" আমি তাদের বললাম, "আপনারা যে আচরণ করেছেন, তা শিষ্টাচার নয়, তবু সেজন্য আপনাদের উপর আমার রাগ হয়নি। দোষ আমারই, কারণ আমি পরাধীন দেশের লোক।"

অফিসার বলল, "পরাধীন জাতের মধ্যেও সিংহের জন্ম হয়—চলুন আপনার পিঠের ঝুলিটা এগিয়ে দিই।" এই কথা বলে সত্যিই লোকটি আমার ঝোলাটা নিয়ে আমার সংগে জাহাজের সিঁড়ি পর্যন্ত চলল। জাহাজে উঠে একটু শান্তি পেলাম এবং লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলাম।

আমার কেবিনের নম্বর আমার জানা ছিল। দেখতে লাগলাম কোনদিকে সেই কেবিন। একজন লোক এসে আমাকে কেবিন দেখিয়ে দিল। পিঠ-ঝোলাটা সেখানে রেখে, টুপিটা খুলে, একটু বসলাম। বেশ আরাম বোধ হল। তারপর ভাবতে লাগলাম, আমার জীবনের, আমার

দেশের এবং আমার জাতের কথা। যতই ভাবছিলাম, ততই রাগ হচ্ছিল, বাইরে যাবার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেউ আমায় বিদায় দিতে আসেনি, কেউ আমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসেও ছিল না, তবে কেন জাহাজের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান।

কেবিনেই হাত মুখ ধোয়ার গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ছিল। হাত মুখ ধুয়ে ভাবলাম, গিয়ে দেখি, হয়ত রাজা ষষ্ঠ জর্জ আমেরিকা থেকে ফিরে আসছেন। এই জেটিতেই তাঁর জাহাজ ভিড়বে। কেবিন হতে বার হবার পরই একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম রামনাথ ?" বললাম, "হ্যাঁ, কি দরকার ?" সে বলল, "এই চিঠিটা আপনার বন্ধু হোর‍্যাসিও দিয়েছে, গ্রীক ভাষায় লিখেছে বলেই পড়ে শোনাতে এসেছি।"

পত্রে ছিল, তিনি আমেরিকা যাবেন বলে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রাখতে পারলেন না কারণ শীঘ্রই ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তাই তিনি কন্‌টিনেণ্টে চলে যাচ্ছেন। যদি পারেন, তবে ভারতে গিয়ে কলিকাতার ঠিকানায় আমার সংগে দেখা করবেন। চিঠিতে এ কথাও ছিল যে, পত্রবাহকও গ্রীক,—লোক ভাল; তার সংগে আমি আলাপ করিতে পারি। পত্রটা হাত থেকে নিয়ে দেখলাম, সেটা গ্রীক ভাষাতেই লেখা বটে এবং তারই সেই দস্তখত! আমরা দুজনে জাহাজের ডেকে গেলাম; দেখলাম রাজা জর্জকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপরে বিরাট আয়োজন চলছে। জাহাজ তখন ডক্ ছাড়েনি। আমি কাস্টম অফিসারের প্রসংগই শুরু করলাম। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বললাম, দোষটা আমাদের জাতেরই; কারণ আমরা পরাধীন। ভদ্রলোক বললেন, "আপনাদের জাতের দোষ আর থাকবে না।" কথাটা আমার খুব ভাল লাগল।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কান দুটা অবশ হয়ে আসছিল। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি এসে মাথায় পড়ছিল। তবুও নাবিকের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল রাজাকে সম্মান দেখাতে। আমেরিকান, ইতালিয়ান, জার্মান সকলেই টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিল। সকলেই বলছে, ওই বুঝি রাজার ক্রুজার আসছে। খালি চোখে দৃষ্টি বেশী দূর যায় না। এ আকাশ আমাদের দেশের আকাশ নয়। এ হল মেক্সিকো উপসাগরের আকাশের এক অংশ। কখন কিরূপ থাকে, তার ঠিকানাই ঠিক নাই। কখনও শান্ত, কখনও গম্ভীর, আর কখনও বা পাগল হয়ে মাতলামি শুরু করে। আকাশের নীচের সাগরও সেই রকমই। দয়া মায়া নাই, শুধু বিরাট তরংগমালা।

কতক্ষণ পর একটা বড় ক্রুজার প্রবল বেগে আমাদেরই জাহাজের কাছ দিয়ে চলে গেল। তীর হতে কামান গর্জে উঠল। তারপর আর একখানা ক্রুজার, তারপর রাজার জাহাজ, তারপর আর একখানা ক্রুজার তীরের মত চলে গেল। আমাদের জাহাজের মাঝিমাল্লা নাবিক সকলেই নমস্কার জানাল। যাত্রীর দল নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দর্শকমাত্র। কেউই আমার দিকে কেউ চেয়ে নেই বলেই আমি মনে করছিলাম কিন্তু হঠাং দেখলাম, সকলে আমারই দিকে চেয়ে আছে। ভাবলাম যদি এটা কলকাতা হত, তবে আজ এত কাছে দাঁড়ানো ত দূরের কথা, হয়ত আমাকে ঘরে বন্ধ করে পুলিশ পাহারায় রাখা হ'ত। আমার জীবনে এরকম ব্যাপার ঘটেছে দুবার। কিন্তু এটা রাজার নিজের দেশে সেজন্যই আমার সে দুর্দ্দশা ঘটেনি। আগামীকাল যে জাতের সংগে শত্রুতা শুরু হবে, সেই জার্মানও যেমন সহজভাবে রাজদর্শন করছে, রাজভক্ত বৃটিশ প্রজাও সেরূপ রাজদর্শন করছে। রাজার জাহাজ চলে গেল; উপকূলে কামানের গর্জন অনেকক্ষণ শোনা গেল; আমরা আপন

আপন কেবিনে ফিরে এলাম। এবার দুপুরে খাবারের পালা। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম, তাতে চারজন হাংগেরীয়ান এবং দুইজন হাংগেরীর ইহুদী বসেছিলেন। এরা কেউ ইংলিশ জানেন না। তারা কৃষক, আমেরিকায় বসবাস করতে যাচ্ছেন। কৃষকের আদর সর্বত্র তাই তাদের সামনে নানারূপ খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই গন্ধ আমার কাছে বেশ ভাল লাগছিল বোধহয় কৃষকেরা খাদ্যসম্ভার উৎপাদন করেই সুখী, খাওয়ার দিকে তাদের তেমন মন নাই। তারা ফলমূল আমারই দিকে ঠেলে দিল। বুঝলাম, কৃষকের মন উদার অন্যদের মতন কালা আদমীদের উপর তাঁদের ঘৃণা নাই। শেষের দিকে মনে হল কৃষকেরা যেন খেয়ে তৃপ্ত হয়নি। একটা কথা মনে হল ওয়েটারকে ডেকে বললাম, "এদের এক গ্লাস করে বিয়ার দিলে ভাল হয়।" "তাই তো ; আমারও তাই মনে হয়। তবে বিয়ার দিবার আমার অধিকার নাই।" আমি বলিলাম, "কথাটা যেন পারসার পর্যন্ত পৌঁছে।"

তৎক্ষণাৎ পারসার এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি ? আমি তাঁকে হাংগেরীর কৃষকদের অসুবিধার কথা জানালাম। বললাম তাঁদের দেশে আমি অনেক দিন ছিলাম ; তাই তাদের খাবার পদ্ধতি আমি জানি বলে কথাটা উত্থাপন করছি। তৎক্ষণাৎ এদের জন্য বিয়ার আনা হল বিয়ার পেয়ে পেট ভরে রুটি আলু মাখন ও সামান্য মাংস চাষারা খেল কাফে তারা খেল না। এমন কি অন্যান্য সুখাদ্যের দিয়ে চেয়েও দেখল না। তারা সুখী হয়েছে দেখে আমিও সুখী হলাম, খুব আত্মতৃপ্তি বোধ হল। কিন্তু নিজের দেশ হলে কি করতাম, তা বলতে পারি না হয়তো চাষা বলে তাড়িয়েই দিতাম। এ দেশের চাষা আর আমাদের

দেশের চাষার প্রভেদ অনেক। ওরা স্বাধীনতা বোঝে, আপনার জাতের সংবাদ রাখে। যে সকল চাষা রাজনীতি বোঝে তারাই হল জাতের মেরুদণ্ড। আমাদের দেশের চাষারা সে রকম নয়, তারা শুধু সেবা করতে জানে, অপরের তাঁবেদারী করতে জানে, ঋণের দায়ে সর্বহারা হতে জানে। আমাদের দেশের চাষারা সংকটে পড়লে ভগবানকে অগতির গতি মনে করে, এদেশের চাষারা সংকটে পড়লে সংকট-মুক্তির পথ নিজে খোঁজে।

জাহাজের অভিজ্ঞতা অনেক বলেছি; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এই জাহাজে একটা নতুন ব্যাপার ঘটেছিল। শুনেছি কর্পূরতলার মহারাজার সেক্রেটারি পারসার হতে আরম্ভ করে সাধারণ নাবিকদের জন্য নাকি অর্থ বিতরণ করেছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন আমিও তত সেইরকমই অর্থ বিতরণ করব। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেন নি যে আমি একজন দরিদ্র ভারতবাসী। গুদামে আবদ্ধ আমার দ্বিচক্র-যান কারও লক্ষ্যপথে আসেনি। এমন কি পারসার মহাশয় পর্যন্ত সেসব সংবাদ রাখতেন না। তাই বোধ হয় মাঝে মাঝে এসে শোনাতেন, অমুকে তাকে এত দিয়েছিল, অমুকের কাছ থেকে এত পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, অভিপ্রায় এই যে, যেন আমিও তার কথা বিস্মৃত না হই। নানাভাবে একথা জানাতেও কসুর করেন নি যে, খুচরা পয়সার অভাব হবে না, ব্যাংকের চেক থাকলে তাও তিনি ভাংগিয়ে দিতে পারেন। আমি কোনও মহারাজার সেক্রেটারী হব বলেই ছিল বোধ হয় তার ধারণা। পূর্বোক্ত গ্রীক যাত্রীটি সময় সময় এসে আমার সংগে গল্প করতেন। তারই সামনে একদিন পারসার মহাশয়ের চেক ভাংগানির কথাটা উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় পারসার মহাশয়কে জানিয়ে দিলেন যে আমি ভারতের একজন সামান্য লোক, আমার কাছ থেকে লম্বা চেক

পাবার আশা বৃথা। লোকটি স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা পুরা কেবিনে যার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে, কাপ্তেন এসে যাকে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে যাচ্ছেন সেই লোক সামান্য হয় কি করে তা বোধ হয় তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। আমার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে পারসার আর আমার ত্রিসীমানায় আসতেন না, কিন্তু কয়লাওয়ালা, তেলওয়ালা, বয়, কুক ওরা আমার কথা শোনবার জন্য, আমার সংগলাভ করবার জন্য প্রায়ই আমার দরজায় হানা দিত। কিন্তু আমি তাতে বিরক্ত না হয়ে সব সময়েই তাদের মনোবান্ছা পূর্ণ করবার চেষ্টা করতাম। হাজার হোক তারা মজুর। আমি পরাধীন দেশের লোক, দরিদ্র, এবং দলিত, তাই মজুর ও দলিতদের সংগে আমার বন্ধুত্ব হতে বেশী সময় লাগে নি। আমরা পরম আনন্দে দশদিন কাটিয়ে একদিন নিউইয়র্কের দরজার কাছে এসে পড়লাম।

সেই দরজা লোহার। আঘাতেও সেই দরজা সহজে ভাংগে না। সেই দরজা মন্‌রো ডকট্রিনের (Monro Doctrine) শৃংখলে আবদ্ধ। তার চাবি ইমিগ্রেশন অফিসারের হাতে। তাঁরই ইচ্ছার উপর সেই লৌহ পিন্‌জরে প্রবেশের অধিকার নির্ভর করে। সেই লৌহদ্বার আমার সামনে আর দুদিন পরেই আসবে, দৈনিক জাহাজী সংবাদপত্র আমাকে সে কথা জানিয়ে দিল। এ সংবাদে অনেকেরই মন ভারাক্রান্ত হল। কেউ কেউ দেদার মদ খেতে শুরু করে দিল। আমি এ সব সুখ-দুঃখের বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম মন্‌রো ডকট্রিনের কথা। যে আদর্শের অনুরোধেই মন্‌রো ডকট্রিনের প্রবর্তন হয়ে থাক না কেন, এর দোহাই দিয়ে এই জাতটার আর্থিক স্বার্থ সাধনই আমার চোখে পড়তে লাগল। মনকে বললাম,—মন ভাল করে যদি বুঝতে চাও তো চোখ বেশ করে খুলে রাখ।

মানুষের মনে উদ্‌বিগ্নতা থাকলে তার চিন্তাধারা কমে যায় তাই সকল

যাত্রীই ভাবছিল আমেরিকার দ্বার তাদের কাছে খুলবে কি? দুটো দিন আমার আরামেই কেটেছিল। আমার ঠিক বিশ্বাস ছিল, অন্তত কয়েক দিন ইমিগ্রেশন বিভাগের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতেই হবে। আমি হিন্দু বলে নয়, আমার চামড়া কালো বলে। এক শ্রেণীর আমেরিকান আছে, যারা হিন্দু শব্দটার উচ্চারণেই মোহিত হয়ে যায়। আমি কালো তাই ভাবছিলাম আমাকে হিন্দু বলে গ্রহণ করলেও বেঁচে যাই। কিন্তু তার সম্ভাবনা অতি অল্প। দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে গেল। আজই বিকালবেলা জাহাজ নিউইয়র্ক গিয়ে পৌঁছবে। আমি জাহাজের খালাসী থেকে পারসার এবং পারসার থেকে কাপ্তেন পর্যন্ত সকলের সংগে কথা কয়ে নিয়ে ডেকে গিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য, নিউইয়র্ক নগরীর সামুদ্রিক ট্রাফিক দর্শন।

অনেক জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার আমরা যেমন বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি তেমনি আরও অনেক জাহাজ বন্দরের দিকে আসছিল। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে তেত্রিশটি জাহাজ বেরিয়ে গেল। আর যতদূর দৃষ্টি যায়, গুনে দেখলাম পয়তাল্লিশটা জাহাজ বন্দরের দিকে আসছিল। এত জাহাজের আনাগোনা পৃথিবীর অল্প বন্দরেই হয়। সাউথ হামটন, ডোভর তথা লণ্ডন, সিংগাপুর, ইওকোহামা এবং হামবার্গে প্রায় এই রকম সামুদ্রিক ট্রাফিকের নমুনা দেখা যায় বললে দোষ হবে না। তবু মনে হল নিউইয়র্কের মত সমুদ্র ট্রাফিক আর কোথাও নাই। যাঁরা সঠিক হিসাব নিতে চান, তাঁরা নৌবিভাগের চার্ট দেখবেন। কলকতার পোর্ট কমিশনারের দয়া না হলে বোম্বাইয়ে লিখলে নিশ্চয়ই চার্ট পাওয়া যাবে।

জাহাজ ক্রমশই নিউইয়র্ক নগরীর কাছে আসতে লাগল। নানা

দৃশ্য একটার পর একটা চোখে আসতে লাগল কিন্তু এসব দৃশ্য আমার মনে তেমন দাগ কাটতে পারছিল না, আমি ভাবছিলাম এদেশে গিয়ে দেখতে হবে আমেরিকার ডিমক্র্যাটিক গবর্ণমেণ্টের স্বরূপ কি। বোধ হয় তখন বিকালের সাড়ে সাতটা, চারিদিক কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আসছিল, দিনের আলো অতি অল্পই ছিল, দূরের বস্তু কমই দেখা যাচ্ছিল। এমন সময় জাহাজ 'স্ট্যাচ্ অব লিবার্টির' কাছে এসে গেল। অনেকেই দেখল, আমিও দেখলাম, কিন্তু সে মূর্তি কারও মনের উপর তেমন দাগ কেটেছে বলে মনে হল না কারণ সময়ের পরি-বর্তন হয়ে গেছে। যেদিন এই মূর্তি গড়া হয়েছিল সেদিন ইমিগ্রেসন বিভাগের অস্তিত্ব ছিল না।

জাহাজ ধীরে ধীরে হাডসন নদীতে গিয়ে প্রবেশ করল। আমি ডেকে বসে নদীর দুই তীরের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম। বাস্তবিক সে দৃশ্য উপভোগ্য। বড় বড় বাড়িগুলির উপর মেঘমালা ঝুঁকে পড়েছে। বিজলি বাতির আলো তাতে পড়ে আঁধারে-আলোর সৃষ্টি করেছে। সেই আঁধারে আলো দেখবার মত। আজকের দিনটা যে আমাকে জাহাজে বাস করতে হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম বলেই নামবার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম না। একজন আমেরিকান আমাকে আকাশস্পর্শী বাড়িগুলির পরিচয় দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "ওই দেখুন ওয়ালস্ স্ট্রীট। ওয়ালস্ স্ট্রীটই পৃথিবীর সমুদয় ব্যবসায় এবং আমেরিকার পলিটিক্সের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে। বাঁদিকে পড়ল হারলাম, হারলামই হল আমেরিকার প্যারি।" কথা বলতে বলতেই জাহাজ কূলে এসে ভিড়ল। সিড়ি পাতা হল, ইমিগ্রেশন অফিসার এলেন, সমস্ত যাত্রীরা ডাক্তারের সামনে যেতে লাগল। যারা আমেরিকা প্রবেশের আদেশ পেল, তারা নিজেদের অনেক ভাগ্যবান মনে করল। শেষটায়

আমাদের দুজনেরও ডাক পড়ল। আমেরিকান ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁর ডাক্তারী পরীক্ষা হল না, ডাক্তার শুধু, 'গুডবাই' বলেই তাঁকে বিদায় দিলেন। আমার ডাক্তারী পরীক্ষা হবার পর ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে হাজির করা হল। অফিসার আমার পাসপোর্ট একদিকে রেখে দিয়ে বললেন, "এখানে বসুন, পরে দেখব।" এ যে ঘটবে তা আমার জানাই ছিল। আমি চেয়ার ছেড়ে দিয়ে পাশে এসে জাহাজে লাগার জায়গাটা দেখতে লাগলাম।

দুদিকে কাঠের দেওয়াল রয়েছে। এই দেওয়াল ডিংগিয়ে পার হওয়া সাধ্যাতীত। একদিকে নদী এবং একদিকে জাহাজ থেকে নামবার গেট। এই গেটে প্রবেশ করতে সকলেরই পাসের দরকার হয়। এমন কড়া ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের খালাসীরা যে কি করে জাহাজ থেকে পালিয়ে সাঁতার কেটে শহরে যায়, তা বলা শক্ত। এসব যখন দেখ্‌ছিলাম আর ভাবছিলাম তখন ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে ডেকে বললেন, "একজন ইউরোপীয় মহিলা আপনার সংগে দেখা করতে চান, বসুন এখানে, এখনই তিনি আসবেন।" নূতন করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে চেয়ারে বসলাম।

মিনিট পাচেক পরেই সেই ইউরোপীয় মহিলা এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে একজন হিন্দু মহিলা এখনই আস্‌বেন আমার সংগে দেখা করতে, আমি যেন এখানেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করার সময় হঠাৎ মনে হল তিনি কমলা দেবী মুখার্জ্জি নন তো, উপেনবাবু যার কথা আমার কাছে লিখেছিলেন? এতে মনে একটা আশার সন্‌চার হল।

মিনিট দশেক পরেই, পরনে শাড়ি, কপালে সিঁদুরের টিপ, পায়ে ভারতীয় স্যাণ্ডেল, একটী মহিলা আসতে লাগলেন। আমেরিকান,

ইউরোপীয়ান সকলেই তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়ে টুপি খুলে সম্মান জানাতে লাগল। তাঁর পথ পরিষ্কার, তাঁকে আর লোক ঠেলতে হল না। আমার কাছে আসা মাত্র আমিও দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে তাঁকে নমস্কার করলাম। আমরা যেমন করে 'বন্দেমাতরম্' গান গাইবার সময় দাঁড়াই বা ইংরেজেরা যেমন করে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গায়, ইমিগ্রেশন অফিসাররা ঠিক তেমনি করে সবাই একসংগে তাঁকে সম্মান দেখাতে দাঁড়ালেন।

মহিলাটির এত সম্মানের কারণ প্রথমে ঠাহর করতে পারি নি। যাইহোক তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠি পেয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছেন। তিনি আরও বোধহয় কিছু বলতেন, কিন্তু একজন ইমিগ্রেশন অফিসর টেবিলের কাছ থেকে উঠে এসে তাঁকে ডাকলেন এবং আমার সংগে কোনও কথা বলতে নিষেধ করলেন। মহিলাটি যতক্ষণ না কোনও আসন গ্রহণ করলেন সব ইমিগ্রেশন অফিসারই ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কমলাদেবী মুখোপাধ্যায় আসন গ্রহণ করেই অফিসারের সংগে নানা কথা আরম্ভ করলেন। তারপর আমার কথা উঠল। কমলা দেবী বললেন, তিনি যে সাপ্তাহিক পত্রের লেখিকা, আমিও সেই সাপ্তাহিক পত্রে লিখে থাকি এবং সেই সূত্রেই আমার সংগে তাঁর পরিচয়। তারপর আর কি কথা হল তা আমি শুনতে পাই নি, কারণ আমাকে দূরে গিয়ে বসতে বলা হয়েছিল। শেষ কথা শুনলাম "ও, কে," তারপরই পাসপোর্টে সিলমোহর পড়ল এবং অফিসাররা "ও, কে," উচ্চারণ করে একসংগে দাঁড়িয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন। কমলাদেবী আমার হাত ধরে বার হয়ে পড়লেন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

আমার লগেজ পরীক্ষা করা হল, তারপর আমরা একটা বড় পথে

এসে পড়লাম। পথটি দেখবার মতই। ছত্রপতি শিবাজী যেমন দিল্লী প্রবেশের সময় এদিকে সেদিকে বড় তাকান নি, আমিও তেমনি কোনও দিকে না তাকিয়ে একটি ট্যাক্সি ডেকে সাইকেলটা তাতে বোঝাই করে কমলাদেবী মুখোপাধ্যায়কে ভাল করে বসিয়ে ৪২নং স্ট্রীটের ওয়াই. এম. সি এ-এর দিকে রওনা হলাম। লণ্ডনের জাহাজের এজেণ্টও আমাকে নিতে এসেছিলেন। তিনিই ওয়াই. এম. সি. এ-এর ম্যানেজারের কাছে আমার আগমনী নিবেদন করলেন। ম্যানেজার নীচে এসে আমার মুখ দেখেই বললেন, "বড়ই দুঃখের সংগে জানাতে হচ্ছে, আমাদের এখানে একজন লোক রাখবারও স্থান নাই।" আমি বুঝলাম ব্যাপারখানা কি। তৎক্ষণাৎ কমলাদেবীকে বললাম, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি এখন আমার থাকার স্থান আমিই খুঁজে বার করব। অতএব যদি অনুমতি দেন ত আপনাকে গিয়ে রেখে আসি।"

আমার অপমানে তিনিও বোধ হয় অপমান বোধ করেছিলেন। তাই অপমানের বোঝা আর বইতে না চেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন এবং বললেন, যেখানেই থাকি না কেন কাল সকালে যেন তাঁর কাছে ফোন করি।

অপমান লাঘব করবার জন্যই বোধহয় কমলাদেবী বললেন, "আপনার বাইসাইকেল নিয়ে এখানে আসা ভাল হয়নি। অন্য একজন বাংগালী ভূপর্যটক এসেছিলেন, তার সঙ্গে এ বালাই ছিল না।" আমি বললাম, "এই নিয়েই আমি পথ চলি এবং আমেরিকায় এই নিয়েই চলাফেরা করব। যাক এটার জন্য ভাবতে হবে না।"

তিনি চলে যাওয়াতে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। তারপর অন্য একটা ওয়াই. এম. সি. এ-তে গেলাম এবং সেখানেও সেই 'স্থানাভাব'। সাদা চামড়ার ওয়াই. এম. সি. এ-তে স্থানলাভের আশা সুদূরপরাহত বুঝে

হারলামের দিকে রওনা হলাম এবং নিগ্রোদের ওয়াই. এম. সি. এ-তে স্থান পেলাম।

রুমের ভাড়া এবং ট্যাক্সির মজুরি দিয়ে নিকটস্থ একটি নিগ্রো হোটেলে খেতে গেলাম। খাওয়া শেষ করে দু সেন্টের একখানা সংবাদপত্র কিনে বোধহয় নবম তলায় অবস্থিত একটি রুমে এসে দরজা খুলেই মনে হল এটা ওয়াই. এম. সি. এ-ই বটে। তবে হাতে টাকা প্রচুর রয়েছে, দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা কর্তব্য। ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে দিয়ে এই গভীর রাত্রে সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। অনেকক্ষণ সংবাদপত্র পাঠ করে রাত্রি তিনটার সময় ঘুমালাম। সকালে আটটার সময় ঘুম থেকে উঠে যখন বাইরের দিকে তাকালাম তখন দেখলাম অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। ১৩৫নং স্ট্রীটের পশ্চিম দিকে ওয়াই এম. সি. এ অবস্থিত। রাস্তার দুদিকে বড় বড় বাড়ি তবে বাড়িগুলির অবস্থান আমাদের দেশের বাড়ির মত এলোমেলো ভাবে নয়। 'ব্লক' করে বাড়ি সাজান। তা সে নিগ্রো পল্লীই হোক আর সাদা চামড়াদের পল্লীই হোক। এই পৃথিবীতে জার্মানী আর আমেরিকা ছাড়া কোথাও এরূপ 'ব্লক' প্রথায় বাড়ী তৈরী হয় নি। তবে রুশিয়ায় এ নিয়মটি প্রবর্তিত হবে বলে মনে হয়। ব্লক পদ্ধতিতে বাড়ী করলে পিচ দেওয়া বড় পথকে খুঁড়তে হয় না, যেমন আমাদের কলকাতায় হয়ে থাকে। ব্লক প্রথায় বাড়ি করা হয় বলে, জল, গ্যাস বিজলি বাতি প্রভৃতি এমন সুন্দরভাবে রাখা হয় যে, তার সংগে পথের সম্পর্কই থাকে না। সবই পেভমেন্টের নীচে চলেছে।

দাঁড়িয়ে হাঁ করে পথের দু পাশের বাড়িগুলি দেখতে লাগলাম। দেখলাম প্রত্যেকটি বাড়ির জানালা বন্ধ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না কে কোথায় বাস করছে। পথে স্রোতের মত মোটরকার,

মোটরলরি, ট্যাক্সি এবং বাস চলছে। একটু দূরেই এলিভেটারে বাড়ির উপর দিয়ে গাড়ি চলছে। কতক্ষণ এমনভাবে চেয়ে ছিলাম তার ঠিক ছিল না। শুধু চেয়ে থাকতেই ইচ্ছা হচ্ছিল। আকাশে গাড়ি, মাটিতে গাড়ি, মাটির নীচে গাড়ি। এমন দেশ পৃথিবীতে মাত্র একটাই। আমেরিকা ছাড়া কোথাও আজ পর্যন্ত এলিভেটর সিস্টেমে ট্রাম চলার প্রথা প্রবর্তিত হয়নি।

দেখার নেশা একটু যখন মিটল তখন আবার স্নান করলাম। তারপর নীচে নেমে পথের নাম, বাড়ীর নম্বর, স্ট্রীটের নম্বর নোট বুকে লিখে নিয়ে একটু কাফি খাবার ইচ্ছায় সোজা হাঁটতে লাগলাম। একটি কাফির দোকানে গেলাম তাতে দু'জন নিগ্রো এবং তিনজন আমেরিকান বসে কাফি খাচ্ছিল আর নানারকম আলোচনা করছিল। এদের দর্শন-ঘেঁষা কথাবার্তা শুনে মনে হল যেন আমি কোন সন্ন্যাসীর আখড়ায় বসে আছি। এরা যে দর্শনের কথা নিয়ে আলোচনা করছিল, ইচ্ছা করলেই তাতে মুখ পাততে পারতাম কিন্তু এরূপ করা মহা অন্যায় এবং আমরা যেমন সবজান্তার জাত তাদের সংগে তা চলবে না। বাজে কথা তারা মোটেই বলছিল না। প্রত্যেকটি কথার পেছনে যুক্তি ছিল এবং তারা হাউমাউ করে চিংকারও করছিল না। কতক্ষণ পরেই হয়ত আমি আমেরিকানদের নিগ্রোঘৃণা সম্বন্ধে গাল দিব, কিন্তু এখানে তা পারব না কারণ এখানে সাদা এবং কালো উভয়ে নিয়ে এমনই এক দর্শনের কথা বলছিল যা আমার কাছে নতুন ছিল এবং তাতে ভাববারও বিষয় ছিল। তাই শুধু কাফি খেয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বেরিয়ে এলাম।

পথে যাবার সময় একজন জামাইকাবাসী নিগ্রো রমণীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। রমণীটি সুন্দরী এবং ডাক্তার। অপরিচিত মুখ দেখেই রমণী আমাকে পথ হারিয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি পথ হারাইনি

তাঁকে জানালাম। তবে বলতে বাধ্য হলাম গত রাত্রে ওয়াই. এম. সি. এ-তে ঘুমিয়ে আরাম পাইনি, যদি কম ভাড়ায় একটি সাজসরনজাম বিশিষ্ট রুম পাই এবং তা পেতে যদি তিনি আমাকে সাহায্য করেন তবে বড়ই বাধিত হব। তাঁরই সাহায্যে অন্য আর একজন জামাইকাবাসার বাড়িতে একখানা রুম সপ্তাহে আড়াই ডলারে ঠিক করলাম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সে রুম। বাড়িওয়ালী বললেন, ভারতীয় খাবার তিনি রেঁধে দিতে পারবেন। জামাইকাবাসী নিগ্রোরা আপনাদের নিগ্রো বলে পরিচয় দেয় না, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয়। তাদের মতে ফিলিপাইন, জাভা আর ভারতবাসীরা ইস্ট ইণ্ডিয়ান। আমেরিকনরা আমাদের হিন্দু বলে, হিন্দু মুসলমান প্রশ্ন এখানে নাই। তবে ব্রিটিশের প্রচার বিভাগের ফলে অনেক ব্রিটিশ-পারিচালিত সংবাদপত্র সেই ভ্রম আজকাল সংশোধন করে দিচ্ছে। মিঃ সওকত আলি এবং একজন মাদ্রাজী পাদরী সেই ভুল সংশোধন করতেই বোধ হয় সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু পেরে উঠেন নি। ভারতবাসীর হিতাকাংখীর অভাব নাই, বোধ হয় আমেরিকায় আমাদের ইণ্ডিয়ান না বানিয়ে ছাড়া হবে না। সুখের বিষয় কি দুঃখের বিষয় বলতে পারি না, ক্যালিফোরনিয়াতে আমাদের দেশের পাঠানরা নিজেদের ইণ্ডিয়ান বলে কখনও পরিচয় দেয় না—তারা সদাসর্বদা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে এবং এরিয়ান্ বলে গর্ব অনুভব করে। এরিয়ান এবং ননএরিয়ান কথা নিয়ে বাংগালী মুসলমান ও পাঠানদের মাঝে অনেক সময় পিস্তলবাজীও হয়ে থাকে। পাঠানরা বাংগালীদের—সে যে ধর্মেরই হোক—এরিয়ান বলে স্বীকার করে না।

আমি যে রুম ভাড়া করেছিলাম তার সংগে রান্না করবারও বন্দোবস্ত ছিল। রান্না করবার বাসন চাইলেই পাওয়া যায় এবং গ্যাস যত ইচ্ছা

ব্যবহার করা যায়। সেজন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয় না। রুম ভাড়ার সংগে গ্যাস, লাইট, বাথ, রান্নার বাসন, সপ্তাহে একবার বিছানার চাদর পরিবর্তন এবং দৈনিক একখানা করে ধোয়া নতুন তোয়ালে পাওয়া যায়। এরূপ ঘরের ভাড়া আমেরিকার পূর্বদিকে সপ্তাহে সাড়ে তিন ডলার, উত্তর দিকে তিন ডলার, মধ্যে চার ডলার, পশ্চিম দিকে আড়াই ডলার থেকে পাচ ডলার, দক্ষিণ দিকে এক ডলার থেকে তিন ডলার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঘরের আসবাব দু'খানা চেয়ার, দুটা টেবিল, একটা ইজিচেয়ার। পোষাক টাংগিয়ে রাখবার জন্য পাশে একটা ছোট রুমও পাওয়া যায়। রান্নার বাসন টেবিলের ড্রয়ারে রাখবার বন্দোবস্ত আছে। এই জন্যই দুটা টেবিলের ব্যবস্থা।

বিকালে সাতটার সময় ঘুম থেকে উঠে একাকী বেড়াতে বের হলাম। দুটা ব্লক পার হয়ে মাউণ্ট মরিস পার্ক। তাতেই বেড়াতে লাগলাম আর এলিভেটরগুলি কেমন হুস হুস করে যাওয়া আসা করছে তাই দেখতে লাগলাম। ৮নং অ্যাভিনিউএর উপর এলিভেটর আছে এবং তারই নীচ দিয়ে আমাকে উক্ত পার্কে আসতে হয়েছিল।

এলিভেটরগুলির দিকে আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। মহানগরে যেমন মাটির নীচে রেল পথের দরকার, উপরেও ঠিক সেই রকম দরকার। এলিভেটর না হলে মহানগরের পথে চলা দায় হয়ে উঠে। নিউইয়র্ক নগর এই দায়ে পড়েছিল বলেই দায়মুক্ত হবার পথ খুঁজে নিয়েছে। পৃথিবীর লোক হাঁ করে চেয়ে দেখছে এত টাকা কি করে খরচ করতে পারে! মানুষই যে টাকা তৈরি করে এ কথা মানুষ বুঝে না। মজুরীই হল টাকা। মজুরী ছেড়ে দিলে টাকার অস্তিত্ব থাকে না।

পার্ক হতে ফিরবার সময় বিকালের কয়েকখানা সংবাদপত্র নিয়ে এলাম। নিউইয়র্ক নগরে দৈনিক সংবাদপত্রের দাম দুই সেণ্ট এবং

তিন সেণ্ট করে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, এসকল পত্রিকা ছাড়াও অনেক সংবাদপত্র আছে যাতে বিজ্ঞাপন থাকে না। যেমন ডেলী ওয়ার্কার, পিপুল্-ওয়ার্ল্ড যাতে পয়সা দিয়ে কেউ বিজ্ঞাপন দিতে পারে না। তাদের বিষয় নিয়েই বিনা পয়সায় বিগ্‌গাপন থাকে, সেজন্য প্রত্যেক দিন চাঁদা উঠছে এবং কোন্ জেলার লোক কত চাঁদা দিবে তাও নিধারিত হয়ে থাকে। আমেরিকার প্রগতিশীল যুবক যুবতী সেই পত্রিকাগুলির গ্রাহক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও ঐ সংবাদপত্রগুলির প্রবেশ নিষেধ, তবুও ঐ সংবাদ পত্রগুলিই যুবক যুবতীর আশা আকাংখা ও আদর্শের প্রতীক।

আমেরিকায় যারা এসব সংবাদ রাখে, তাদের বলা হয় "পারসেনটেজ"। আমেরিকার এই "পারসেনটেজ" পার্টির লোক রোজই বাড়ছে তাই আজ রুজভেল্ট চিৎকার করেও অনেক কাজে অনেকের সাড়া পান না এবং পাবেন বলে বোধও হয় না। এরা ওৎ পেতে বসে আছে সুযোগ পেলেই আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করবে বলে। এই হল আমার ধারণা। কমিউনিস্টি দলের লোককেই উপহাস করে পারসেনটেজ বলা হয়।

ভাবছিলাম আজ রাত্রে বাইরে যাব না। পকেটে একতাড়া নোট রয়েছে। ভয় হল যদি নিউইয়র্কের গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি, তবে পথে বসতে হবে। হঠাৎ মনে হল অতীত দিনের স্মৃতি, যেদিন পৃথিবী পর্যটনে বের হয়েছিলাম সেদিন পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। আজ টাকা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, চুলায় যাক টাকা, আমেরিকাকে আমার দেখতেই হবে। আমি দেশেও ফকির, বিদেশেও ফকির হলে অভিজ্ঞতা ভাল হবে। তখন রাত প্রায় এগারটা। বের হয়ে পড়লাম পথে।

বিজলি বাতির আলোয় হারলামের প্রশস্ত পথগুলি আলোকিত। ব্রডওয়েতে বেড়াতে হলে এই শীতেও ঘাম বের হয়, বিজলি বাতির

উত্তাপে। দূর হতে মনে হয় যেন আগুন লেগেছে। পন্‌চম এ্যাভেনিউ এবং একশত দশ স্ট্রীট ইস্ট যেখানে মিলেছে সেখানে দাঁড়ালাম সেণ্ট্রাল পার্কের কাছে। -আলোকোজ্জ্বল সুন্দর পথ, তারই উপর অগণিত মোটর গাড়ি ও বাস চলছে। যারা 'জ্যয় রাইড' করতে বের হয়েছে দোতালা বাসে, তাদের হাসির ফোয়ারার উচ্চ কলরবে আকাশ মুখরিত। কাছেই বড় বড় হোটেলে মদের বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুন্দরী তরুণীর কলহাস্য আনন্দের সৃষ্টি করছে। যুবক যুবতী আপন মনে পথ চলেছে এবং সারাদিনের পরিশ্রমের অবসাদ দূর করছে। তারা কখনও ছোট ছোট রেস্তোঁরায় প্রবেশ করে লাইট রিফ্রেশমেণ্ট খেয়েই বের হয়ে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তটিকে যেন তারা আনন্দে ভরিয়ে তুলছে। কাছেই একটা সিনেমা গৃহে নাচ চলছে। আমেরিকায় একদিকে চলেছে ঐশ্বর্য-ভোগের আয়োজন আর এক দিকে রয়েছে নিরন্ন বেকার ও ক্ষুধিতের ব্যর্থ জীবনের করুণ দৃশ্য। কিন্তু ঐ যে দৃশ্য আমার সামনে, তা দেখে মনে হয় না আমি আমেরিকার কোথাও ভ্রমণ করছি মনে হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে আছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চারিদিকে সর্বহারা দল বাস করে তার সংবাদ কেউ রাখে না। যারা সেই সংবাদ রাখেন তাঁরা আসুন আমার আমেরিকায় বর্ণিত স্থানে। দেখবেন এখানেও সর্বহারার দল নতমুখে বসে আছে। কেউ সারাদিনে এক টুকরা রুটি খেয়েছে, আর কেউ অভুক্ত অবস্থায়ই পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। আমেরিকার ব্যাংকে প্রচুর স্বর্ণ আছে, বাগানে ফল আছে, মাঠে প্রচুর গম আছে, নদীতে জল আছে, দোকানে কাপড় জুতা সবই আছে কিন্তু ঐ ভিখারীদের কিছুই নাই। পরনে ছেঁড়া ট্রাউজার, গায়ে ছেঁড়া কোট, কারও গায়ে শার্ট আছে, কারও গায়ে তাও নেই! নেকটাই কিন্তু তবুও ঝুলছে।

আনন্দের লীলাভূমি, টাকার আড়ত নিউইয়র্কএ এসে রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত পথে হেঁটে বেড়ালাম। কেউ আমাকে লক্ষ্য করেনি, সকলেই ব্যস্ত। এত বড় নগরে কে কার সন্ধান রাখে? তাতে আমি আনন্দিতই হলাম। আমার আকৃতি অনেকটা নিগ্রোদের মত। নিজের পরিচয় কারও কাছে দিলাম না আর পরিচয় দিবার প্রয়োজনও ছিল না। হাতে টাকা আছে, পেট ভরে খাবারের বন্দোবস্ত আছে, এবং আমেরিকার সুখ-দুঃখের সংবাদ নেবার মত ক্ষমতা আছে। আমি যদি অপরিচিত হয়ে বেড়াই তবে দুঃখ করার কি আছে? একটি পুরান কথা মনে পড়ে গেল। আমার গ্রামের একটি লোকের সংগে একবার কলকাতায় দেখা হয়। তার পরনে মাত্র একখানা ধুতি, গায়ে একটা গেন্জি আর ট্যাঁকে কতগুলি পয়সা। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এভাবে ঘুরে বেড়াবার কারণ কি। গ্রামে তো কখনো এভাবে থাকতে দেখিনি। লোকটি বলেছিল, "কলকাতা দেখতে এসেছি, দেখে চলে যাব। জাঁকজমক করে চোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ কি?" আমিও নিউইয়র্কে প্রায় দু'সপ্তাহ সেইভাবেই কাটিয়ে ছিলাম। তাতে দিন কেটেছিল ভালই। কেমন করে ভালভাবে দিন কেটেছিল তার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম।

হারলামে নিগ্রোরাই থাকে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ওয়াল্ড-ফেয়ারের তরফ থেকে নানারূপ প্রচার চলছিল। সেখানে রুশিয়ারও একটি প্যাভেলিয়ন খোলা হয়েছিল। সেই প্যাভেলিয়নটি দেখার জন্যই তথায় গিয়েছিলাম। রুশিয়ার প্যাভেলিয়ন দেখবার জন্য লোক আগ্রহান্বিত ছিল। সেখানে নিগ্রোদের কাছে সস্তা দরে খাদ্য বিক্রয় করা হ'ত কারণ নিগ্রোরা আমেরিকানদের মত মোটা মজুরী পেত না। যে সকল খাদ্য আমেরিকানদের কাছে পন্চাশ সেণ্টে বিক্রি হত সেই

হাডসন নদীর মোহনায় স্বাধীনতার মূর্ত্তি ।

খাবারের জন্যই নিগ্রোদের কাছ থেকে পনর সেন্ট নেওয়া হ'ত। আমি সে সুযোগ পরিত্যাগ করিনি। রুশিয়ার প্রদর্শনীতে গিয়ে সর্বপ্রথমই খাবারের ঘরে গিয়ে খেতে বসলাম। এমন সুস্বাদু দই, ঘোল, ক্রিম, সিদ্ধ করা সবজী শ্লাভ জাত ছাড়া আর কেউ তৈরী করতে পারে না। রুশ দেশীয় যুবতীরা সেই সুখাদ্য থালায় করে নির্যাতিত লোকের সামনে এনে রাখছিল। তারা ভাংগা ইংলিশে কথা বলছিল। যখন তারা কথা বলছিল তখন তাদের গালভরা হাসি দেখে অনেক নিগ্রোই আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ছিল। তাদের কার্যপদ্ধতিও অন্য রকমের। যেন কলের পুতুলের মত কাজ করে যাচ্ছিল। যুবতীরা শুধু খাবার দিয়েই কাজের শেষ করছিল না। যাদের নেকটাই অসাবধানবশত স্থানভ্রষ্ট হচ্ছিল, যুবতীগণ তা যথাস্থানে বেঁধে দিচ্ছিল। খাবার শেষ হয়ে যাবার পর যখন নিগ্রোরা চলে যাচ্ছিল তখন সেই সুন্দরী মেয়েরা তাদের কোট প্যাণ্ট ব্রুস দিয়ে ঝেড়ে দিচ্ছিল।

যে-ই রুশিয়ার প্রদর্শনীতে যাচ্ছিল সে-ই হাসিমুখে একটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে বের হয়ে আসছিল। সেই তৃপ্তির সংগে যে ভাবধারা নিয়ে আসছিল তা আমেরিকার পুঁজিবাদীদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। নিগ্রোরা প্রকাশ্যেই বলছিল আমেরিকাতে কবে রুশদেশের মত সোভিয়েট স্থাপন হবে। সোভিয়েট রুশের নতুন কর্মপদ্ধতি দেখে প্রত্যেকের মনেই নবজাগরণের প্রেরণা আসছিল। এসব কারণেই বোধহয় সোভিয়েট রুশিয়ার প্রদর্শনীতে এত ভিড় হ'ত।

অনেক দরিদ্র শ্বেতকায়কে তথায় গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা কি ভাবছিল তা আমার বলার ক্ষমতা নাই সত্য, কিন্তু যখনই ইংলিশ ভাষায় দক্ষ রুশ গাইডগণ এসব ধ্যানস্থ আমেরিকানদের

পিঠে হাত বুলিয়ে বলত, তোমাদেরও কাজ করার ক্ষমতা আছে, কাজ কর, দেখবে তোমাদের দেশেও সোভিয়েট রুশের মত কিছু গড়ে উঠেছে তখন তাদেরও মনে চাঞ্চল্য এসে দেখা দিত।

সোভিয়েট প্রদর্শনীতে বড় বড় চিত্রপট এবং কিউরিয়োর কোনরূপ জাঁকজমক ছিল না। প্রদর্শনীটাকে দূর হতে যেন একটা বিরাট কিছু দাঁড়িয়ে আছে বলেই মনে হ'ত। বাড়িটার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাটির তৈরী একটা প্রকাণ্ড মানুষের মূর্তি। তার ডান হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল। মূর্তিটির মুখ এমনি ভাবে গঠন করা হয়েছে যে দেখলে মনে হয় যেন সেই মাটির মানুষ বলতে চাচ্ছে—"গরিবের দল এবং সর্বহারাগণ, আর ভুলে থাকিস না, ভিক্ষা করে আর কোন দরকার নাই, এবার তোদের পাওনা বুঝে নে।"

সোভিয়েট প্রদর্শনীতে সিনেমারও আয়োজন ছিল। রুশ দেশের সিনেমার সংগে অন্য কোন দেশের সিনেমার মোটেই মিল নাই বললে কোন দোষ হয় না। রুশ সিনেমায় পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনার উপর সত্যের দীপ্তি ফুটে উঠছিল। কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছিল না। সিনেমায় দেখান হচ্ছিল, জারের আমলে এক টুকরা রুটির জন্য পুত্রকন্যার সামনে কি করে মাতা তাঁর শরীর বিক্রয় করছেন আর কেমন নিঃসংকোচে পুঁজিবাদীর দল সেই মাতার প্রতি কুব্যবহার করছে; যুবক যুবতীরা অন্নচিন্তা করে অকালে কিরূপে বার্ধক্য পেয়েছে। সে সব করুণ দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখবার মত পাষাণ মন অনেকেরই ছিল না। অনেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠছিল আর জারের নামে নানারূপ কটূক্তি বর্ষণ করছিল। ইহুদী এবং যারা অখৃষ্টান তাদের প্রতি কত অত্যাচার চলছিল তার দৃশ্যও দেখান হ'ত, কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে কেউ কাঁদত না শুধু গম্ভীর হয়ে ভাবত। আমিও ভাবতাম। ভাববার বিষয়ই বটে।

কাছেই ইটালীয়ানদের প্রদর্শনী। নিগ্রোরা সেই প্রদর্শনীতে যেত এবং দেখত। তারা বুঝতে চেষ্টা করত কোন শক্তির প্রভাবে সিনিয়র মুসলিনী সম্রাট হাইলে সেলাসীকে রাজ্য ছাড়া করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রদর্শনী দেখে তারা সে বিষয়ের কোন সন্ধানই পেত না। সেখানে গিয়ে তারাও দেখত আমিও দেখতাম। এই প্রদর্শনীটি হল একটি ঠকের আড্ডা। নীচের তলার প্রবেশ দ্বারে লেখা রয়েছে "বিনামূল্যে এখানে ইটালীতে প্রস্তুত নানারূপ জিনিষ বিতরণ করা হয়।" কথাটা মোটেই অন্যায় নয়। প্রত্যেক দেশেই অনেক জিনিষের নমুনা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। আমি ভেবেছিলাম এখানেও সেরূপই কিছু হবে, কিন্তু প্রবেশ করে দেখি এখানে সেরূপ কিছু নয়। যে জিনিষ বাজারে দশ সেণ্ট করে বিক্রি হয় সেরূপ জিনিসের দাম এখানে পঁচিশ সেণ্ট করে লেখা রয়েছে। আমি তা দেখে জিনিসও কিনিনি কাউকে গালও দেইনি, কিন্তু নিগ্রোরা সেখানে গিয়ে যখনই দেখেছে এটা টাকা রোজগারের একটা ফাঁদমাত্র, তখনই তারা রাগ করে মুখ হতে থু থু ফেলে প্রদর্শনী হতে বের হয়ে এসেছে।

ইটালী দেশের প্রদর্শনীর বাড়িটার উপর একটি স্ত্রীমূর্তী। মূর্তীটির গড়ন বেশ সুন্দর। তারই পাশ দিয়ে একটি কৃত্রিম জলস্রোত বয়ে আসছে, যেন গংগা গোমুখী হতে নীচে নেমে আসছে। বাইরে সৌন্দর্যের বেশ সমাবেশ করা হয়েছে আর ভিতরে করা হয়েছে ঠকাবার সুবন্দোবস্ত। এটা আমি অথবা নিগ্রোরাই শুধু অনুভব করেনি। প্রদর্শনী দেখতে যারাই এসেছিল তারাই বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিল ; এটা একটা ঠকের আড্ডা।

দক্ষিণ আমেরিকাতে আমি যাইনি। সেখানের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও আমার কোন সংবাদ জানা ছিল না, তবে যে সকল দক্ষিণ আমেরিকাবাসী

রেড ইণ্ডিয়ান প্রদর্শনী দেখতে এসেছিল তারা ইটালীয়ান প্রদর্শনীর প্রতি বড়ই খারাপ মত পোষণ করছিল। ইটালীয়ান মিশনারীরা তাদের দেশেও নাকি বেশ অন্যায় আচরণ করছিল এবং বাইবেল পরিত্যাগ করে তারা নাকি মুসলিনী প্রবর্তিত ফেসিজম্ গ্রহণ করে তাই প্রচার করছিল। মেকসিকো এবং ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে সসিয়েলিজমের অনেক প্রচার হওয়ার ফলে সেই দেশগুলিতে পুঁজিবাদীদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে এই সংবাদটি আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলাম। এদুটি দেশের লোকই আবার প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছিল বেশির ভাগ। তারাই ইটালীয়ানদের প্রদর্শনী দেখে নানারূপ খারাপ মন্তব্য করছিল। প্রত্যেক প্রদর্শনীর দরজার সামনে একটা প্রকাণ্ড বই ছিল। সে বইটিতে যার যা ইচ্ছা মন্তব্য লিখতে পারত। অনেকেই ইটালীয় প্রদর্শনীর বইএও নানারূপ মন্তব্য লিখেছিল। সেইসব মন্তব্য পাঠ করেই আমার উপরোক্ত ধারণা হয়েছিল। আমি যা লিখেছিলাম তা অতি অকেজো, কারণ আমি বিদেশে গিয়ে যখনই কোন বই-এ মন্তব্য লেখতাম তখন বাংলা ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা ব্যবহার করতাম না। যদিও অপরের পক্ষে তা অকেজো, আমার পক্ষে কিন্তু তা বড়ই দরকারী হয়ে পড়ত। আমার লেখা দেখে অনেকে আমার পেছন নিত এবং জিজ্ঞাসা করত আমি কোন্ দেশ থেকে এসেছি। যদি ইংলিশে মন্তব্য লেখতাম তবে হয়ত কেউ আমার দিকে চেয়েও দেখত না। বিশ্বমেলাতে অনেকদিনই গিয়েছি এবং অনেক কিছু দেখেছি, কিন্তু তা হল মেলা সংক্রান্ত বিষয়। এ বিষয় নিয়ে এখন আর বেশি বলা উচিত হবে না। আমি বিশ্বমেলা দেখবার জন্য সেখানে যাইনি আমি গিয়েছিলাম কালো লোকের প্রতি সোভিয়েটদের কিরূপ ব্যবহার তাই জানতে।

আজ ভারতের কথা আমেরিকার অল্প লোকই চিন্তা করে। যে

সকল বকধার্মিক আমেরিকায় হিন্দুয়ানীর কথা বলে দুপয়সা করে খান তারা ভাল করেই অবগত আছেন তাদের অবস্থা আমেরিকায় কিরূপ? আমি এসম্বন্ধে কিছুই বলব না কারণ এসম্বন্ধে যদি বেশি বলতে যাই তবে এবিষয়েই একখানা বই লিখতে হবে। আজ আমেরিকায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পক্ষ হয়ে দুকথা যদি কেউ বলে তবে দুটিমাত্র সংবাদপত্রের কথা আমি বলতে সক্ষম হব। সেই সংবাদপত্র দুটি হল পিপুলস্ ওয়ার্ল্ড এবং ডেলি ওয়ার্কার। কখন কখন আমরা আমেরিকার অন্যান্য সংবাদপত্রে ভারতের কথা শুনতে পাই, তা হল তাদের স্বার্থ কথা বলা, এর বেশি এসম্বন্ধে আর কিছু বলা চলে না।

এখানে আসার পর দান্তে বলে এক ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় হয়। তিনি পৃথিবীর যত পরাধীন জাত আছে তাদের সকলের জন্যেই দরদী। আমাকে পাওয়ার পর তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং আমাকে অনেক লোকের সংগে পরিচয়ও করে দিয়েছিলেন। মিঃ দন্তের স্ত্রীর অনুরোধে তিনি একটি সভার আয়োজন করেন। সভা একটি কাফেতে হয়েছিল। সভাতে হাজার লোক হবে বলে অনেকেই ধারণা করেছিল। কাফের ম্যানেজার প্রচার করেছিলেন মিঃ রামনাথ একজন হিন্দু, তিনি অকালটিস্ট স্পিরিচুয়েলিস্ট, অথবা যাদুকর নন, তিনি একজন পর্যটক। তাঁকে হবো (Hobo) অর্থাৎ এডভ্যানচারার বলে যেন ভুল না করা হয়। এই কারণ লোক হয়েছিল অনেক। আমরা যখন সভাস্থলে উপস্থিত হলাম তখন সকলকে আমার আগমনী জানান হল। কথাটা শুনে অনেকেই আমার দিকে চেয়ে দেখল। দুঃখের বিষয় আমার মুখ দেখে কেউ সন্তুষ্ট হল না। শরীরের রং যথায় শিক্ষা দীক্ষার মাপকাঠি তথায় মনুষ্যত্বের স্থান হতে পারে না। অতি কষ্টে মিঃ দান্তে সভাস্থ সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যার যা প্রশ্ন তা লিখে রাখুন, বয়রা তা নিয়ে

আসবে। অনেকে আমার রূপ দেখে প্রশ্ন করাটাও হেয় মনে করেছিল। যারা প্রশ্ন করেছিলেন তাদের একটি কথার জবাব আমি দিয়েছিলাম। সেই প্রশ্নটির জবাব দিতে আমার আধঘণ্টা লেগেছিল। আমি বলেছিলাম, "Blood preservation is nothing but barbarism. আমেরিকাবাসী যদি সে দোষে দোষী না হত তবে আজ হারলাম তৈরী হত না। শ্বেতকায়দের নিগ্রো-ভয় থাকত না।" কিন্তু কথাটা বলার সংগে সংগেই মনে হল দেশের কথা। গীতা থেকে আরম্ভ করে সেনবংশ পর্য্যন্ত বর্ণ-শংকরদের ভয়ে অস্থির ছিলেন। তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে যদি হরিজনের কথা বলি তবে এখানে তা অবান্তর বলেই গণ্য হবে। বিদেশে গিয়ে কিন্তু এসব কথা বলা চলে না। দেশের এবং জাতের মান ইজ্জত বজায় রাখতে গিয়ে হাজার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। পৃথিবীর লোক ক্রমেই দেশ বিদেশের সংবাদ নানা ভাবে অবগত হচ্ছে। এরূপ মিথ্যা কথা বলার কোন মূল্য থাকিবে না। সময় থাকতে সংশোধন না করলে ভারতের দিকে কেউ সুদৃষ্টিতে চাইবে না। অতএব হুসিয়ার।

এসব কথা বাদ দিয়ে এখন আমেরিকার কথা বলাই দরকার। ইচ্ছা হল বিশ্ববিখ্যাত ওয়ালস্ স্ট্রীটটা একটু বেড়িয়ে আসি। ওয়াল স্ট্রীট আমার বাসস্থান হতে বেশি দূরে ছিল না। তবুও বাসে করেই রওয়ানা হলাম। বাস থেকে নেমেই পেলাম ওয়াল স্ট্রীট। ধীর পদে নিক্ষেপে সেদিকে হাটতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম এখানে বসেই আমেরিকার ধনীরা পৃথিবীর বাণিজ্য, সাম্রাজ্যবাদ এবং মনরো নীতির ভাষ্য করে থাকেন। শুধু এই স্ট্রীটটুকু দেখার জন্যই আমেরিকা ছাড়াও বিদেশ হতে অনেক লোক আসে।

ওয়ালস্ স্ট্রীট আমেরিকার অন্যান্য যে কোন স্ট্রীট হতে অল্প পরিসর।

এটাকে যদি গলি বলা হয় তবে বোধহয় দোষ হবে না। তবে একথা মনে রাখতে হবে, ভারতে ওয়ালস্ স্ট্রীটের মত একটিও ষ্ট্রীট্ নাই। তাজের তুলনা যেমন তাজই, ওয়ালস্ স্ট্রীটের তুলনাও শুধু ওয়ালস্ স্ট্রীটই। স্ট্রীটের দুদিকে উচ্চ প্রাসাদগুলি দাঁড়িয়ে আছে। পথে অনেক লোক চলেছে, কিন্তু কারো মুখে হাসি নাই। তারা খুবই চিন্তিত এবং বেশ অতর্কিতে পথ চলেছে। মাঝে মাঝে একের সংগে অন্যের ধাক্কাও লাগছে। কিন্তু তারা ব্যবসা চিন্তায় এতই তন্ময় হয়ে হাঁটছিল যে শিষ্টাচার সূচক "দুঃখিত" কথাটা পর্যন্ত কারো মুখ হতে বার হচ্ছিল না। আমি এপথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম বলেই বোধ হয় অনেকের দৃষ্টি আমার দিকে পড়ছিল। ওয়ালস্ স্ট্রীট দেখতে আমি একা যাইনি আমার সংগে আরও তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন। সংগের তিনজন আমেরিকান আমার পেছন পেছন চলছিলেন। একটা কালা আদমীর পেছনে তিনজন সাদা লোক হাঁটছে তা কম কথা নয়, এতে অনেকেরই জিজ্ঞাসু চোখ আমার উপর পড়ছিল। অনেকেই আমার সংগে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সাথীরা তাতে বাধা দিচ্ছিল। শুধু জানিয়ে দিচ্ছিল আমি নিগ্রো নই, বিদেশী। ডিভাইন্ ফাদার যখন পথে চলেন তখন তাঁর সংগে অনেক সাদা লোকও চলে তাই অনেকে হয়ত ভাবছিল আমি নিগ্রো ধর্ম প্রচারক।

সংগের তিনজন আমেরিকানের পরিচয় এখনও দেইনি এবং কি করে তাদের সংগে আমার পরিচয় হল সে কথাই এখন বলছি। নিউইয়র্ক আসার কয়েকদিন পরই গরম শুরু হয়। গরমে উলের সার্ট ব্যবহার করতে কষ্ট হচ্ছিল। শুনছিলাম নিউইয়র্কএ দোকানীরা পর্যন্ত নিগ্রোদের সংগে সংব্যবহার করে না। দোকানীরা যাতে আমার সংগে সংব্যবহার করে এবং আমাকে নিগ্রো না ভাবে সেজন্য মাথায় পাগড়ী বেঁধে পথে

বের হব ঠিক করলাম। গরমের সময় দুপুর বেলা অল্প লোকই পথে বের হয়। তা বলে মনে করা উচিত নয় যে পথে লোক চলাচল একদম বন্ধ হয়ে যায়! পাগড়ী বেঁধে পথে বের হতে আমার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। বের না হলে নয় বলে একটা আংশিক নিজনপথে চলাই ঠিক করলাম। পন্‌চম্ এ্যাভেনিউ তে না গিয়ে অষ্টম এ্যাভেনিউতেই যাওয়া ঠিক করলাম। পথে বের হয়ে কতকদূর যাবার পরই ইহুদী এবং আরবগণ "প্রিস্ট্, প্রিস্ট্" (ধর্ম পুরোহিত) বলে চিৎকার করতে লাগল। তাদের এড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। একটু এগিয়ে যাবার পর তিনটি আমেরিকান্ যুবতী আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং তাদের হাত দেখে যদি তাদের ভাগ্য বলতে পারি তবে প্রত্যেকে একটি করে ডলার দিবে সে লোভও দেখাল। তাদের কথার আমি থম্‌কে দাঁড়ালাম। তারা কি চিন্তা করে তিন ডলারের তিনখানা নোট আমার হাতে দিতে চাইল। তাদের ডলার ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তারা আমেরিকান না ইউরোপীয়ান? যুবতীরা বলল তারা আমেরিকান এবং হিন্দু অকাল্টটিস্ট, স্পিরিচুয়েলিস্ট পামিস্ট্ এসবের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের কথা শুনে আমি বললাম এসব আমি মোটেই বিশ্বাস করি না, তারা ইচ্ছা করলে আমাকে রেহাই দিতে পারে। মেয়েরা বলল, "আমেরিকাতে হিন্দু এবং ইউরোপীয় জিপ্‌শীরা এসব করেই দুপয়সা রোজগার করে, আপনি তা থেকে বাদ যেতে পারেন না, এসব যদি আপনি না জানেন বলেন তবে নিশ্চয়ই আপনি হিন্দু নন।"

"আপনাদের কি ধারণা যে আমরা এসব করেই দিন কাটাই? মহাত্মা গান্ধির নাম শুনেছেন কি?"

"হাঁ শুনেছি তিনি একজন ফকির ছাড়া আর কিছুই নন।"

মেয়ে তিনটিকে কাছে ডেকে এনে বললাম, "আপনারা হিন্দুদের সম্বন্ধে যে ধারণা করে রেখেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। হিন্দুদের মাঝে অনেক লোক আছেন যারা আপনাদের চেয়ে কম সভ্য নন। শিক্ষায় দীক্ষায় এমন অনেক হিন্দু আছেন যাদের সংগে আপনাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই তুলনা করা যেতে পারে। এখন আপনারা পথ দেখুন।" আমি এখন হতে আর পাগড়ী ব্যবহার করব না, এতে লোকে যদি আমাকে নিগ্রো ভেবে অপব্যবহার করে তাও মাথা পেতে নিব। যখন আমি মেয়ে তিনটির সংগে কথা বলছিলাম তখন উল্লিখিত ভদ্রলোক তিনজনের একজন আমার সংগে পরিচয় করেন এবং পরে অন্য দুজন এসে যোগ দেন।

আমেরিকায় দুটি রাষ্ট্রনৈতিক দল আছে। এই দুটি দলের মাঝে কখনও মতের মিল দেখা যেত না। এক দল অন্য দলকে টেক্কা দিয়ে নতুন কিছু করে জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জন করত। এতে ফল ভালই হত। আমেরিকার পরিষ্কার এবং সুন্দর পথ ঘাট, বাড়ি ঘর, আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতি তারই ফলে গড়ে উঠেছিল। আমেরিকার পুঁজিবাদীরা ভেবে দেখল, এরূপ দলাদলির ফলে তাদের বেশ ক্ষতি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। এদিকে আমেরিকান কন্স্টিটিউসন মতে এরূপ দল ভেংগে দিবারও অধিকার তাদের ছিল না। তাই তারা একটু নতুন পথ অবলম্বন করল। সে পথটি হল জনমতের প্রতিনিধিদের বশীভূত করে রাখা। কি প্রকারে সে কাজটি হয় তা এখানে বলার বিষয় নয়। আমি শুধু জেনেছিলাম এবং বেশ ভাল করে বুঝেছিলাম যে আমেরিকার জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ওয়ালস্ স্ট্রীটের বশীভূত এবং ওয়ালস্ স্ট্রীটের ধনীরাই আমেরিকার কাজ কর্মের চাবিকাঠি তাদের মুঠার মাঝে রেখে দিয়েছে।

দুদিকের দৃশ্যবলী দেখার জন্য ওয়ালস্ ষ্ট্রীটে আমরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলতে লাগলাম। বড় বড় বিল্ডিংগুলি দেখে সেখানে কি হয় না হয় তার কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই সাথীদের একটি পাবলিক স্থানে নিয়ে যেতে বললাম। সেয়ার মারকেট কাছেই ছিল, আমরা সেয়ার মারকেটের হলঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। হলঘরে তখন অনেক লোক দাঁড়িয়ে বেচাকেনা করছিল। সেয়ারের দাম ক্রমাগতই নামছিল এবং বাড়ছিল। আমি সেয়ারের দাম উঠা নামার দিকে একটুও তাকাচ্ছিলাম না, শুধু লক্ষ্য করছিলাম লোকের আচার ব্যবহার, কারণ আমেরিকায় যাবার পূর্বে একদিন বোম্বের সেয়ার মারকেটে গিয়ে কতকগুলি পাগল দেখে ভয় হচ্ছিল এদের হাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতে হয় তবে বড়ই বিপদে পড়তে হবে। সুখের বিষয় ওয়ালস্ ষ্ট্রীটের সেয়ার মারকেট সেরূপ নয়। এখানে শৃংখলা বিরাজমান। ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণ ধীরে কথা বলছিল। এক দলের কথার শব্দ অন্য দলের কানে পৌছছিল না। এটাকেই বলে ইউরোপীয় সভ্যতা। এখানে একে অন্যের সুযোগ এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজ করে। বম্বেতে সেরূপ কিছুই নাই।

আমাকে দেখতে পেয়েই কতকগুলি সেয়ার বিক্রেতা কাছে আসল এবং শেয়ারের বন্দ হাতে দিয়ে শেয়ারের গুণাগুণ বলতে লাগল। তাদের কথায় বাঁধা দিয়ে বললাম আমি এখানে ব্যবসা করতে আসিনি। ব্যবসায়ীরা কেমন ব্যবসা করছে তাই দেখতে এসেছি, আমি একজন ভারতীয় পর্যটক মাত্র। আমাকে ঠাট্টা করে একজন বলল, "যদি আজ লক্ষ খানেক ডলার রোজগার করতে পারি তবে আমিও আপনার মত পর্যটক হব।" আমি বেশিক্ষণ এদের কাছে না দাঁড়িয়ে সাথীদের নিয়ে হলঘর হতে বেড়িয়ে পড়লাম। ওয়ালস্ স্ট্রীটে এমন কিছুই ছিল না যা দেখে আমার আনন্দ হতে পারে, তাই সাথীদের নিয়ে ওয়ালস্ ষ্ট্রীট

পরিত্যাগ করে অন্যত্র আর কিছু দেখার মত আছে কিনা তা দেখাতে বললাম।

লোকে ওয়াশিংটন দেখতে যায়। আমি কিন্তু সেদিকে পা বাড়াইনি। সেখানে যেয়ে লাভ কি? ওয়াশিংটনে কি হবে কি না হবে তা ঠিক হয় ওয়ালস্ স্ট্রীটে। এখানে থেকেই আমেরিকার গতিপথ দেখা ভাল। শহর হিসাবে ওয়াশিংটন আমার দেখা উচিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণ দিকে বর্ণবিদ্বেষ এতই প্রবল যে তাল সামলাতে পারব না বলেই সেদিকে পা বাড়াইনি।

যে সকল ভারতবাসী ভারতের বাইরে যান তাদের প্রত্যেকের উচিত বিদেশীর সহানুভূতি অর্জন করা। সেরূপ সহানুভূতি অর্জন করতে হলে অর্থ এবং সময়ের দরকার। আমার কিন্তু এত্নটার কোনটাই ছিল না। তবে যারা বিদেশে আড্ডা গেড়ে বসেছেন এবং দেশসেবাই যাদের একমাত্র কাজ, তারা না করতে পারেন এমন কাজ নাই। লোকমুখে শুনেছি, মিঃ হরিদাস ও মোবারক আলী এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আমেরিকাতে ভারতবাসীর জন্য বেশ খাটছেন, এমন কি তারা নিজের খেয়ে জংগলের মোষ পর্যন্ত তাড়াতে কসুর করছেন না। আর্ল বল্ডুইন যখন আমেরিকায় লেকচার দিতে গিয়েছিলেন তখন এই দুটি ভদ্রলোক নাকি আর্ল মহাশয়ের প্রত্যেক লেকচারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন।

অনেক চিন্তা করে দেখলাম হারলামে থাকা উচিত হবে না। এদিকে আমার সংগে যে সামান্য অর্থ ছিল তারও একটা সুব্যবস্থা করতে হবে, তাই একদিন বাড়িওয়ালীর মেয়েকে সংগে নিয়ে একটি ব্যাংকে গেলাম। ব্যাংক ম্যানেজার ইংলিশম্যান, তিনি আমাকে নিগ্রো দুহিতার এক সংগে দেখে কিছুই মনে করলেন না, কিন্তু তার অন্যান্য সহকারীরা আমার দিকে

তাকিয়ে রইল। নিগ্রোরা কোন ব্যাংকে গিয়ে চেয়ারে বসতে সাহস করে না। আমি অভ্যাসবশেই একটা চেয়ার টেনে বসলাম এবং সংগের নিগ্রো মেয়েটিকেও অন্য একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

ম্যানেজার আমার সংগে কথা বলে একজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে ডাকলেন। রিপোর্টার আমার দেশ এবং আমার সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ নেবার পর জিজ্ঞাসা করলেন এমেরিকায় সাইকেলে বেড়িয়ে আমার কি লাভ হবে? আমি রিপোর্টারকে বললাম "এদেশ দেখাই আমার কর্তব্য, দেশে গিয়ে এদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে পারব। এরই মাঝে বুঝতে পেরেছি, যে সকল ধারণা আমার দেশের লোক আপনাদের দেশ সম্বন্ধে পোষণ করে তা মোটেই সত্য নয়। এদেশেও ডিমক্রেসী নাই। এদেশেও লোক অভুক্ত অবস্থায় থাকে। ডিমক্রেসী যে সকল দেশে বর্তমান আছে সেখানে কেউ উপবাস করে না। সোভিয়েট চীন, সোভিয়েট রুশিয়ায় তো কেউ উপবাস করে না। সকলেরই কাজ করার অধিকার আছে এবং সকলেই কাজ করছে। পুঁজিবাদীরা মুখে বলে তারা ডিমক্রেটিক, আসলে কিন্তু তারাও এক ধরনের ফেসিস্থ।" এসব কথা বলাতে রিপোর্টারের সন্দেহ হল আমি ইন্টার ন্যাশনেল কমিউনিস্ট দলের একজন সভ্য। লোকটির ভুল ভেংগে দিয়ে বললাম, "আমি কোন দলের লোক নই, আমি একজন পর্যটক মাত্র। তবে অনেকদিন দেশ ভ্রমণ করে খাঁটি ডিমক্রেসীর সন্ধান পেয়েছি বলেই এসব কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শুনেছি আমেরিকার সকলই ধনী, এখানে এসে দেখলাম বেকার মজুরের সংখ্যাও উপেক্ষা করার মত নয় এবং মজুরীর দামও কমতে আরম্ভ করেছে। তবে একটি কথা শুনে সুখী হবেন মিঃ রিপোর্টার, আপনারা এদেশে যত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন অন্য কোন দেশ সেরূপ উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি।

আমি আপনাদের দেশের খারাপ দিকটা দেখার জন্য আসিনি, আমি এসেছি আপনাদের দেশের ভালর দিকটা দেখতে।"

সংগের নিগ্রো মেয়েটি আমার কথা শুনছিল আর ভাবছিল। সে চেয়ারে বসে থাকতে পারছিল না। তার দুর্দশা দেখে ব্যাংকের কাজ শীঘ্র শেষ করে বাইরে এসে তাকে বিদায় দিলাম। সে বিদায়ের বেলা বলল, "সত্বর ফিরে এস, আমি তোমার কথা আজই আমার বন্ধু মহলে প্রচার করব।" মেরীকে বিদায় দিয়ে এবার আমি সুস্থ মনে পথে বেড়াতে লাগলাম।

নিউইয়র্ক নগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি পার্ক আছে তাকে বলা হয় সেণ্ট্রেল পার্ক। সেই পার্কটি দেখতে বড়ই ইচ্ছা হল। তারপর এ রৌদ্রে কোথায়ই বা আর যাই? সেণ্ট্রেল পার্কে গিয়ে সেই পার্কে বেড়াতে লাগলাম। পার্কটি বেশ বড়। গড়ের মাঠের দ্বিগুণ ত হবেই। তাতে নানারূপ বৃক্ষ। বৃক্ষগুলি সাজানো। মাঝে মাঝে সরোবর আছে। সরোবরে খেলে হাঁস এবং অন্যান্য পাখী এসে বিচরণ করে। মাছও সরোবরে প্রচুর রয়েছে। কিন্তু এখানে সুযোগমতে যদি দুষ্ট লোক কাউকে পায় তবে তাকে হত্যা করে যথাসর্বস্ব হরণ করে। এখানে এসে একজন সিলেটি ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় হল। পরিচয় জানলাম তাঁর বাড়ি আমার গ্রাম হতে বার মাইল দূরে। দেশে তিনি মোল্লার কাজ করতেন, এখন তিনি একজন পাকা কমিউনিস্ট। তিনি আমাকে পেয়ে যত আনন্দ পেলেন, আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম। তিনি যখন আমার পরিচয় পেলেন তখন তাঁর চোখদুটো লাল হয়ে উঠল। তিনি কি কতকগুলো কথা বললেন তার একটাও বুঝলাম না, বোধ হয় হিব্রু ভাষায় কথা বলছিলেন। তার পর তিনি আমাকে একটা রেঁস্তোরায় নিয়ে যান। রেঁস্তোরায় খাবারের যা অর্ডার করলেন তা শুনে অবাক

হলাম। খাবার এলে বললেন, "গরু গরুই, দেবতা নয়, শূকরও তাই। খেয়ে হজম করতে পারবে তো ঠাকুর?" আমি নীরবে সবই গলাধঃ-করণ করলাম। কথায় কথায় বললেন, "মিঃ প্যাটেল এসেছিলেন। লোকটি ভাল, কিন্তু পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী বুদ্ধি আর স্বভাব, যতদিন সুযোগ ও সুবিধা থাকে ততদিনই বজায় থাকে, সহজে যায় না।"

আমাকে তিনি তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন না, নিয়ে গেলেন 'ইনটার ন্যাশনাল' নামীয় একটি হোটেল। যত রাজ্যের কমিউনিস্ট এই হোটেলটাতে বাস করে। কয়েকজন লোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েই তিনি হল ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "কমরেডগণ, এই লোকটা আমার দেশ থেকে দুদিন পূর্বে এসেছে, একদম তাজা। এর সংগে কথা বলে বুঝতে পারবে ভারতে আমাদের কি অবস্থা। যদি পার তো কয়েক দিনের মধ্যে এটাকে মানুষ তৈরি করে ফেল।" পংগপালের মত অনেক লোক নীচে নেমে এল, তাদের মধ্যে ছিলেন দুজন ভারতীয় ছাত্র। কর্পূরতলার মহারাজা আমেরিকায় এসেছেন, তাঁরই কথা অনেকক্ষণ ধরে চলল। তারপর আমাকে জিগ্‌গাসা করা হল আমি তাঁরই দলের একজন কি না। মোল্লা মশায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "না হে, লোকটা পেটি বুরজোয়া, আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি। আমার জন্ম হয়েছে কৃষকদের মাঝে, আর ওর জন্ম হয়েছে প্রকৃত পরশ্রমজীবিদের মাঝে। আমাদের রক্ত খেয়ে ওরা বাঁচে, তাই দেখাতে এনেছি এদের আকৃতি প্রকৃতি দেখতে কেমন, এদেশে যেমন এরূপ জীবের অভাব নাই, আমাদের দেশেও তেমনি সেরূপ জীবের অভাব নাই।"

কমিউনিজমের প্রতি আস্থা থাকলেও এরূপ ক্ষেত্রে মন বিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এদের কথা শুনে আমার মনের পরিবর্তন হয়েছিল, কিছুই ভাল

লাগছিল না। এমনি যখন মনের অবস্থা তখন জর্জিক জাহাজের একজন অফিসার এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পারলাম; তিনিও আমাকে চিনতে পারলেন। দুজনায় একটু কথা হল, তারপর তিনি আমাকে 'কমরেড' রূপে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলের মুখের ভাব বদলে গেল। এইবার আমার পালা। মোল্লা মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এমন অশিষ্টাচার করে মানুষকে দলে টানা যায় না। লোককে রাগাতে নাই, বুঝাতে হয়। লোক বুঝুক, তারপর আপনিই দলে আসবে। যারা বুঝেও আসবে না, আজ আমার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন সেই ব্যবস্থা তাদের জন্য করতে পারেন। ধর্ম প্রচার এবং কমিউনিজম প্রচার এক নিয়মে হয় না। মনে রাখবেন, ধর্মপ্রচারের পিছনে রাজশক্তি থাকে, কিন্তু কমিউনিজম প্রচারের পিছনে রাজশক্তি থাকে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে, কাজে সফল হতে হলে ধৈর্যের দরকার, সাহসের দরকার, সহিষ্ণুতার দরকার। মোল্লা সাহেব, যাকে দলে টানবেন তাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিবেন, শত্রু বলে নয়।"

অনেক কথা বলে গভীর রাত্রে যখন ফিরছি, মোল্লা সাহেব আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের লোক কি এখনও বোঝে না যে, তাদের সুখ-শান্তি নাই, সুযোগ-সুবিধা নাই?" আমার বলার মত আর কিছুই ছিল না। সবিনয়ে মোল্লা মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। পরের দিন একশত আট স্ট্রীটের পূর্বদিকে একটা রুম ভাড়া করে চলে গেলাম। এখানে সবাই সাদা। সাদা লোকের কাছে না থাকলে নানারূপ অসুবিধা হয়। এখানে এসেই নিজের পরিচয় দিয়ে, নানারূপ বিষয় জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। স্থান পরিবর্তন করার পরই এমন অনেক লোকের সংগে দেখা হল যাতে নিউইয়র্কে পথ প্রদর্শকের অভাব হল না।

অনেকেই হয়ত শুনেছেন আমেরিকার লোক ধনী। আমারও সেই ধারণা ছিল। আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে কয়েক সপ্তাহ থাকার পরই নিত্য নূতন সংবাদ আমি পেতে লাগলাম। শ্রীহট্ট নিবাসী আমেরিকা প্রবাসীরা এবং অন্যান্য প্রবাসী ভারতবাসীরা আমাকে মিস্ মেয়ো লিখিত বই এর একটা পাল্টা বই লিখতে বললেন এবং সেই অনুযায়ী নানা স্থানের এবং নানা লোকের সংগে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। যে যা বলতেন সব কিছুতেই আমি সম্রাট নাসিরউদ্দীনের মত 'তাই হবে' বলে সায় দিতাম, কিন্তু আমার মনের কথা কারও কাছে বলতাম না। ঠিক করেছিলাম, আমেরিকাতে ভাল যা কিছু দেখব দেশে গিয়ে তারই কথা বলব। আমেরিকার দোষের কথা স্বদেশবাসীর কাছে বললে তাতে আমেরিকার ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে আমাদেরই।

টাইম্স্ স্কোয়ার নিউইয়র্ক-এর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। টাইমস্ স্কোয়ার দুই ভাগে বিভক্ত, আপ, ও ডাউন। আমাদের কথায় বলব পাতলপুরী এবং আকাশ পুরী"। মর্ত্য বা উপরে ৪২নং স্ট্রীট ও ৫নং এভিনিউ এর সংযোগ স্থলে দিনরাত লোকের ভিড় লেগে থাকে। এমন ভিড় কলকাতার কোথাও দেখা যায় না। জনতা নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন সর্বসাধারণ দ্বারা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সংগে প্রতিপালিত হয়। এতে জনতার সকল রকমের সুবিধা হয়। ফুটপাথে যারা চলে তারা একে অন্যকে বাঁয়ে রেখে চলে। আলোর সাহায্যে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ হয়; অবশ্য পুলিশও থাকে। পুলিশ দুরকমের। যারা পুলিশের সাধারণ পোষাক পরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে, পদচারীদের নানা বিষয়ে সাহায্য করে। তাদের ছাড়াও আর একরকমের গুপ্ত পুলিশ আছে। তাদের দেখি নি তাদের কথা শুনেছি মাত্র। তারা গুপ্ত পুলিশ, ওদের বলা হয় 'জিম্যেন'। তাদের পোষাকের কোন বিশেষত্ব নাই। সাধারণ পোষাক

পরেই তারা অপরাধীর সন্ধান করে বেড়ায়। শুনেছি, পথচারীদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করে, ওরা তাদের কাছে ঘেঁষে না। ওদের ধারণা যারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় তারা পকেটমার জাতীয় নিকৃষ্ট জীব হতে পারে না।

এইবার পাতালের কথা বলছি। লণ্ডনের মত এখানেও ভূগর্ভ রেলপথ আছে। কিন্তু লণ্ডনের চেয়ে লোকের চলাচল বেশী এবং স্টেশনগুলিও তুলনায় অনেক বড়। টাইম্‌স্‌ স্কোয়ার-এর স্টেশনের সংগে চেয়ারিং ক্রসের তুলনা হতে পারে না। টাইম্‌স্‌ স্কোয়ার হাওড়া স্টেশনের দ্বিগুণ। লোক চলাচল উপরে যেমন, নীচেও তেমনি। গাইড আছে, সে পথের সংবাদ দেয়। ডলারের ভাংগানি নিয়ে কয়েকটী লোক বসে থাকে, তাদের কাছে একশত ডলারের নোট ও ভাংগানো যায় এবং তার জন্য কোনওরূপ বাট্টা দিতে হয় না। সুবিধা সব রকমে বিরাজ করছে। একটা দেখবার মতন জায়গা বটে। সেখানে গিয়ে অন্তত চার ঘণ্টা কাটালে স্থানটি কিরূপ তার কিছুটা বুঝতে পারা যায়।

জায়গাটার কিন্তু বদনাম আছে। কয়েক দিন নানা লোকের সংগে সেখানে যাওয়া আসা করছিলাম, পরে একদিন একাকী গিয়ে বুঝতে পারলাম বদনাম যা আছে তা সত্য বটে। এই স্থানটি দেখে মনে হল মিস্‌ মেয়োকে গিয়ে বলি, তিনি যেমন ভারতবর্ষের নর্দমা-ঝাঁট দিয়ে বই লিখেছিলেন তেমনি হারলামের কোণ থেকে আরম্ভ করে টাইম্‌স্‌ স্কোয়ারের বুক পর্যন্ত ঝাঁট দিয়ে যদি বই লিখতেন তবেই বলতাম তিনি স্বাধীন লেখিকা। কিন্তু দেখা হয় নি। শুনলাম তিনি কোনও হিন্দুর (অর্থাৎ ভারতবাসীর) সংগে সাক্ষাৎ করেন না।

মর্ত্য আর পাতালের কথা বলছি, এইবার স্বর্গ বা আকাশের কথা বলি। গংগা নদীর উপর একটা পুল আছে—সেরূপ পুল যদি

হাওড়া থেকে আরম্ভ করে চন্দননগর পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয় এবং তার উপর যদি বোম্বাইএর মত ইলেকট্রিক ট্রেণ চলে তবে তা দেখতে যেমন হবে, এলিভেটরও ঠিক সেরূপ। এলিভেটরের উপর লিফ্‌ট্‌এ করে ওঠা যায়, পায়ে হেঁটে উপরে উঠার সিঁড়িও আছে। যাদের ভুঁড়ি মোটা তাদের পায়ে হেঁটে এলিভেটরে উঠতে দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস হেঁটে এলিভেটরে উঠলে পেট কমে। টাইমস্ স্কোয়ারের কাছে, এলিভেটরের স্টেশনে বিকাল বেলা এবং রাত্রি দুটার পর ভয়ানক ভিড় হয়। এখানে নূতন জীবনের স্বাদপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরই ভিড় বেশী।

নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি, এই তিনটি মাস নিউইয়র্ক নগরের গরিব লোকের পক্ষে বড়ই কষ্টকর সময়। যাদের ঘরভাড়া দিবার ক্ষমতা থাকে না, শীতে তাদের বড় কষ্ট হয়। শীত মানুষকে যেমন পরিশ্রমী করে তেমনি শক্তিহীনও করে দেয়। যাদের শক্তিহীন করে দেয়, তারাই বিপদে পড়ে। শীতের তীব্রতায় পথে আশ্রয়ের সন্ধানে হেঁটে যখন একেবারে কাতর হয়ে পড়ে তখন সেই ধনী দেশের গরিব লোকেরা আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়েতে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। পাতাল শীতের সময় গরম থাকে। কিন্তু খাবার খেতে তাদের আবার মাটির উপর উঠে আসতে হয়। উপর নীচে যাওয়া আসা করতে দশ সেণ্টের দরকার। অথচ দশ সেণ্ট খরচ করলে ছোটখাটো গরিব-হোটেলে রাত কাটান যায়। তবু গরিবেরা পাতাল প্রবেশ করে, শুনেছি শীত ছাড়া আরও কারণ আছে। কিন্তু সেকথা আমার বলে দরকার নাই, মিস্ মেয়ো যদি তা বলতেন তবেই ভাল হত। শোনা যায় আমেরিকায় এই শ্রেণীর গরিবদের মনের গতি তত ভাল নয়।

আমেরিকায় বেকারদের জন্য সাপ্তাহিক খাইখরচ বাবদ সাহায্য

দেওয়া হয় কিন্তু মনে রাখা উচিত, সাহায্য সহজলভ্য নয়, তাতে সুপারিশের দরকার হয়। তাছাড়া নাগরিকের অধিকার না থাকলে এ সাহায্য পাওয়া যায় না। সুপারিশ ও নাগরিকের অধিকার লাভ ভারতবাসীর পক্ষে যেমন কষ্টকর, ইউরোপীয়দের পক্ষে তত কষ্টকর না হলেও সহজে তারাও নাগরিক হতে পারে না। এ এক বড় বালাই। গরিবদের বিক্ষোভের পুন্‌জীভূত ধূম্ররাশি ঊর্ধাকাশে উঠছে, এখন বাকী শুধু অগ্নির সন্‌চার ; হয়ত একদিন অনুকূল বাতাসের সন্‌চার হবে এবং আগুনও দেখা দিবে। তখনই প্রকৃতভাবে আমেরিকায় "বাই দি পিপুল, ফর দি পিপুল, অফ দি পিপুলের" স্বরূপ বিকশিত হবে।

গত বৎসরের হিসাব মতে আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় মাত্র তিন হাজার ছিল। নিউইয়র্ক, ডিট্রয়, স্টকটন, লুগাই ও ইম্‌পিরিঅ্যাল ভ্যালিতেই তারা থাকে। অন্যান্য স্থানে যে দু-একজন আছে তারাও উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত তবে তাদের সংগে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এখন আমি আর সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে নিউইয়র্ক-এর ভারতীয়দেরই কথা বলব।

নিউইয়র্ক-এর হিন্দুদের সংখ্যা পাঁচ-শ থেকে ছয়-শ ; এর মধ্যে বাংগালী মুসলমানই শতকরা নব্বইজন। বাকী দশজন অন্যান্য ভারত-বাসী। তাতে পান্‌জাবী, পারসী, বাংগালী হিন্দু, সিংহলীও আছে, এবং তারা প্রত্যেকেই দেশ থেকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখেই গিয়েছিল। বাংগালী মুসলমানরা আমেরিকাতে নাবিক হয়ে যায় এবং জাহাজ থেকে পলায়ন করে চিরতরে আমেরিকায় বসবাস করবার চেষ্টা করে। যে কয়জন শিক্ষিত লোক আমেরিকায় গিয়েছে তারাও ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। আমেরিকা সরকার বর্তমানে একটা আইন পাশ করেছেন। যে সকল বাদামী (Brown) ও হলদে

(Yellow) বিদেশী ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে আমেরিকায় পৌঁছেছিল তারা অর্ধ-নাগরিকরূপে গণ্য হবে। অর্ধনাগরিকের মানে হল তাদের নির্বাসন (Deportation) দেওয়া হবে না। আমেরিকার নাগরিক হলে যে সুবিধা পাওয়া যায় সে সব সুবিধা অর্ধ-নাগরিকরা পাবে না; তবে মাত্র আমেরিকায় থাকতে পারবে। এরা কাজকর্ম পায় না। আমেরিকার নাগরিকরা যেমনভাবে কাজ পেয়ে থাকে এদের সে অধিকার নাই। এরূপ অর্ধনাগরিক হওয়া কত কষ্টকর তা যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরাই ভাল করে জানে।

যাঁরা সমুদ্রে বেড়িয়েছেন অথবা নাবিকের সংগে কথাবার্তা বলেছেন তাঁরা হয়ত ভাল করেই জানেন কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, খালাসী ও তেলওয়ালা জাহাজে কি কঠোর পরিশ্রম করে। এ সকল চাকরি পেতে এবং তা বজায় রাখতে তাদের তিন মাসের মাইনে সারেংকে দিতে হয়। এইভাবে দিয়ে থুয়ে এবং নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে তারা যখন আমেরিকার বন্দরগুলিতে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন স্বতঃই তাদের পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পালিয়ে যাবার পথ সুগম নয়। প্রথমত আমেরিকার বন্দরগুলিতে ভারতীয় নাবিকদের অবতীর্ণ হবার পাশই খুব কম দেওয়া হয়। তারপর যারা পাশ পেয়েও যায়, তারা যখন তীরে নামে, তখন হয় সারেং নয় টেণ্ডল তাদের সংগে থাকে। সারেং, টেণ্ডল সংগে থাকলে পালিয়ে যাওয়া অতীব কঠিন। তা ছাড়া সারেং ও টেণ্ডলগণ সদাসর্বদা নাবিকদের 'কাফের'এর দেশে থাকতে মানা করে এবং আমেরিকায় যদি থেকে যায় তবে মরলে পরে নরকে যাবে বলে ভয় দেখায়। অনেকে পালাবার সুযোগ পেয়েও নরকে যাবার ভয়ে পালায় না। যারা নরকের ভয় পায় না, এবং সুযোগ পায়, তারাই পালায়। অনেকে আমার কাছে বলেছে তথাকথিত স্বর্গ

মানুষের কল্পিত, বাস্তব স্বর্গে কিছুদিন বসবাস করে পরে নরকে গেলে দুঃখ করার কিছুই থাকবে না। ভারতীয় মজুরগণ আমেরিকাকে খাঁটি স্বর্গ বলেই ভাবে। বাস্তবিক আমেরিকার বাসগৃহ, পথ ঘাট স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা প্রভৃতি আমাদের পক্ষে অনেকটা আমাদের দ্বারা কল্পিত স্বর্গেরই মত।

পূর্বেই বলেছি আমেরিকার ডক থেকে বার হতে গেলে চুরি করে বার হওয়া যায় না। তবুও আমাদের দেশের লোক পালায়। আল্লা তাদের হৃদয়ে ভক্তি দিয়েছেন, বাহুতে শক্তি দিয়েছেন, মগজে বুদ্ধি দিয়েছেন। আমার মনে হয়, পৃথিবীর লোক যা করতে পারে না, আমাদের দেশের লোক যদি সুযোগ ও সুবিধা পায় ত তাও করতে পারে। আমি এখন পূর্ববর্ণিত মোল্লা সাহেবের পলায়ন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলছি।

রাত্রি তখন তিনটা। নদীতে তখন ভাঁটা পড়েছে। মোল্লা সাহেব রান্নাঘর থেকে বড় বড় দুটা তামার হাড়ি বার করে রশি বেঁধে জলে ছেড়ে দিয়ে সেই রশি ধরে নিঃশব্দে নদীতে নেমে পড়লেন। তারপর ভেসে চললেন সমুদ্রের দিকে। শীতের সময় জলে থাকা কত কষ্ট তা বোঝান কঠিন। সেদিন বোধহয় তাপমান যন্ত্রে এক কি দুই ডিগ্রি উত্তাপ ছিল। মোল্লা সাহেবের শরীর অবশ হতে লাগল, আল্লাকে স্মরণ করে, তিনি ভেসে চললেন। মোল্লার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল। অবশেষে মৃত্যুর হাত ধরেই তিনি তীরে গিয়ে ভিড়লেন।

নদীতীরে লোকজন ছিল না, নদীর তীর নীরব এবং নিস্তব্ধ। মোল্লা সাহেব তীরে উঠে শরীরটাকে ঝেড়ে অবসন্ন পায়ের উপর সাহস করে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ডক থেকে বার হয়ে একটা কাঁফেতে গিয়ে এক গিনি ফেলে দিয়ে কাফি চাইলেন। কাঁফের মালিক এরূপ

লোক অনেক দেখেছে, অনেক সাহায্যও করেছে। মোল্লার প্রতিও তার দয়া হল এবং একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে, খাইয়ে, ঘরের উত্তাপ বাংলা দেশের উত্তাপের মত করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মোল্লা পরম আরামে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠেই মোল্লা বুঝলেন তার সাহায্যকারী গতরাত্রে তাকে প্রথম নম্বরের হারাম 'সরাব' খাইয়ে দিয়েছিল। এতে তার ভয়ানক রাগ হয়। প্রাণদাতা বন্ধুকে মোল্লা 'কাফের' বললেন তারপর তার ঘর পরিত্যাগ করলেন। পথে অনেক স্বজেলাবাসীর সংগে দেখা হল। কাফের ও কাফেরী কাজের কথা বলার সংগে অকপটে নিজের পলায়ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে লাগলেন। এমন কি কোন্ জাহাজ হতে পালিয়ে এসেছেন তাও বলে দিলেন। মুসলমান ভাইএর কাছে সত্য না বললে পাপ হবে ভেবেই বোধহয় মোল্লা সাহেব সত্য কথা বলেছিলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই যেদিন লোকটির একটু চৈতন্য হ'ল সেদিন বুঝলেন আমেরিকা থেকে বিদায় করে দেবার জন্য পুলিস তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এই বিপদের মূলে আছে তাঁরই মুসলমান জাতভাই. সেইদিনই তাঁর মনে এক বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি হয়। তিনি নাম পরিবর্তন করলেন, দাড়ি গোঁফ মুণ্ডন করলেন, কাফেরী টুপি মাথায় দিলেন, ইংলিশ শেখবার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ে যেতে লাগলেন, নূতন ভাবের নূতন ফুল মোল্লার হৃদয়ে ফুটে উঠল। ফুলের ফল যে কি হয়েছে তার বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি।

নিউইয়র্ক নগরে পূর্বে এমন কয়েকজন ভারতীয় ছিল যারা এই ধরনের লোককে ধরিয়ে দিলে টাকা পেত কিন্তু নূতন আইন প্রচলিত হওয়ার এই ধরনের নীচ অপচেষ্টা বন্ধ হয়েছে। নিউইয়র্ক পৌছবার পর অনেক স্বদেশবাসী, মোল্লাসাহেবের মত তাদের পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী

আমাকেও ঘিরে ধরেছিল ; কিন্তু যখন জানল যে আমি যাত্রীরূপে এসেছি এবং এদেশে থাকব না তখন তারা উক্ত প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিল।

এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও যারা আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছে, নিজের স্বদেশবাসী হয়ে এবং এমন কি নিজের জাতভাই হয়েও সামান্য লাভের জন্য এদের পুলিসের নিকট ধরিয়ে দেয় এবং ভারতে ফিরিয়ে পাঠাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়—এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ? এটাও সহ্য করা যায়, যেহেতু এসব কাজ যারা করে তাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই বললেও চলে। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখের বিষয় হল, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী আমেরিকাতে গিয়ে বাজে কাজে দিন যাপন করে অথচ এই সব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য স্বদেশবাসীদের সংবুদ্ধি দিয়ে পথে আনার কোন ব্যবস্থাই করে না। হউক না এ সকল লোক মুসলমান ধর্মাবলম্বী ? বিদেশের লোক ত ধর্ম বিচার করে না, অথবা ধর্ম দিয়ে জাতের নামকরণও করে না, এটা জানা সত্ত্বেও উদাসীন হয়ে এসব নিরক্ষরদের উপকার না করা মহা অন্যায় কাজ। অনেকে আবার "ফেলোসিপ অব রিলিজিয়ন" নিয়ে বেশ চিৎকার করেন, এবং সে চিৎকার আমি স্বকর্ণে শুনেছি। কিন্তু এই নিরক্ষর মুসলমানরা কি সকল ধর্মের বাইরে ? যে সকল ভারতীয় ধর্মপ্রচারক আমেরিকায় গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন তাদের দৃষ্টিও ওদের দিকে পড়ে না। বিঠল ভাই প্যাটেল যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি এসব অশিক্ষিত লোকের মাঝেই বসে থাকতেন। এসব অশিক্ষিত লোক তাঁকে আপনজনই করে নিতে পেরেছিল কারণ বিঠল ভাইও এদের অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। অনেক আমেরিকান বিঠলভাইএর অনুরাগীদের সংখ্যা দেখে তাজ্জব হয়েছিল। যারা স্বদেশবাসীকে মূর্খ এবং অপদার্থ ভেবে দূরে রাখতে চান তাঁরা বোধহয় জানেন না, তাঁরা সমাজের কতবড় শত্রু।

পরাধীন দেশের লোক স্বাধীন দেশে গিয়ে অনেক সময়ই খাপ খাইয়ে বসবাস করতে পারে না। আমরা অনেক বৎসরের পরাধীন। আমাদের নানা দোষ থাকবারই কথা। এসব দোষ অনেক সময় আমরা অনুভব করতে পারি না। বিদেশীরা আমাদের দোষ অতি সহজে বুঝতে পারে। আমেরিকাতে ভারতের শিক্ষিত লোক ক'জন গিয়েছিলেন তার সন্ধান আমি পাইনি। যারা আমার সামনে এসেছেন অথবা যাদের আমি সন্ধান করতে পেরেছি তাদের কথাই আমি বলছি। এই লোকগুলির মাঝে কয়েকজন বেশ গুণী লোকও দেখেছি, কিন্তু শিক্ষিত এবং গুণী হলে কি হয়, বহু বৎসরের পরাধীনতা আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং গুণী লোককেও অন্ধ করে রেখেছে। যারা একদম অশিক্ষিত অবস্থায় আমেরিকায় গিয়েছে তারা বরং অনেক সময় যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে পারে। দেশের কথা ভাবে, বিদেশীর সংগে খাপ খাইয়ে বসবাস করতে পারে। তবে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। এরূপ লোক সাধারণত বাংলার একেবারে অজ পাড়াগাঁ হতে কলকাতায় এসে একদম নিউইয়র্ক অথবা সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে গিয়ে জাহাজ হতে নেমে সরাসরি ইউরোপীয়দের সংগে মিশে গিয়েছিল। ভারতীয় ধর্মের প্রভাব এদের অন্ধ করে রাখতে পারেনি, ইম্‌পিরিয়েলিজমএর হিন্দু-মুসলমানীও এদের কাবু করতে সক্ষম হয়নি। এরা হিন্দু হয়ে জন্মেছে আর মরবেও হিন্দু হয়ে, ইণ্ডিয়ানত্ব এদের কাছে কখনও পৌঁছবে না। ১৯৪০ খৃঃ জানুয়ারী মাস পর্যন্ত আমেরিকার অশিক্ষিত হিন্দুদের মাঝে কোনরূপ বিকার দেখা দেয়নি। এখন যদি সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে তা আমার অগোচর।

আমেরিকাতে যে সকল হিন্দু স্থানীয় লোকের একপাড়ায় থাকে না অথবা এক পড়ায় থাকবার মত মানসিক শক্তি অর্জন করেনি তারাই

ংখ্যায় বেশী। এরা কখনও আমেরিকার নাগরিক হতে পাবরে বলে
নে হয় না, কারণ এরা এখনও শিক্ষা এবং কৃষ্টি হতে অনেক দূরে রয়ে
গছে। যাঁরা আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন তাদের শিক্ষা যেমন
য়েছে তেমনি হয়েছে তাঁদের কাল্‌চারের উন্নতি। ত্রিপুরা জেলার
শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু দেব মহাশয়ের নাম এখানে উল্লেখ করে বাস্তবিকই আমি
র্ব অনুভব করছি।

যে সকল হিন্দু আমেরিকাতে এখনও নাগরিক হতে সক্ষম হয়নি তারা শিক্ষাদীক্ষায় যেমন অনেক পেছনে পড়ে আছে তেমনি তাদের কাজ-কর্মের ফলে ভারতের বদনামও হচ্ছে। ভারতবাসীকে আমেরিকাতে নাগরিক হতে হলে নানারূপ পরীক্ষা পাশ করতে হয়। যেসকল হিন্দু নাগরিকত্ব পায়নি তারা মজুরী করবার অধিকার হতেও বন্‌চিত হয়। সেজন্যই আমাদের দেশের লোক আমেরিকাতে বাধ্য হয়ে বেকার থাকে এবং নানারূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়। এসকল লোক শিক্ষার অভাবে নিজের নিকটস্থ আত্মায়ের সর্বনাশ করতেও কোনরূপ সংকোচ মনে করে না। মিথ্যা মোকদ্দমা করা এদের একদিন পেশা ছিল বললেও দোষ হয় না। সেজন্য বোধহয় আজ নিউইয়র্কে যদি কোন অনাগরিক হিন্দু অন্য কোন অনাগরিক হিন্দুর বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে মোকদ্দমা করে তবে সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য হয় না।

আমাদের দেশে এমন কতকগুলি আইন আছে যার সাহায্যে যে-কোন লোককে যে-কোন সময়ে গ্রেপ্তার করা যায়। আমেরিকাতে সেরূপ কোন আইন নাই। তথায় প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় লোকটি দোষী নতুবা গ্রেপ্তার করা চলে না। ভারতবর্ষ হতে যেসকল লোক খালাসীর কাজ নিয়ে জাহাজ হতে পালিয়ে আমেরিকাতে বসবাস করছে, তাদের যদি জাহাজী আইন মতে গ্রেপ্তার করে ভারতে ফিরিয়ে

পাঠাতে হয় তবে প্রমাণ করতে হবে অমুক নামের লোক আমেরিকার অমুক বন্দরে অবতরণ করে এতদিন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছিল। এতটুকু প্রমাণ হবার পর জাহাজী আইনে দোষী লোকটিকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেওয়া হয়। আমেরিকার পুলিশ এখন হিন্দুদের নাড়ীনক্ষত্র জেনে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যদি আমেরিকা হতে জাহাজী আইনে দোষী হিন্দুদের তাড়াতে হয় তবে হিন্দুদেরই সাহায্য নেওয়া দরকার নতুবা এ কাজটি কোন মতেই সম্পন্ন হবে না। তারপর এ কাজটি শুধু বেকার ভারতবাসীর দ্বারাই সম্ভব। ভারতীয় বেকার অর্থের লোভে সকল রকমের অন্যায় কাজই করতে রাজি হয়। কারণ তাদের দেশাত্মবোধ মোটেই নাই, তারা জানে শুধু নিজেকেই বাঁচাতে। সেজন্যই অনেক ভেবে চিন্তে এবং অনেক পরামর্শের পর হয়ত আমেরিকা সরকার আমেরিকা হতে ভারতবাসী নির্বাসনের কাজ ভারতবাসীর উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এতে আমেরিকার সুবিধা হল অনেক কিন্তু ভারতবাসী আমেরিকাতে আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

আমাদের প্রিয় নেতা প্যাটেল যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন তিনি চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে ভারতবাসী এসব অন্যায় কাজ হতে দূরে থাকে। তিনি যতদিন আমেরিকায় ছিলেন ততদিন একটিও অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি। তিনি কতকগুলি গণ্যমান্য লোককে বলে এসেছিলেন, আমেরিকাতে যেন হিন্দুর রক্তে হিন্দুর হাত আর কলংকিত না হয়। কিন্তু উপদেশে কি হয়, পাল্টা উপদেশ যদি পায় তবে ভারতবাসী আসল কথা ভুলে যায়। পরাধীন জাতের লোক ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানই বেশি দেখে, জাতের সম্মান যাতে বাড়ে সেদিকে মোটেই তাকায় না। একটা ইউরোপীয়কে বেশ করে নিন্দা কর, তার মা-বাবাকে বেশ করে গাল দাও সে হয়ত কিছুই বলবে না, কিন্তু যেই তার জাতের

বিরুদ্ধে কিছু বলেছ অমনি সে তোমাকে মারতে আসবে। জাপানীরাও তাই। একজন জাপানীর সামনে তার ধর্মকে বেশ করে গাল দাও, তার মাতার চরিত্রে কলংক আছে বল, সে তোমাকে এড়িয়ে যাবে, কিন্তু যেই তার জাতের বিরুদ্ধে, তার দেশের বিরুদ্ধে কিছু বলেছ অমনি সে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। হয় সে মরবে নয় তোমাকে মারবে। আমরা তার বিপরীত। তারই ফলে আমরা পরাধীন।

আমাদের দেশের লোক আমাদের কি করে সর্বনাশ করে তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল মনে করি। আফ্রিকা হতে লণ্ডন আসার পর আমার মন এতই দমে যায় যে বর্ণ-বিদ্বেষের অত্যাচারকে আমি যেমন ঘৃণা করতাম তেমনি অবহেলাও করতাম। আমার মনে সদাসর্বদা হিন্দুর জাতিভেদের কথাই মনে আসত বেশি করে এবং সেই জাতিভেদের অত্যাচার হতে ভারতবাসীকে কি করে মুক্ত করা যায় তারই কথা চিন্তা করতাম। নানা চিন্তায় অনেক সময় আমার দরকারী কথাও মনে থাকত না। যা হউক তখনকার দিনের 'দেশ' কাগজের লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখে প্রকৃতিস্থ রাখতেন। তিনি আমাকে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন নিউইয়র্কে অনেক বাংগালী বাস করে এবং তাদের মাঝে অনেকেই নিরক্ষর। লণ্ডনে হিন্দুস্থান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী মিঃ সুরাত আলীও এই শ্রেণীর কয়েকটি লোকের ঠিকানা দেন। সেই ঠিকানা অনুযায়ী নিউইয়র্কে একখানা পত্রও লিখেছিলাম। তার পরই আবার সকল কথা ভুলে যাই।

নিউইয়র্কে দু' সপ্তাহ থাকার পর কয়েকজন সিলেটি মুসলমানের সংগে সাক্ষাৎ হয়, তারা আমাকে একটি প্রশ্ন বেশ জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করে, সেই প্রশ্নটি হল আমি কোন্ জাহাজে এবং কবে এসেছি। যখন আমি

বললাম জর্জিক নামক জাহাজে এসেছি তখন তারা আমার কথায় বিশ্বাস করল না এবং আমাকে বেশ ভাল করেই অবহেলা করল। আমিও তাদের সংগে কথা বললাম না। আমি ভাবলাম এরা নিরক্ষর এবং মূর্খ।

ঘটনাক্রমে একদিন একজন হিন্দু বাংগালীর সংগে সাক্ষাৎ হয় তিনি সিলেটি মুসলমানদের এক সংগে থাকেন এবং এদের যাতে উন্নতি হয় সেই চেষ্টাই সকল সময় করেন। তিনি আমাকে তার ঘরে নিয়ে যান এবং আরও তিনজন সিলেটি মুসলমানের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন এই তিনজন সিলেটি মুসলমান আমি কোন্ জাহাজে এসেছি সে প্রশ্ন করেনি তবে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এমন কোনো সিলেটি মুসলমান আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি কোন্ জাহাজে এসেছেন?" আমি বলেছিলাম তিনজন লোক আমাকে সেরূপ প্রশ্ন করেছে তবে তাদের নাম জানি না। সেদিনই এই তিনজন লোকে আমাকে তাদের আড্ডায় নিয়ে যায়। আড্ডাটি একটি অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিত। নিউইয়র্ক-এর মত স্থান, যথায় কেউ পথ ভুল করে না, তথায়ও তাদের আড্ডায় যাবার সময় আমার পথ ভুল হয়েছিল। আমরা গিয়েছিলাম টেক্সিতে। কখন যে কোন্ পথ ধরে কোথায় গেলাম তার কিছুই বুঝলাম না। যখন আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম তখন সে স্থানে কয়েকজন লোককে আরবি ধরনে বসে কাফি খেতে দেখলাম। আমি যাবামাত্র তিনজনই এক সংগে উঠে আমাকে সম্বর্ধনা করলেন। আমি একখানা মাদুরের ওপর বসলাম। এক পেয়ালা কাফি আমাকে খেতে দেওয়া হল এবং একজন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমার পরিচয় পেয়ে অন্য একজন একটা দেরাজ খুলে আমার প্রেরিত চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা আমারই চিঠি কি না? আমার

হাতের লেখা চিঠি তৎক্ষণাৎ চিনলাম এবং বললাম, "মহাশয়গণ আশা করেছিলাম আপনারা জাহাজে যাবেন এবং জাহাজ হতে নামতে সাহায্য করবেন কিন্তু সেদিন আপনারা আমাকে মোটেই সাহায্য করেন নি।" উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের মাঝে যার বয়স একটু বেশি বলেই মনে হল, তিনি বললেন, "আমরা ভেবেছিলাম আপনি জাহাজ হতে পালাতে চান এবং সে বিষয়ে আমাদের সাহায্য চান। যদি জানতাম আপনি পেসেন্‌জার হয়ে আস্‌ছেন তবে কমের পক্ষে হাজার লোক গিয়ে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাতাম। আমরা আপনাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারিনি বলে বড়ই দুঃখিত এবং যাতে আপনি উপযুক্ত সম্মান পান তার ব্যবস্থা করা হবে।" তারপরই শুরু হল অন্য কথা। সে কথার সংগে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না সেজন্য আমি মুখ ফিরিয়ে বসে কাফি খাচ্ছিলাম।

আমার সংগে এদের আর বিশেষ কোন কথা হল না। সেদিনের মত বিদায় নিয়ে আমি চলে এসেছিলাম এবং এদের কথা একরূপ ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন একজন লোক এসে আমাকে জানাল যে সিলেটি মুসলমানদের মাঝে একটি সভা হবে এবং সেই সভায় আমার ভ্রমণকাহিনী বলতে হবে। নির্ধারিত দিনে সভাতে উপস্থিত হবার পর একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সভায় এমন কেহ কি আছে যে জিজ্ঞাসা করেছে আপনি কোন্ জাহাজে এসেছেন?" যে কয়জন লোক আমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিল তাদের দেখিয়ে দিলাম। এই কাজটি করার পরই আমাকে সে রুম হতে বের করে দিয়ে অন্য রুমে বসতে দেওয়া হল। বের হয়ে যাবার পূর্বে শুধু শুনেছিলাম "ধরে ফেল"। সিলেটি কথায় ধরে ফেল কথাটাকে বলা হয় "ধইরা ফালাও"। কোনও জীব হত্যার সময় এরূপ কথার ব্যবহার হয়ে থাকে।

চিন্তিত মনে আমি আমার মেসে এসে শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। সেদিন বিকালবেলা কারো সংগে সাক্ষাৎ করিনি। যাতে করে কোনও হিন্দুর সংগে দেখা না হয় সেজন্য বলুওয়ার্ড নামক স্থানে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করে একটি রুশ দেশীয় ফিলম্ দেখে রুমে ফিরে আসি।

পরে এই ঘটনা সম্পর্কে নানা গল্প শুনেছিলাম। কোনও একটি লোক নাকি একেবারে উধাও হয়েছিল আর একটি লোক নাকি গুরুতর আঘাতে অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিল। এখন কথা হল এমন হয় কেন?

নবপরিচিত বাংগালীর সংগে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। খাবারের উত্তম ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন বিদেশে থাকার জন্য হাতে ভাত খেতে মোটেই ভাল লাগত না। তাদের ঘরেও কাঁটা চামচ থাকত। তারা যখন আমার এক সংগে খেত, কখনও তাদের হাতে ভাত খেতে দেখিনি। আমার ধারণা ছিল, কাঁটা চামুচ দিয়ে এরা শুধু আমারই সামনে খায়, অন্যথায় দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারই করে। এরা সাত তলাতে থাকত। তাদের খাবারে ঘরের খিড়কী দরজা যখন খোলা থাকত, তখন ষ্ট্রীটের বিপরীত দিকের মুখোমুখী বাড়ির লোক এদের খাবার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে বেশ ভাল করেই দেখতে পেত। সেজন্য খিড়কী দরজার পরদা প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকত। একদিন আমি খিড়কী দরজার পর্দা সরিয়ে দিয়ে হাত দিয়েই ডাল ভাত খেতে লাগলাম। তখন অন্যান্য লোক বসার ঘরে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ একজন এসে যখন দেখল আমি খিড়কী দরজা খুলে হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছি, তখন সে চটপট করে খিড়কী দরজার পর্দা নামিয়ে দিয়ে আমার দিকে রক্ত চক্ষু করে বলল আমরা ভাবতাম আপনি অনেকগুলি দেশ দেখে একটু সভ্য হয়েছেন, কিন্তু এখন দেখছি আপনার কিছুই পরিবর্তন

হয়নি। সভ্যই হউন আর না হউন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমাদের এই সমাজে থাকতে হয়, অতএব এই সমাজের নিয়ম মেনে চলাই হ'ল এক মাত্র কাম্য। আমরা স্বদেশে যেতে চাই না। মজুরের স্বদেশ বলতে কিছুই নাই। যেখানে মজুর পেট ভরে খেতে পায়, থাকবার উত্তম স্থান পায় এবং মজুরের মজুরীর সংগে উপযুক্ত সম্বল পায় সে স্থানই হ'ল মজুরের স্বদেশ। আমরা যদিও নাগরিক হইনি, একদিন নাগরিক হব এই আশা করেই এখানে আছি।" আমি লোকটির কথায় মোটেই জবাব দিলাম না, কারণ এটা হ'ল আমার ইচ্ছাকৃত কাজ। খাবার খেয়ে বসবার ঘরে গিয়ে দেখলাম সকলেই মাথা নত করে রয়েছে। আমি এদের এই দুরবস্থা দেখে নিজের দোষ স্বীকার করলাম এবং তাদের বললাম, "আপনারা যে এতটুকু উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ।"

আর একটি লোক দুঃখ করে বলল, "অনেকে স্বদেশ স্বদেশ বলে চিৎকার করে, কিন্তু যারাই দেশে গিয়েছে তারাই বুঝতে পেরেছে স্বদেশের মানে কি? কলিম উল্লার ছেলে ছলিমের দেশে যাবার পর সে জ্ঞান বেশ হয়েছে। ছলিমের সমাজে একটুও সম্মান ছিল না। দেশে ফিরে যাবার পর তাকে কেউ সম্মান ত দেয়ই নি উপরন্তু হিংসার বশবর্তী হয়ে তার যথাসর্বস্ব অপহরণ করেছে। আমরা আর দেশে যেতে চাই না। এদেশেই যাতে আমরা সুখে থাকতে পারি, তারজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এতে যদি আপনাদের মত নবাগত এসে বাদ সাধে, তবে আমরা তা নীরবে সহ্য করব না। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আমাদের দেশের কতকগুলি মোকদ্দমা-প্রিয় লোক এদেশে এসেও পূর্বের অভ্যাসমত এখানেও অনর্থক মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করেছিল। তারা এত দূরে এসেও এত নিকৃষ্ট কাজে অগ্রসর হওয়াতে

অনেকেরই দৃষ্টি তাদের উপর পড়ল। অনেকে তাদের ভাল উপদেশ দিল, কেউ বা ভয়ও দেখাল। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হ'ল না তখন উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে এখন তারা সে কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করেছে। আপনিও যদি পুনরায় হাতে খান তবে আপনার প্রতিও সেরূপ কোন ব্যবস্থা হতে পারে।"

বৃটিশ কলোনীতে উৎশৃংখল ভাবে চলাকেই ডিমক্রেসী বলে। উৎশৃংখলতার প্রশ্রয় সর্বত্র দেওয়া চলে না। ভারতে যেমন করে ধর্মের নামে উৎশৃংখলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে অন্যত্র তেমন কোথাও দেওয়া, হয় না। প্রথম প্রথম যারা আমেরিকাতে গিয়েছিল তারা পাজামা পরে লম্বা সার্ট গায়ে দিয়ে পথে যেত। শ্রীহট্টের লোক জাল বুনে নদী নালা হতে মাছ ধরত। শিখরা পাগড়ী বেঁধে থিয়েটারে যেত। এসব অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবার জন্য সর্বসাধারণ যখন নিষেধ করত, তখন সেই পুরাতন ধর্মপ্রীতি এবং বর্বরোচিত স্বদেশপ্রেম জেগে উঠত। ফলে ভারতবাসীকে আমেরিকানরা নাগরীকত্ব আর দিল না। যাদের দিয়েছিল তাও কেড়ে নিল। কোনও অন্যায় কাজ করে তাকে স্বদেশীকতার আবরণ দিয়ে, সেই অন্যায়কে চালাবার চেষ্টাকেই বর্বরোচিত স্বদেশপ্রেম বলে। এরূপ হীন কাজ যাতে আর না হয় সেজন্য অনেকগুলি ভারতবাসী আপ্রাণ চেষ্টা করছে দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম।

"আমি মোকদ্দমা করব, আমি পাজামা পরব, আমি পাগড়ী বাঁধব তাতে তোমার কি? যদি কোন অনিষ্ট হয় তবে আমার হবে।" এই রকমের কথা যারা বলে এবং এরকমের কথা যারা মেনে চলে তারা সমাজে বাস করার উপযুক্ত নয়। যে কয়জন ভারতবাসী এরকমের কথা বলে নিজের মতকে সমর্থন করেছিলেন; শুনেছি তাদের উপযুক্ত

শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। যারা শাস্তি পেয়েছিল তাদের অনেকে নাকি "ডিস্‌এপিয়ার" হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতদিন আমেরিকায় থাকব ততদিন হাতে খাব না, কাঁটা চামচ ব্যবহার করব, নতুবা "ডিস্‌এপিয়ার" হতে হবে।

আমেরিকাতে যাবার পর হিন্দুরা এক নতুন জীবন লাভ করে। সেই নতুন জীবনে তারা যা পায় তারা আটকে রাখতে চায়। তাই তারা টাকা পায় না, তারা সম্মান পায় না, তারা পায় সুখ এবং সুবিধা। একখানা ফারনিস্ট ফ্ল্যাটে তারা পায় চারটি রুম। একখানা বসবার ঘর—যাতে থাকে একটা লম্বা ভেলভেট দিয়ে মোড়া বেন্‌চ, যাতে বসলে কোমরের অর্ধেকটা ডেবে যায় এবং স্প্রিংএর বেশ সুন্দর একটা ঝাঁকানি লাকে। এতে ইচ্ছা করলে শুয়েও থাকা যায়। তারপর আরও কিছু থাকে, যেমন দুখানা টেবিল, দুখানা আরাম চেয়ার, চারখানা বসবার চেয়ার ইত্যাদি। শোবার রুমে থাকে এমন একখানা বিছানা যা ভারতবাসী অনেক সময় সেই বিছানার কথা কল্পনাও করতে পারে না। কাছেই বাথরুম। সে রুমে থাকে গরম এবং ঠাণ্ডা জলের নল—টবে সে জল নিয়ে যত ইচ্ছা তত স্নান কর। রান্না ঘরে বাসন এবং গামছা দেওয়াই থাক, গ্যাসের উনুন থাকে, হাত ধুইবার জন্য গরম এবং ঠাণ্ডা জলের পাইপ থাকে। এরূপ আরামদায়ক রুম তার সাপ্তাহিক ভাড়া মাত্র আট ডলার। যে সকল দরিদ্র মজুর কুঁড়ে ঘরে বাস করেছে, চৌকীদার হতে আরম্ভ করে যার তার কাছে সকাল হতে ঘুমানো পর্যন্ত অপমানিত হয়েছে, সেই লোকরাই আমেরিকায় গিয়ে ইংলিশ শিখে জগতের সংবাদ রাখবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাকে যদি তুমি পন্‌চাশ ডলার পাবার বদলে ভারতে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর তবে সে প্রতিহিংসা নিবে না কেন? এই করে আমেরিকায় হিন্দু হিন্দুর রক্তে প্রায়ই হাত কলংকিত করছে।

আমি অপরের কথিত সুসমাচার আমার বই-এ লিপিবদ্ধ করব না, আমি নিজে যা দেখেছি এবং আমার নিজের জীবনের উপর দিয়ে যা ঘটে গেছে তারই কথা শুধু বলব। অনেকে হয়ত বলবেন, এযে আত্মজীবনী হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমেরিকার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে চাই। ভ্রমণ-কাহিনীতে নিজের ভ্রমণ কথা ছাড়া আরও কিছুই থাকে না। আমার দৃষ্টিতে যা আসবে তাই আমি পাঠক সমাজকে ভাষার সাহায্যে বলতে চেষ্টা করব। এর বেশী বলতে গেলেই আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। অনধিরকার চর্চায় কুফল যেমন হয় তেমনটি অন্য কিছুতে হয় না।

সান্‌ফ্রানসিস্‌কো যাবার পর আমি ঔপন্যাসিক ধরনে স্থানীয় তথ্য যোগাড় করতে লাগলাম। আমি ভেবেছিলাম এই অজ্ঞাত স্থানে কে আমার শত্রুতা করবে! একটি ব্যাংকে আমার টাকাগুলি জমা রেখে দিয়েছিলাম। টাকা আনবার জন্য প্রায়ই আমাকে ব্যাংকে যেতে হত। একদিন টাকা নিয়ে বের হয়েছি এমনি সময় দেখলাম একজন পান্‌জাবী আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমার তাতে চিন্তা করার কি আছে? তবে এই মাত্র ভেবেছিলাম লোকটি আমার স্বদেশবাসী পান্‌জাবী—শীতের দেশে অনেকদিন বাস বরে তার শরীরের রং বদলে গেছে এবং দেখতে অনেকটা গৃক অথবা ইটালীয়ানদের মতই হয়ে গেছে। এরপর আমি এনৃত্রপলজির কথা নিজেই চিন্তা করছিলাম।

কয়েকদিন পরই একটি আমেরিকান যুবকের সংগে আমার পরিচয় হয়। যুবকটি অলস এবং বেকার। এরূপ ভেগাবণ্ড আমেরিকায় প্রায়ই দেখা যায়। এরা কোন কাজই করতে রাজি নয়। যুবকটী আমার কাছ হতে সামান্য সাহায্য চেয়েছিল, আমি তাকে তার আশার অতিরিক্ত কিছু দেওয়ায় সে প্রায়ই আমার রুমে আসৃত এবং কালিফরনিয়ার হিন্দুদের

কথা বলত। সে এমন কিছু বলত না যাতে আমি ওদের জীবনযাত্রার কিছু বিশষত্ব অনুভব করতে পারি। সে শুধু বলত হিন্দুরা বড়ই কৃপণ, তাদের পকেটে একটি ডলার যদি একবার প্রবেশ করে তা আর বের হয় না। হিন্দুরা অতি অল্প খাদ্য খেয়ে সন্তুষ্ট থাকে। তার সেই কথাটির সত্যতা আমিও অনুভব করেছিলাম। একটি লোকের নিদরল্যাণ্ড ব্যাংকে পন্চাশ হাজার ডলার জমা ছিল, সেই লোকটির ঘরে গিয়ে দেখি যে সামান্য কয়টি মূলা পাতা সিদ্ধ করে তারই সাহায্যে চপাতি খাচ্ছে। এরূপ কৃপণের পন্চাশ হাজার ডলার আমেরিকাতে থেকে জমানো কষ্টকর কাজ নয়।

একদিন সেই যুবকটির সংগে আমি একটি সিনেমা দেখতে যাই। রাত বারটার সময় সিনেমা ঘর হতে বের হয়ে সে মারকেট স্ট্রীটের দিকে রওয়ানা হয়েছিল আর আমি হাওয়ার্ড স্ট্রীট ধরে থার্ড স্ট্রীটের দিকে চলছিলাম। পথে দোকানগুলিতে কি কি জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার দৃশ্য দেখে চলছিলাম। একটি সিনেমা ঘর পার হয়ে দুখানা দোকানের সামনে যে বাতি ছিল তা অতীব অনুজ্জ্বল এবং সেই অনুজ্জ্বল আলোয় সাজানো জিনিসগুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি যখন মন দিয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম তখন হঠাৎ আমার পেছন দিক হতে একটা লোক পিস্তলের অগ্রভাগ দিয়ে আমাকে একটা খোঁচা মারে। আমি তৎক্ষণাৎ তার দিকে ফিরেই দেখলাম লোকটি আমেরিকান এবং আমাকে হত্যা করার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে লোকটিকে বল্‌লাম "বস্‌ গিভ্‌ মি এ বাট্‌" অর্থাৎ হে প্রভু দয়া করে আমাকে আপনার হাতের অর্ধদগ্ধ ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেট টুকরাটি দিয়ে বাধিত করুন। আমার কথা শুনে লোকটি আমার দিকে একটু চেয়ে দেখল তারপর আমার হাঁটুতে এবং উরুতে কয়েকটি পদাঘাত করে তার

হাতের সিগারেটটি আমার হাতে দিয়ে বলল "গেট্ আউট্ ইউ ডেম্ নিগার, ইউ আর সেইভড্" অর্থাৎ অসভ্য নিগ্রো এখান হতে চলে যা, তুই আজ বেঁচে গেলি। আমি ক্ষণকাল বিলম্ব না করে নিকটস্থ একটি রেস্তোঁরাতে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং নিগ্রো প্রথায় এক পেয়ালা কাফি চাইলাম। দোকানী আমাকে এক পেয়ালা কাফি দিল এবং তাই হাতে করে নিয়ে ফুট-পাথের উপর বসে টুপিটা আরও একটু টেনে দিয়ে কাফি খেতে লাগলাম। যখন আমি কাফি খাচ্ছিলাম তখন সেই পিস্তলধারী লোকটি আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে দেখিয়ে বলছিল আজ এই গাধাটা বেঁচে গেল এবং আর একটা লাথি আমার পিঠে লাগিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি কান পেতে শুনছিলাম লোকটি বলছিল শয়তান হিন্দুটা গেল কোথায় ? একে পাওয়া মাত্র হত্যা করতে হবে।

কাফি খেয়ে, কাপটি ফেরত দিয়ে, নিগ্রো প্রথা মতে হেঁটে রুমে গিয়ে হাত পা ছেড়ে বিছানাতে শুয়ে পড়লাম। পদাঘাতের অবমাননা, প্রাণের ভয়, এসব নানা চিন্তা মনকে অস্থির করে তুলেছিল। আমরা বলি জীবন তুচ্ছ, কিন্তু আমার কাছে আজ মনে হতে লাগল জীবন অমূল্য সম্পদ্। প্রতিহিংসা কার উপরে আদায় করব ? কেন আমাকে হত্যা করা হবে ? এসব চিন্তা একটার পর একটা এসে আমাকে চিন্তিত করে ফেলছিল। ইচ্ছা হয়েছিল বার থেকে ওয়াইন এনে খেয়ে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হই। কিন্তু ভয় হল পাছে কেউ এসে গুলী করে। নানা চিন্তায় রাত কাটতে লাগল। সকাল হল। আমি হাতমুখ ধুয়ে বাড়িওয়ালীর ঘরে গেলাম। বাড়িওয়ালী আমার গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝলেন আমার কিছু বিপদ হয়েছে। আমাকে তিনি সকল কথা খুলে বলতে বললেন। আমিও যা ঘটেছিল তা তাকে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে একটু চিন্তা করেই টেলিফোন হাতে নিয়ে জনৈক হিন্দুকে ডাকলেন

এবং জবাবও পেলেন। তাদের মাঝে যা কথা হয়েছিল তা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাদের কথার অবিকল নকল দেওয়া গেল।

"আপনি কোথা হতে কথা বলছেন ?"

"এখন আমার কোন নম্বর দিব না।"

"তবে বিশ্বাসঘাতকটা আপনার ওখানেই থাকে ?"

"বিশ্বাসঘাতক বলবেন না, লোকটি ভূপর্যটক, তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হব। তাঁর সংগে সাইকেল আছে, সংবাদপত্রের কাটিং আছে, তিনখানা পাসপোর্ট আছে, যদি আদেশ করেন তবে এসব নিয়ে আমি আসতে পারি।"

"আপনার কি মনে হয় লোকটা ঠিক ঠিকই নির্দোষ ?"

"যদি নির্দোষ না হত তবে আমি এরূপ কথা কখনও বলতাম না।"

"আপনি সাইকেল ছাড়া আর সব দলিল নিয়ে আসবেন।"

"তাই হবে।"

আমি আর ঘর হতে বের হলাম না, বাড়িওয়ালী আমার কাগজপত্র নিয়ে গন্তব্য স্থানে গেলেন এবং আমার কাগজ দেখালেন। আমার কাগজপত্র দেখার পরই বোধহয় তাদের সন্দেহ দূর হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে ফোনে ডাকা হয়। ফোনে যে সকল কথা হয়েছিল তারও অবিকল নকল দিলাম।

"ক্ষমা করবেন মহাশয়, আমরা ভেবেছিলাম আপনি ইমিগ্রেসন বিভাগে কাজ করেন। সাইকেল নিয়ে বের হন না কেন ?"

"স্যানফ্রানসিস্‌কো ভয়ানক উঁচু নীচু শহর, এখানে পায়ে হাঁটতেই পছন্দ করি।"

"আপনি আজ বিকালে সাইকেলে মারকেট স্ট্রীটে বেড়াবেন আমরা

দেখব আপনি ভিড়ের মাঝে কেমন সাইকেল চালাতে পারেন। আর একটা কথা, আপনি টমাস্ কুক্ ব্যাংকে এবং মারকেট স্ট্রীটের শেষ সীমার বইএর দোকানে রোজ যান কেন ?"

"টমাস্ কুক্ ব্যাংকে আমি টাকা রেখেছি। রোজ যে টাকা দরকার হয় তাই নিয়ে আসি, আর মারকেট স্ট্রীটের শেষ ভাগে ফেরি বোটের কাছে যে দোকানে আমি যাই তথায় বৈদেশিক দৈনিক সংবাদপত্র পাওয়া যায়, তথায় গিয়ে বৈদেশিক দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করি।"

"তাই বুঝি ?"

"হাঁ।"

"নমস্কার।"

বাড়িওয়ালী ঘরে এসে আমার রুমে আসলেন এবং হাঁপাতে লাগলেন। একটু শান্ত হয়ে তিনি আমাকে বললেন, "কাল আপনার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। আপনি নিগ্রোদের চালচলন এবং কথা বলার কায়দা বেশ শিখেছেন বলেই রক্ষা পেয়েছেন। যাক আজ বিকালেই আপনি সাইকেলে মারকেট স্ট্রীটে যান এবং বেশ করে বেড়িয়ে আসুন। এদের এখনও সন্দেহ রয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে একজন লোক আপনাকে একটা দলিল দেখিয়েছিল এবং বলেছিল আপনি আপনার জানামত একজন উকিলের বাড়িতে তাকে নিয়ে যেতে, আপনি তাতে রাজি হননি, এতেই তাদের সন্দেহের কারণ আরও বেড়ে যায়। এখন আপনি নিরানব্বই পারসেণ্ট নিরাপদ। বিকালে যদি সাইকেলে করে মারকেট স্ট্রীটে বেড়িয়ে আসতে পারেন তবে আর ভয় নাই।

আমেরিকার রাজপথে কেউ সাইকেল ব্যবহার করে না। অ্যাক্‌সি-ডেণ্ট হবার বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে এই ভয়ে

আমি সাইকেল উঠিয়ে রাখিনি, আমার সাইকেল চালাতে কষ্ট হত তাই সাইকেল উঠিয়ে রেখেছিলাম।

বিকাল বেলা থার্ড স্ট্রীট থেকে বের হয়ে হাওয়ার্ড স্ট্রীট দিয়ে মারকেট স্ট্রীটে পৌঁছে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। বেড়াবার সময় দু' একজন হিন্দু আমার সামনে এসে পড়েছিল এবং এমনি ভাবে দাঁড়িয়েছিল যাতে আমাকে সাইকেল থামাতে হয় কিন্তু সাইকেল চালাতে আমি বেশ পারদর্শী হয়েছিলাম। কখনও বেল বাজাতাম না। ধীরে সাইকেল চালিয়ে আমি লোকের পেছন চলতে সক্ষম হতাম। হিন্দুরা বুঝেছিল আমি প্রকৃতই একজন বাইসাইকেলী ভূপর্য্যটক। পরদিন আবার ফোনে কথা হয়েছিল। আশ্বাস পেয়েছিলাম আমি এখন মুক্ত। কেউ আমাকে আর হত্যা করতে চেষ্টা করবে না। যদিও আমি মুক্ত হয়েছিলাম কিন্তু সেই পদাঘাতের কথা এখনও মনে আছে। তারপর মনে আছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে ভারতবাসী বিদেশে গিয়েও সাজানো সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আরও দুঃখ হয় আমাদের নিকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি দেখে, এর বেশি এখানে ভারতবাসীর সম্বন্ধে বলার কিছুই নাই।

জ্যারনেলিষ্ট শব্দের অর্থ আমাদের দেশে "সংবাদপত্রসেবী" বলেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও জ্যারনেলিষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা আমাদের মত করে না। মজুরী শব্দের অর্থ ভাল করে অবগত হলেই এসব বাজে শব্দের ব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি এখন জ্যারনেলিষ্ট শব্দই এখানে ব্যবহার করব। "সংবাদপত্রসেবী" শব্দ ব্যবহার করার সময় এ পৃথিবীতে কখন আসবে তা জানি না। যখন লোক ঠিক ঠিক ভাবে সংবাদ পত্রের সেবা করবে তখন "কর্তা ইচ্ছা কর্ম" হবে না। সাহিত্যিক মজুরগণ তখন স্বাধীনভাবে আপন

আপন মনের কথা বলতে সক্ষম হবে। আমাদের দেশে হালে পূজিবাদ গঠন হতে আরম্ভ হয়েছে। পূজিবাদীরা সাহিত্যিক মজুর প্রচুরভাবে খাটাতেও আরম্ভ করেছে। আমাদের দেশে এমন কোন সাহিত্যিক মজুর নাই যিনি পূজিবাদীর কাছে তার মজুরী বিক্রয় করার সময় ইচ্ছামত কলম চালাতে সক্ষম হন। তাকে পুঁজিবাদীর মনমত চলতে হয়! আমেরিকা পুরাতন পুঁজিবাদী, ইংলণ্ড তারচেয়েও পুরাতন, অতএব তারা ভাল করেই জানত এবং এখনও ভাল করেই জানে কি করে সাহিত্যিক মজুরদের খাটাতে হয়।

পুরাতন সাহিত্য ঘাটা আমার অভ্যাস নেই। নিউইয়র্কে যতগুলি প্রগতিশীল লোকের সংগে আমার দেখা হয়েছিল, প্রায়ই দেখতাম তারা পুরাতন সাহিত্য নিয়ে বেশ ঘাটাঘাটি করে। জ্যন পেটারসন নামে একটি লোক একদিন আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায় এবং আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা লোকের অনেক বই দেখায়। তাতে দেখতে পেলাম একটি সুন্দর প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধটিতে যা লেখা হয়েছে তার সারমর্ম চুম্বকে দিলাম।

"হিন্দুরা কালীমাতার পূজা করে। তারা যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে কোন গোপনীয় পরামর্শ করে তখনও কালীমাতার পূজা করেই কর্মস্থলে যায়। যদি কোনও বৃহৎ হত্যাকাজে কৃতকার্য হয় তবে তারা কালীমাতার মূর্তির সামনে নরবলি দেয়।" প্রবন্ধটা বেশ মন দিয়ে পড়েছিলাম বলেই অনেক দিন মনে রয়েছিল। এই প্রবন্ধ মাদার ইণ্ডিয়া নামক বইখানা প্রকাশিত হবার পূর্বেই প্রকাশ হয়েছিল। যিনি "সংবাদপত্রের সেবা" করেছিলেন তার পেট বোধ হয় বেশ মোটা ছিল, নতুবা আমেরিকার গদর পার্টিকে হেয় করার জন্য এত বড় প্রবন্ধ তিনি লেখতেন না। সুখের বিষয় আমেরিকাতে যারা জারনেলিজম্

করে তারা সংবাদপত্রের সেবা না করে নিজের সেবার দিকেই বেশ দৃষ্টি রাখে।

ভারতবাসীকে অপদস্থ করার জন্য দেশে এবং বিদেশে সর্বত্র সমান-ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রকারের অপদস্থতা হতে রক্ষা পাবার জন্য যদি কেহ কেহ চেষ্টা করে তবে তা মোটেই দোষের নয়।

নিউ ইয়র্কের ব্রেড লাইন

ইনউইয়র্ক-এর ব্রেড লাইন দেখবার বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল, তাই একদিন বাইশ নম্বর স্ট্রীটের একটি বাড়িতে ব্রেড লাইন দেখতে গিয়েছিলাম। বাড়িটাতে কত লোক থাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কেউ সে প্রশ্নের জবাব দিল না। আমি ভারতীয় পর্যটক, হাতে পেন্সিল এবং খাতা দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল। নোট লিখতাম নিজের ভাষায়। তাই আমার লিখবার ধরনটি দেখবার জন্যে চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কারুর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেলেও আন্দাজে ধরে নিলাম, ছয় শ লোক বাড়িটাতে বাস করে। এদের খাদ্য এবং থাকবার ঘর দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। তার একমাত্র কারণ হল হাতের পেন্সিল এবং খাতা। কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসলাম। দুদিন পর খাতা পেন্সিল না নিয়ে, টুপিটা বেশ করে মাথায় চাপিয়ে আমেরিকান্ ধরনে কথা বলে কয়েকটা লোকের সংগে বন্ধুত্ব করে

নিলাম। তারা বুঝল আমি নিগ্রো। কুকুর বিড়ালকে দেখে আমরা যেমন ভয় পাই না অথবা কোন অন্যায় কাজ করতে যেমন করে লজ্জা অনুভব করি না তেমনি শ্বেতকায়দের নিগ্রোকে লজ্জা করবার কিছুই নাই, নিগ্রো সেজে আমার প্রশ্নগুলির জবাব পেতে মোটেই কষ্ট হল না।

বাড়িটাতে প্রবেশ করে বেশ করে টহল দিলাম। একটি লোক কাফি খাচ্ছিল। তার কাপ হতে একটু কাফি চেয়ে খেলাম, দেখলাম তাতে দুধ এবং চিনি খুবই কম দেওয়া হয়েছে। বেকার মজুরদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তা মোটেই ভাল নয়। লোহার খাটগুলি জেলের কয়দীরা যে খাটে শোয় তার চেয়ে খারাপ। অবশ্য মনে রাখতে হবে আমেরিকার কয়েদীদের যেরূপ খাটে শুতে দেওয়া হয় তা আমাদের দেশের প্রায় মধ্যবিত্তের ঘরেই নাই। রেষ্ট রুমগুলি যেভাবে অপরিষ্কার করে রাখা হয়েছে তা আমেরিকার সভ্যতার একটি খারাপ দৃষ্টান্ত। এসব যখন দেখছিলাম তখন মনে হয়েছিল ইম্‌পিরিয়েল প্যালেস, ওয়াল্‌স স্ট্রীট, পন্‌চম অ্যাভেনিউ এবং বুলওয়ার্ড এসব ধনীদের আরামের বস্তু।

একদিকে ধনীদের উদ্দাম ভোগবিলাস আর অন্যদিকে যে সকল লোক তাদের সারা জীবনের সমস্ত শক্তি সমাজের হিতের জন্য ক্ষয় করেছে তাদের হাহাকার! হাহাকারই বলব, কারণ আমেরিকাতে অর্থহীন হয়ে পরের উপর নির্ভর করে বাঁচাটা আমেরিকানদের পক্ষে হাহাকার ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমেরিকার লোকের দারিদ্র্য নানা কারণে এসে দেখা দিয়েছে। যখন একটা জাত সাম্রাজ্যবাদী হতে চলে তখন নিজের ঘরের খবর তাদের রাখবার ফুরসত হয় না। সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবে জাতীয় ভাবের মোহে ফেলে জাতকে ভুলিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। অনেক ক্ষেত্রে তারা এতে কৃতকার্যও হয়। আমাকে যারা নিউইয়র্কে পথ দেখাতেন, লেকচারের

বন্দোবস্ত করে দিতেন তারাও অনেকে ব্রেড লাইনের সঠিক খবর রাখতেন না। আমি অনেক বেকার বৃদ্ধ মজুরদের সংগে কথা বলেছি। তারা আমাকে বলেছে তাদের অতীত জীবনের কথা। সেই কথা যখন আমি শুনতাম তখন বড়ই মর্মবেদনা পেতাম। একজন বিল্ডার (রাজমিস্ত্রি) বললেন, তিনি সারা জীবন বড় বড় বিল্ডিং তৈরী করেছেন, এমনকি সেদিনও যখন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ইম্পিরিয়েল বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল তাতেও তিনি কাজ করেছেন। আজ তিনি কর্মে অক্ষম তাই তাঁকে ব্রেড লাইনে দাঁড়িয়ে শেষের দিনের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমেরিকাতে যারা প্রগতিশীল মত ও পথ বেছে নিয়েছে তারা কিন্তু এরূপ ব্রেড লাইনের পক্ষপাতী নয়, তারা বৃদ্ধ বয়সের পেনসনের পক্ষপাতী। নিউইয়র্ক ষ্টেটে বৃদ্ধ বয়সের যে পেনসন দেওয়া হয়, তা শুধু ব্রেড লাইনে থেকেই পাওয়া যায়।

সমাজের কাজে এসব মজুরের কোনো দান আছে কি না তা কেউ বুঝতে চায় না কারণ এসব মজুরের কাজের কোন তালিকা রাখা হয় নি। এজন্যই এরা বৃদ্ধ বয়সের পেনসন পাচ্ছে না। অথচ আমেরিকার ধনীরা যখন গমের দাম ঠিক ঠিক মত পায় না, তখন তারা গম পুড়িয়ে ফেলে। চিনি নষ্ট করে দেয়। বাগানের ফল বাগানে পঁচে। এরকম মজার দেশ আর কোথায় আছে? অথচ এরাই সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধাচরণ করে বেশি।

আমি জানি না, কোন ভারতীয় পর্যটক আজ পর্যন্ত ফাদার হাফ্কিনের নাম এদেশে এসে বলেছেন কি না। আমি কিন্তু সে নামটি একদম মুখস্থ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তার নাম শুনলে আমার আতংক হত এমনকি অনেকদিন তার নাম ভুলবারও চেষ্টা করেছিলাম। ফাদার হপ্‌কিন কর্মতালিকা যখন তার লোকজন প্রচার করত তখন তা আমি শুনতাম

আর ভাবতাম এই লোকটি আমেরিকাতে আরও অ্যাংকোল টমস্ কেবিনের সৃষ্টি করতে চায়। ফাদার হাপ্‌কিন্ দেখতে চায় আমেরিকা হতে ইহুদী বিতারিত হউক, নিগ্রো নিপাত যাউক আর এদের যারা রক্ষা করতে চায় সেই প্রগতিশীল ভাবাপন্ন লোকদের শূলে চড়ান হউক। লোকটা সোসিয়েলিজমকে সাপের মত ভয় করে।

এরই মাঝে ফাদার হাপ্‌কিনের প্রচারের সুফল দেখা দিতে শুরু হয়েছে। একদিন একটি নিলামের দোকানে গিয়েছিলাম। অবশ্য আমাকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম যিনি জিনিস নিলাম করছেন কতকগুলি লোক তাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। তিনি অনেকক্ষণ তা লক্ষ্য করে যখন দেখলেন তার জিনিস মোটেই বিক্রি হচ্ছে না তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, "ভদ্রলোকগণ, আপনারা ভাবলেন না যে আমি একজন ইহুদী, আমি আপনাদের ব্যবহার নীরবে সহ্য করে যাব। মনে রাখবেন আমিও আপনাদের মতই একজন।" আশ্চর্যের বিষয় একথা বলার পরই ক্রেতারা নির্বিবাদে জিনিস কিনতে মন দিয়েছিল। দরিদ্র এবং ধনী ইহুদীদের প্রতি খৃষ্টানদের যেন একটা আক্রোশ রয়েছে। অথচ ইহুদীদের মত অন্য যে সকল খৃষ্টান খৃষ্টানদেরই রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না।

আমেরিকাতে যে সকল লোক প্রগতিশীল ভাবধারা মেনে চলতে চান তাঁরা বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। তাঁরা নিগ্রোদেরও শ্বেতকায়দের মত অধিকার দিতে চান; যারা কাজ না পেয়ে শুকিয়ে মরছে তাদের যাতে অন্নের ব্যবস্থা হয় তাঁরা তাও চান। এঁদের মাঝে আর অনেক মত আছে তবে সেই মতবাদ জানবার জন্য আমি মোটেই মনোনিবেশ করিনি। তাঁরা অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল মতবাদীদের চেয়ে যদিও অনেক নিরীহ তবুও স্থির প্রতিজ্ঞ।

এসব প্রগতিশীল ভাবুকদের স্থানীয় লোক কমিউনিষ্ট বলে। আমেরিকায় কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী। যদি কোনমতে আমেরিকা সরকার কাউকে কমিউনিষ্ট বলে প্রমাণ করতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে কাজ করবার অধিকারের কার্ড কেড়ে নেন। যারা কাজ করবার অধিকারের কার্ড হারিয়েছে তাদের প্রভাব ছাত্র সমাজে বড়ই প্রবল। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করার জন্য মোটা রকমের মাইনে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দায়ীত্ব জ্ঞানশীল যুবক যুবতীরা আগিয়ে আসে না। ছাত্র ফেডারেশন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, হুভার হও আর রুজভেল্ট হও তোমাদের সমর্থন আমরা করব না। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নতুন। পুরাতনকে আমরা আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পার না। আমরা কাজ করার অধিকার চাই। তোমাদের কাছে কাজ ভিক্ষা চাই না।

যখন ছাত্রছাত্রীরা অবৈতনিক সরকারী বিদ্যালয় হতে বের হয় তখন তারা দেখতে পায় তাদের সামনে এক বিরাট অন্ধকার। তারা তাদের মা বাবার উপরও নির্ভর করে থাকতে পারে না তাই যখন তারা কাজের খোঁজে বের হয় তখন কাজের খোঁজ পেতে অনেকের জুতার শুকতলী পর্যন্ত বেড়িয়ে আসে অথচ কাজ যোগাড় হয় না। আমেরিকায় যুবক-যুবতীদের জন্য ভাল মন্দ দুটি পথই খোলা আছে। অনেক ধনীলোক নতুন যুবক-যুবতীদের দিকে অনেক সময় বাঁকা নজরে তাকান এবং তাদের নরকের পথে পৌঁছে দেন তার দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে অনেক দেখেছি। যে সকল ছাত্র এবং ছাত্রী বর্তমানে ছাত্র ফেডারেশনে কাজ করে এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি চালায় তাদের অনেকের পূর্ব জীবন পাপে নিমজ্জিত ছিল। গ্রেইপস্ পিকার বইখানা তার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। যখন এই প্রকারের পথভ্রষ্ট ছাত্র এবং ছাত্রীরা প্লেটফর্ম'এ দাঁড়িয়ে তাদের আত্মজীবনী লোকের কাছে প্রকাশ্যে বলে তখন লজ্জা যাদের আছে

তারা একের মুখ অন্যে দেখতে সাহস করে না। কথাটা এখানে আর বেশি বাড়িয়ে বলার দরকার নাই। যদি এ সম্বন্ধে এর চেয়েও বেশি কিছু জানতে চান তবে স্যানফ্রানসিস্‌কো হতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'পিপুলস্‌ ওয়াল্ড' পাঠ করলেই জানতে পারবেন আমেরিকার বুকের উপর ধনীদের নির্মম অত্যাচার কাহিনী। কিন্তু এই শ্রেণীর কাগজ বিদেশে অতি কমই প্রেরিত হয়। প্রথম কারণ হ'ল যে সকল পর্যটক আমেরিকাতে বেড়াতে যায় তারা আশি পৃষ্ঠার সংবাদ পত্রই কেনে। চার পাতার সংবাদপত্র কিনে দশ সেণ্ট খরচ করতে কেউ রাজি নয়। দ্বিতীয় কারণ হ'ল বিদেশে গিয়ে, কে কি রকম পলিটিক্স করছে তার সংবাদ রাখতে চায় না। আরাম এবং আনন্দ নিয়েই সকলে ব্যস্ত। প্রগতিশীল লেখক এবং বিবেচক লোক আমেরিকাতে যেতে মোটেই পছন্দ করে না।

হার্‌লাম

মানহাটন দ্বীপের উত্তর-পশ্চিমাংশ হার্‌লাম নামে পরিচিত। এ স্থানের বাসিন্দা সবাই নিগ্রো। হারলামের বাড়ি-ঘর নিউইয়র্কএর অন্যান্য বাড়ি-ঘরের মতই। যদি নিগ্রোরা এ অন্‌চলে বাস না করত তবে এ স্থানটার এত বদনাম হত না। হারলামে দিনের বেলা আমেরিকানরা খুব কমই আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর হতেই এদিকে শ্বেতকায়দের আগমন শুরু হয়। লণ্ডন, সাংহাই, জিব্রাল্টার, নীস্‌ এবং আমার মনে হয় প্যারীও

রাতের বেলা হারলামের কাছে হার মানে। রাত্র যখন অধিক হয় তখন অন্যান্য স্থানের লোক হারলামের দিকে আসতে থাকে। তখন হারলাম হয় ভূস্বর্গ। সত্যই হারলাম ভূস্বর্গ। ভূস্বর্গে বসতি ক্রমে বেড়ে চলেছে। পূর্ব্বে ভূস্বর্গের সীমানা ছিল ১০৪ স্ট্রীট পর্যন্ত, বর্তমানে হয়েছে ১০৮ স্ট্রীট। ক্রমেই এর সীমা বাড়ছে দেখে ফাদার হাপকিনের মন কেঁপে উঠছে এবং ফাদার ডিভাইনএর আনন্দ বাড়ছে। উভয়েই খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক। উভয়েই ইহুদী এবং কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। অথচ উভয়ের মধ্যে মতের মিল নাই। ফাদার হাপকিন চান নিগ্রোদের নিপাত করে সাদা চামড়াদের একাধিপত্য বিস্তার করতে, শুধু আমেরিকায় নয় পৃথিবীর সর্বত্রই। ফাদার ডিভাইন কিন্তু সেরূপ কিছু চান না, তবে তিনি নিগ্রো নিপাত মোটেই পছন্দ করেন না।

ইটালি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করল তখন হারলামের নিগ্রোরা আবিসিয়ান্দের সাহায্য করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু করে উঠতে পারে নি। ফাদর হপ্‌কিন তখন সুর উঠিয়েছিলেন, আমেরিকার অর্থ যদি এমন করে বিদেশে চলে যায় তবে দেশের দুর্গতি হবে। 'অ্যাম্‌স্টারডম নিউজ' সেই হপ্‌কিনী যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য নানা যুক্তি দেখিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' তার প্রতিবাদ করে পাল্টা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সংবাদপত্রগুলি যতই বাগ্‌যুদ্ধে মাতোয়ারা হল, নিগ্রোরা ততই দুঃখিত হয়ে গির্জায় গির্জায় হাবসী সম্রাটের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। হাবসী সম্রাটকে সাহায্য করবার কথা ভুলে না গিয়ে পুরাদমে তারা অর্থ জমাতে লাগল। ফাদার হপকিন হঠাৎ একদিন ঘোষণা করে দিলেন, বর্বর সম্রাট হাইলে সেলাসিকে আমেরিকা কোনওরূপ সাহায্য করতে পারবে না। নিজের শক্তি দেখাবার জন্যে কতকগুলা ভাড়াটে গুণ্ডাকে তিনি গির্জায় গির্জায় পাঠিয়ে

দিলেন যাতে করে চাঁদা তোলা বন্ধ হয়ে যায়। ফল তার উলটা হল, দাংগা শুরু হল। শ্বেতকায়গণ হারলামে দোকান করে বেশ দু পয়সা উপার্জন করছিল, সেটি বন্ধ হল। দাংগার কথা সংবাদপত্রে এমন ঘটা করে বার হতে লাগল যে, লোক ইটালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে দাংগার কথা নিয়েই মেতে উঠল। আসল কথা, দাংগা হাংগামা তেমন কিছু হয় নি। আমেরিকার হপ্‌ক্লিনী কীর্তি আমি আফ্রিকাতে কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম। ইউরোপীয়ানরা ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করে ফেলে দিতেন না, পুড়িয়ে ফেলতেন যাতে করে নিগ্রোরা ইটালি-আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কোনও সংবাদ না পায়।

হারলামের এমন গির্জা নাই, এমন ক্লাব নাই, যেখানে আমি আমার আফ্রিকা-ভ্রমণের কথা না বলেছি। এই কারণেই অনেক নিগ্রো আমার সংস্পর্শে এসেছিল এবং আমাকে অন্তরের সংগে ভালবেসে তাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের সকল দিকই আমার কাছে খুলে ধরেছিল। আমি তা শুনে সুখী হতাম এবং প্রাণ খুলে তাদের সংগে কথা বলতাম।

আমেরিকা আজ নূতন রূপ নিয়েছে। দরিদ্র এবং ছাত্র সমাজ বুঝতে পেরেছে আর লীডার বানিয়ে দরকার নাই, ভোটাভুটিতে গিয়ে বেগার খেটে কাজ নাই ; কর্তৃত্বের মূলে যাঁরা আছেন, তাঁরা থাকেন ওআলস্ স্ট্রীটের উপরতলায় বসে। জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও ডিমক্র্যাসির দোহাই দিয়ে তাঁরা নিজেদেরই অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁদের দরজায় "ভ্যরি বিজি" লেখা সাইনবোর্ড ঝুলতে থাকে ; তেমন করে কিন্তু আর চলবে না। মিস মেয়োও তা বুঝতে পেরেছিলেন। একদা তিনি বাজারে নিলামে বিক্রী হয়েছিলেন, আজ আর সেরূপ আত্মবিক্রীত হবার ইচ্ছা তাঁর নাই। তাই বোধ হয় তাঁর সুবুদ্ধি এসেছে, নূতনভাবে মত্ত হয়ে এবার তিনি দরিদ্র এবং ছাত্র বন্ধুদের সংগে মিশতে এসেছেন।

তিনিই করুণ সুরে বলেছেন, রুশিয়ার সংগে আর চালবাজি করলে চলবে না। নিজেদের মাঝে যে নূতন রুশিয়া গড়ে উঠেছে তাকে স্বীকার করতে হবেই। ইহুদী এবং নিগ্রোও মানুষ, তাঁদেরও সমাজে স্থান দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মিস্ মেয়ো বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুন্জের সংগে আমেরিকার তুলনা করা অন্যায় হবে। আমেরিকার লোক যা চাইবে তা তাদের দিতে হবেই। যদি না দেওয়া যায় ভবিষ্যতে খারাপও হতে পারে।

পূর্বেই বলেছি লোকজনাকীর্ণ হারলামে দিনের বেলায় শ্বেতকায়রা যান না, অথচ রাত্রে তাদের সেদিকে যাওয়া চাইই। হারলামে এমন কি মোহ আছে যে তথায় রাত্রে যাওয়া অতীব দরকার। একটি মোহ আছে সেই মোহটি হল নাইট ক্লাব। আমেরিকার নাইট ক্লাবগুলি প্যারীকে হার মানিয়েছে। প্যারীর বদনাম আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু আমেরিকার নাইট ক্লাবের কথা কজন বলেছেন অথবা বলবার সুযোগ পেয়েছেন? আমার সে সুযোগ হয়েছিল কারণ আমি নিগ্রোদের সংগে মিশতে সক্ষম হয়েছিলাম।

যাদের মনে সাহস নাই, যারা পরের দাসত্ব পছন্দ করে, তারাই ধর্মভীরু হয় বেশি। একদিন একটি গির্জাতে নিগ্রোদের উপাসনা দেখতে গিয়েছিলাম। পাদরী মহাশয় পুরুষ হয়েও যেমন করে মেয়েলী ভাব দেখালেন তাতে মনে হয়েছিল এ জাত আর টিকবে না। এ জাত শ্বেতকায়দের সংগে হয় মিশে যেতে বাধ্য হবে নয় ত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাদের মিশে যাওয়াটাই চাই কিন্তু আমাদের দেশে যেমন করে আর্য রক্তের সংগে অনার্য রক্ত মিশতে দেওয়া হয় না, তেমনি আমেরিকার শ্বেতকায়রা নিগ্রোদের নিজের মাঝে মিশিয়ে ফেলতে রাজি নয়। শ্বেতকায়দের গররাজি অথবা নিমরাজিতে কিছু আসে যায় না। মানুষ

বাসনার দাস। মানুষ বাসনাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। নিগ্রোরাও খাওয়া পায়, আমেরিকানরাও ভুরিভোজন করে। আমেরিকার নিগ্রোদের মন প্রিমিটিভ ষ্টেজে নাই অতএব শ্বেত এবং কালোয় মিলন অনিবার্য এই মিলনের ফলেই এমন অনেকগুলি নরনারীর জন্ম হয়েছে যারা বর্ণশংকর বলে পরিচিত। নাইট ক্লাবগুলিই সাদায় কালোয় মিলনের স্থান যদি বলা হয় তবে অন্যায় বলা হবে না। অবশ্য তার প্রমাণ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না, এটা একটা অনুমান মাত্র। তবে সকল সময় অনেক অনুমান সত্য হয় না। আমার অনুমানও যে ধ্রুব সত্য তা আমি জোর গলায় বলতে পারি না, তবে একথা বলতে পারি সাদায় কালোয় মিলনের ফলে যেসব বর্ণশংকরের জন্ম তাদের জন্মস্থান হারলামেই। সেইজন্য ইউরোপীয়গণ বলেন হারলাম শুধু হারলাম নয়, হারলাম একটি পূর্বদেশীয় "হারেম"। ইউরোপীয়গণ কেন হারলামের উপর হারেমত্ব আরোপ করেন, সে কথার জবাব তারাই ভালকরে দিতে পারবেন। আমি পর্যটক মাত্র, আমি কোন কথার বিচার করার অধিকারী নই।

একদিন লণ্ডনের একটি প্রসিদ্ধ ক্লাবে একজন বিশিষ্ট ধনীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। ধনী নিজেই আমার সংগে কথা বলেছিলেন। লণ্ডনে নিজে উপযাচক হয়ে কোন ধনী অথবা সম্মানিতের সংগে আমি সাক্ষাৎ করতে অথবা কথা বলতে যায় নি। এই কাজটি আমার কাছে সর্বদা সর্বত্র অপমানজনক মনে হ'ত। ধনী বলেছিলেন, যেমন করে এদেশে আমরা অশ্বেতকায়দেরে নিজের মাঝে মিশিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছি, তেমনি যদি আমেরিকানরাও নিগ্রোদের তাদের সংগে মিশিয়ে ফেলতে পারত তবে সাদা কালো বলে তাদের কোন বালাই থাকত না। হারলামে থাকবার সময় বেশ ভাল করেই অনুভব করেছিলাম, প্রকাশ্যভাবে কেউ নিগ্রোদের সংগে মিশতে রাজি নয়, কিন্তু গোপনে অনেকেই অনেক কাজ

করে। এরূপ গোপন কাজ আমাদের দেশেও হয়, কিন্তু তা আমরা হজম করতে পারি না। আমেরিকাতে শিশু রক্ষা করার নানা রকমের প্রতিষ্ঠান আছে বলেই সে দেশে ভ্রূণ হত্যা হয় না। কোন কোন মাতার আইন মতে বিবাহ হবার পূর্বেই সন্তান হয়। আমেরিকা সরকার সে রকমের সন্তানকে শিশুসদনে প্রতিপালিত করেন। আমাদের দেশেও আমাদের সময়ে সেরূপ ছেলে মেয়ের অস্তিত্ব ছিল। সেরূপ একটি ছেলের নাম হ'ল কর্ণ। সে যুগে কর্ণের মত বীর কমই ছিল। কুন্তীর বিয়ে হবার পূর্বেই কর্ণের জন্ম হয়। সমাজের ভয়ে কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দেন কারণ সেরূপ শিশুকে রক্ষা করার ভার সমাজ প্রকাশ্যে গ্রহণ করত না। আমেরিকায় সেরূপ শিশু রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেছে। ইউরোপেও সেরূপ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সর্বত্রই বিরাজমান। হারলামে এরূপ শিশুর অভাব ছিল না। তাদের কারো বাবা নিগ্রো আর মা আমেরিকান, আবার কারো মা নিগ্রো বাবা আমেরিকান। নিগ্রো মহিলা সন্তানকে কোনমতেই পরিত্যাগ করেন না। আমেরিকান মহিলা নিগ্রো পিতার সন্তানকে শিশু সদনে পরিত্যাগ করে। সেরূপ অনেক শিশু যারা এমন বড় হয়েছে, বিয়ে করে সংসারি হয়েছে তাদের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা আমার সংগে কথা বলে আরাম পেতেন কারণ আমি তাদের ঘৃণা করতাম না। মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করা বড়ই অন্যায় কাজ। আমেরিকার শ্বেতকায়রা কিন্তু সেরূপ অন্যায়কে এখনও প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

হারলাম নিউইয়র্ক-এর একটি অংশ। হারলামের মত সুন্দর স্থান দ্বিতীয়টি দেখিনি। লোকে প্যারীর কথা বলে কিন্তু প্যারী হারলামের কাছে হাজার বার হার মানে। তবুও প্যারীর নাম এত কেন? তার একমাত্র কারণ হল, আমাদের দেশের যে সকল হোমরা চোমরা ইউরোপ

যান তারা প্যারীতে গিয়ে বেশ আনন্দ করেন। তাদের নিউইয়র্ক যাবার ফুরসত হয় না এবং যদি কেউ ভুল করে নিউইয়র্কে যান তবে হারলামের দিকে যেতে চান না পাছে তাদের সম্মানের লাঘব হয়। কি করে সম্মানের লাঘব হয় হয় তা হয়ত পাঠক মোটেই বুঝবেন না। আমেরিকায় আজও ভারতবাসী অছুতরূপেই গণ্য হয়। যদি কোন পর-শ্রমজীবী বিলাত ভ্রমণ করে আমেরিকায় যান তখন দেখতে পান তিনি একজন ভারতীয় হরিজন ছাড়া আর কিছু নন। তাই কোনমতে শ্বেতকায়দের সংগে দিনকয়েক কাটিয়ে মানে মানে দেশে ফিরে আসেন। হারলামের কথা মনেতেই রাখেন, মুখে প্রকাশ করেন না।

প্যারীতে টাকার অভাব লেগেই আছে। নিউইয়র্কে টাকার অভাব নাই। কিন্তু সে টাকা শুধু ধনীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ তাই নিউইয়র্ক টাকায় বোঝাই হয়েও দরিদ্রতায় পূর্ণ। নিউইয়র্ক লণ্ডন হতেও বড় এই নগরের সকল কথা যদি জানতে হয় এবং দেখে তা উপলব্ধি করতে হয় তবে অন্তত ছয়টি মাস ক্রমাগত তথায় ঘুরে বেড়ান দরকার। আমার সে সুযোগ হয় নি তবে একথা বলতে পারি সাইকেলে, কারে, এলিভেটারে, বাসে এবং স্যাবওয়েতে যতটুকু ভ্রমণ করেছি ততটা সকলে পেরে উঠে না। এত ছুটাছুটি করে জানতে পেরেছি দরিদ্রতা কোথা হতে এসেছে। পাদ্রীরা বলে মদ খেয়ো না, অথচ মদের দোকান চব্বিশ ঘণ্টা খুলে রাখার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেরূপভাবে যুবক-যুবতীদের নানা উপদেশ দেওয়া হয় অথচ তাদের ধ্বংসের পথ এত ব্যাপকভাবে খুলে রাখা হয়েছে যে তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর কি কোন প্রতিকার নাই? প্রতিকার আছে। সে প্রতিকারের জন্য সরকার একেবারে উদাসীন। যারা পারছে তারাই সেই ধ্বংসের পথ হতে ফিরে আসছে আর যারা পারছে না তারাই অকালে অক্কা পাচ্ছে।

গ্যাথো

আমাদের দেশে অনেকেই হয়ত গ্যথো কথাটা মোটেই বুঝবেন না। যেখানে গরীব ইহুদীরা বসবাস করে থাকে, পোল্যাণ্ডের জমিদার এবং ধনীরা তাকেই শ্লেষ করে গ্যথো বলত। পোল্যাণ্ড হতে অনেক লোক আমেরিকায় এসে বসবাস করছে। তাদের মাঝে ধনীও আছে দরিদ্রও আছে। যে সকল স্থানে আমেরিকার দরিদ্র লোক বসবাস করে, পোল্যাণ্ড হতে আগত ধনীরা সেই স্থানগুলিকে গ্যথো নাম দেয়—পরে সেই কথাটি সর্বসাধারণ গ্রহণ করে। এখন আমি নিউইয়র্ক নগরীর একটি দরিদ্র পাড়ার কথা বলব যা গ্যথো নামেই পরিচিত।

ভারতের কত লোক না খেয়ে মরে অথবা রোগে ভুগে মরে তার খবর অতি অল্প লোকই রাখে। কিন্তু গরমের সময় আমেরিকায় অতি গরমে কত লোক মারা গেল সেই সংবাদ রয়টার পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করতে কোনরূপ কসুর করেন না। আমি বুঝতাম না গরমে লোকে কি করে মরে। তাই আমেরিকায় এসে যখন শুনলাম ঐ 'গৈবী ব্যামারী' নিউইয়র্কে দেখা দিয়েছে তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। ব্রডওয়ে ধরে গ্যথোর দিকে চললাম। গ্যথোতে থাকে দরিদ্র এবং বেকার। সেদিকে যেতে হলে একটি ভারতীয় ক্লাব পথে পড়ে। আমার ইচ্ছা হল গ্যথো দেখবার পূর্বে ক্লাবের সদস্যদের সংগে একটু কথা কয়ে যাই। ক্লাবে গিয়ে যখন আমি বললাম আমেরিকার দরিদ্র পাড়াতে বেড়াতে চলেছি তখন তারা একটু আশ্চর্য হল। একজন আমাকে বলল সেখানে ভগবানের আশীর্বাদ পড়ে নি, সেখানকার লোক মহাপাপী। তারা

মহাপাপী বলেই তাদের এই দুর্দশা। আমি কিন্তু তাদের কথায় মোটেই দমলাম না। কারণ আমি ভাল করে জানতাম দরিদ্রতা কোথা হতে এসেছে। তাই চললাম গ্যাথোর দিকে।

নিউইয়র্কের এবং আশপাশের ছোট ছোট শহর থেকে দরিদ্র লোক গ্যেথোতে এসে বাস করে। পথ ঘাট শহরের অন্যান্য স্থানেরই মত, তবে শহরের অন্যত্র এক-একটা কম্‌পার্টমেণ্টে যত লোক থাকতে পারে, এ পল্লীতে তার দ্বিগুণএরও বেশি লোক বাস করে। অকর্মণ্য হয়ে যাদের দিন কাটাতে হয় তাদের দিন যে কত কষ্টে কাটে, তা এই পাড়ার লোকরাই ভাল করে জানে।

যে স্থানের জলবায়ু ভাল, সেখানে থাকবার স্থানের অভাব হলেও লোকের ক্ষুধা হয়। ক্ষুধার জ্বালায় পথে পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকে সস্তা খাদ্য খায়। এতে ক্রমেই শরীর দুর্বল হয়। স্নানের অসুবিধা থাকায় অনেকে স্নান করতে পারে না। যদিও বাইরে গরম, তবুও জলের পাইপ খুললে যে জল আসে তা ভয়ানক ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা জলে স্নান্ করা শীতের দেশের লোক সহ্য করতে পারে না, তাই তারা বিনা স্নানেই থাকে। ক্রমাগত না খেয়ে, অভ্যাসবশে যখন পথে বেরোয়, তখন অনেক সময় তারা গরম সহ্য করতে পারে না। কাজেই পথে পড়ে যায় এবং দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র অনভ্যস্ত উত্তাপে সহজেই স্থির হয়ে যায়। একেই বলে 'ড্রপ ডাউন্'। এই ধরনের মরণ বড়লোকদের কাছে ঘেঁয়ে না, গরীবদেরই বিনাশ করে। সৌভাগ্য বলব কি দুর্ভাগ্য বলব জানি না, গ্যাথোয় গিয়ে তিনটি লোককে পথে পড়ে মরতে দেখেছিলাম। পুলিশ এসে তাদের পকেট পরীক্ষা করে একটি সেণ্টও বার করতে পারে নি ; পেয়েছিল কতকগুলো মামুলী কাগজপত্র, বাইবেলের পাতা, স্যোসিঅ্যালিজ্‌ম সম্বন্ধে ছোট দু-একটা পুস্তিকা ইত্যাদি। বিকালের

সংবাদপত্র বেরুল—গ্যথোয় আজ তিনজন লোক 'হীট ওয়েভ' সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। দারিদ্র্যের জন্য, না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে মারা গেছে, একথা কেউ বলল না। যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সর্ববিদিত, যেখানে ডিমক্রেসির পূর্ণ প্রভাব বর্তমান বলে কথিত, সেখানেও মুদ্রাযন্ত্র অবলীলাক্রমে গরীবের কথা ভুলে যায়।

আমার ধারণা ছিল পৃথিবীর সকল ইহুদীই সুখী এবং ধনী। গ্যথোতে এসে আমায় সে ধারণা ভেংগে গেল। দরিদ্র ইহুদীর দল বেঁচে থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু ব্যবসায়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের মেরুদণ্ড ভেংগে দিচ্ছে। গ্যথোতে সারাদিন কাটিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে ফের বিকাল দশটার সময় গ্যথোতে ফিরে এলাম। ভদ্রলোকরা সাধারণত যে সময়ে হারলামে আসেন আরাম করতে, আমি গেলাম সে সময়ে গ্যথোতে দরিদ্রের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের উগ্রতা হৃদয়ংগম করতে।

তখনও রাত হয়নি, সবেমাত্র দশটা বেজেছে। দরিদ্রের ছেলে-মেয়েরা সারাদিন পথে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে তথাকথিত এপার্টমেণ্টএ ফিরে চলেছে। অল্পাহারে ও পরিশ্রমে কেউ বা কাতর, কেউ বা প্রায় অর্ধমৃত। খৃষ্টধর্ম প্রচারকরা আমেরিকার জাতীয় পতাকা টাংগিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাপীদের পরিত্রাণার্থে ডাকছে; কিন্তু খেয়ে বাঁচবার জন্য কেউ একটা পয়সাও নিরন্নদের দিচ্ছে না। কেউ দাঁড়িয়ে শুনছে, কেউ বা কান না দিয়েই চলে যাচ্ছে। ছেলেতে ছেলেতে মেয়েতে মেয়েতে পথের উপর দাঁড়িয়ে বেশ বচসা চলেছে সামান্য এক টুকরা রুটির জন্য। পথের কাছে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বৃদ্ধকে বলছে, "আজ আর কিছু খেতে পাইনি।" আমি নিগ্রো-বেশে পথে চলেছি তাই আমাকে কেউ কিছু বলছে না। মাত্র দুএকটা বলবান যুবক মাঝে মাঝে মুখের কাছে

এসে বলছে, "এই, তোর কাছে সিগারেট আছে?" যখনই বলছি, "হে প্রভু আমিও যে একটি চাই, আপনার কাছে যদি অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরা থাকে তবে দয়া করে দিয়ে যান।" অমনি "দুঃখিত" বলে পাশ কাটিয়ে তারা চলে যাচ্ছিল।

ছোট ছোট কাফিখানায় সস্তা দরে কাফি বিক্রি হচ্ছে। এক পেয়ালা কাফি এবং একখানা মারগারিন মিশ্রিত রুটির টুকরা পাঁচ সেন্টে বিক্রি হচ্ছে। ছোট ছোট মিষ্টির টুকরার দাম এক সেণ্ট। ছোট ছোট মিষ্টির দোকানে খুব ভিড়; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য বজায় রেখে কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে! এইসব দেখলে আমেরিকার শিক্ষাবিভাগকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না।

বেরিয়ে দেখলাম মিশনারীরা যেমন একদিকে দাঁড়িয়ে ভগবানের গুণ কীর্তন করছেন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে নাস্তিকরাও তেমনি ভগবানের নিন্দা করছেন। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম, ডিমোক্র্যাসির প্রশংসা করে উচ্চকণ্ঠে লেকচার চলেছে, তার কাছেই আর একদল লোক ডিমোক্র্যাসিকে হিপোক্র্যাসি বলে কমিউনিজমএর লেকচার দিচ্ছে। পূর্বেই বলেছি, গ্যাথো গরীবের স্থান। কমিউনিজম্ এখানকার লোকের প্রাণের জিনিস; তবু অন্যান্য বক্তাকে কেউ আক্রমণ করছে না। যার বক্তৃতা ভাল হচ্ছে তার বক্তৃতা লোকে নির্বাক হয়ে শুনছে। যার বক্তৃতা লোকের ভাল লাগছে না তার কাছে থেকে লোক চলে যাচ্ছে। এমনও দেখেছি, কোনও কোনও বক্তার সামনে একটিও লোক নাই তবুও বক্তৃতার বিরাম নাই। মাঝে মাঝে এরূপ বক্তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কখনও দেখতাম বক্তা একজন শ্রোতা পেয়েও সুখী। কিন্তু যখনই বলতাম, "কালো লোকের আবার ভগবান কি? আপনাদের মত শ্বেতকায়দের সেবা করা, আপনাদের কথা মেনে চলাই

হল কালোদের ধর্ম। আপনারাই হলেন আমাদের ভগবান।" অমনি বক্তৃতার সমাপ্তি হয়ে যেত।

গ্যাথোতে বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাতির আলো পথই আলোকিত করেছে, কিন্তু অনেক বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে উঠা বড়ই কঠিন। বাল্‌ভ নষ্ট হয়েছিল, অর্থাভাবে তা আর কেনা হয়নি। অনেকগুলি রুমের অবস্থাও অনেকটা তাই। রুমগুলিতে আলো নাই, বাতাস নাই, তারপর রুমগুলি অপরিষ্কার। অনেকে বলেন স্থানীয় লোকের দোষেই এই এলাকার বাড়িগুলি অপরিষ্কার থাকে। শরীর যখন রুগ্ন থাকে, মন যদিও কাজ করতে চায় তখন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। এ অন্‌চলের লোক অর্থাভাবে অনেকেই রোগগ্রস্ত। সে রোগ আর কিছুই নয়, শুধু পেটের ক্ষুধা মাত্র। সে রোগের অবসান করার জন্য অনেকেই পাঁচ পেনীর কার্ল-মার্কস্‌ কিনে পাঠ করে, হয়ত পাঁচ পেনীর বইই একদিন গ্যাথোকে সকল রোগ হতে মুক্ত করবে।

একটি বিষয় এখানে দেখতে পাওয়া যায় যা বলতেও আমার মুখ শুকিয়ে আসে। ইংলণ্ড হতে যখন আমেরিকার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন কতকগুলি নাবিক আমেরিকায় গিয়ে কে কি আনন্দ করবে তারই কথা বলে আনন্দ পেত। একজন নাবিক বলছিল সে ব্রন্‌জ গিয়ে ছুটির দিনগুলি কাটাবে। ব্রন্‌জ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার বিনা লাইসেন্সের প্রাইভেট বারবণিতাদের আড্ডা স্থল। যে দেশ পৃথিবীর ধনের মালিক সে দেশে যদি অর্থাভাবে যুবতীরা শরীর বিক্রয় করে তাতে কার না দুঃখ হয়। একেই বলে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদীরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে আপনজনের প্রতিও অত্যাচার করতে ছাড়ে না। এতক্ষণ আমি গ্যাথো বলেই সকল কথার অবসান করছিলাম। গ্যাথো হল পোল্যাণ্ডে। পোল্যাণ্ডের ধনী, জমিদার এবং শাসক শ্রেণীকে

কে না জানে ? বাংলা দেশের ধনী, জমিদার এবং উপশাসকদের সংগে পোল্যাণ্ডের সমুহ মিল আছে সেজন্যই পোল্যাণ্ডের কথা বাদ দিয়ে আমেরিকার কথা বলাই দরকার।

আজ যাকে গ্যাথো বলা হচ্ছে গতকল্য এই স্থানটুকুকেই ব্রনজ বলা হ'ত। এখনও লোকে অফিসিয়েল মতে গ্যাথোকে ব্রন্‌জই বলে। ব্রন্‌জে ইহুদী থাকে না, খৃষ্টানও থাকে। এখানকার খৃষ্টানরাও দরিদ্র। খৃষ্টান যুবতীরাও এখানে শরীর বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ফাঁদার হপকিন, ফাঁদার ডিভাইন তাঁরা শুধু মুখে মুখেই লোক সেবা করছেন কিন্তু তাঁদের মস্তিষ্ক এতই উর্বর যে, কি করে এই জঘন্য বারবনিতাবৃত্তি ব্রন্‌জ হতে লোপ পায় তার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ। এখানে ইহুদীরা দরিদ্রতা সংগে করে নিয়ে আসেনি যাতে করে তাদের দোষ দেওয়া যেতে পারে। ইহুদীরা এখানে আসার পূর্বে খৃষ্টানরাই এখানে বাস করত, তবে কেন এদের এই দুর্দশা ? এই দুর্দশার জন্য আমেরিকার ধনীরাই দায়ী।

ব্রন্‌জ হতে ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। তবুও ইচ্ছা হচ্ছিল আরও দেখি। আরও লোকের সংস্পর্শে আসি। কিন্তু ঠাওর করে উঠতে পারছিলাম না কোনটা দেখতে হবে, কোন বিষয়টা জানতে হবে। টাইম্‌স্ স্কোয়ার কাছেই। টাইম্‌স্ স্কোয়ারটা দেখে আসবার ইচ্ছা হল। সেদিকে একটু বেড়াবার পর এক জন পূর্তরীকোবাসীর সংগে দেখা হয়। লোকটি বেশ বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান। তাকে নিয়ে সোজা ঘরে চলে আসলাম এবং পুর্তরীকোতে আমেরিকানরা কেমন শাসন চালাচ্ছে তারই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।

পুর্তরীকোবাসিন্দা ভদ্রলোককে দেখতে অনেকটা বাংগালীর মতই দেখায়, তবে তাঁর চুল অনেকটা নিগ্রোদের মত। তিনি নিজেই বললো "যদিও আমার শরীরের গঠন অনেকটা আপনার মতই, তবুও মাথার চুল

নিগ্রোদের মতই রয়ে গেছে। আসলে আমি নিগ্রোই। আমার পূর্বপুরুষ এদিকের বাসিন্দা নন, তাঁরা কেনা গোলাম ছিলেন এবং তাঁদের আনা হয়েছিল আফ্রিকা হতে। আমার শরীরে নানা রকমের রক্ত আছে যেমন স্পেনিশ্, ইণ্ডিয়ান এবং নিগ্রো। লোকটির সরলতা আমাকে মোহিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, স্পেনিশ্ রাজত্বের সময় তাদের ভয়ানক দুর্দিন ছিল। আমেরিকান্‌রা যেদিন হতে তাঁদের দেশে পদার্পণ করেছে সেদিন হতেই তাঁদের উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। এখন তারা বেশ সুখেই আছেন।

তিনি দুঃখ করে বললেন কতকগুলি বিদেশী লোক তাদের স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে। এই চিৎকারের সংগে সুর মিলিয়ে কতকগুলি আমেরিকানও বলছে পুর্তরাকোদের স্বাধীন করে দিয়ে আমেরিকার সংগে সকল রকমের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হউক। অনেকে আবার পুর্তরাকোর সংগে হিন্দুস্থানেরও তুলনা করে। তারা বলে ভারতবর্ষ যদি বৃটিশ শাসন হতে মুক্তি পাবার জন্য আন্দোলন চালাতে পারে তবে পুর্তরাকোও সেরূপ মুক্তি সংগ্রাম চালাবার যোগ্য। আমি পুর্তরিকো ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি স্বাধীনতা চান না? ভদ্রলোক হেসে বললেন "না মহাশয়, আমরা স্বাধীনতা চাই না। আমেরিকানরা যদি আমাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা চায় তবে তা আমরা দেব না।"

পুর্তরীকো পুরাতন একটি দ্বীপ। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা অনেক বৎসর ধরে পুর্তুগীজ এবং স্পেইনিশদের সংগে লড়াই করে একেবারে নির্মূল হয়। পরে এই দ্বীপে নিগ্রোদের আগমন হয়। নিগ্রোরা পর্তুগীজ এবং স্পেনিশ্‌দের গোলাম ছিল। নিগ্রোদের দ্বারা সকল কাজ হ'ত না বলে ইণ্ডিয়ানদের আমদানী করা হয়। স্পেনিশরা পুর্তরীকো দ্বীপের উন্নিত অতি অল্পই করেছিলো; পরে আমেরিকানরা যখন এই দীপটি দখল

করল তখন দাসব্যবসা একদম উঠিয়ে দিয়ে আমাদের সমূহ উন্নতি করতে থাকে। পূর্তরীকো পার্বত্যদেশ। এদেশে জমির বড়ই অভাব। আমরা আমেরিকার গমের উপরই নির্ভর করি। আমাদের লোকবল নাই এবং যা আছে তাদের শিক্ষাও তেমন নাই যাতে করে আমরা আমেরিকাকে ছেড়ে দিয়ে একদিনও টিকতে পারি।

আমাদের দ্বীপে যে সকল আমাদের কাজ করে তাদের মাইনের সংগে আমাদের মাইনের কোন প্রভেদ নাই। আমরা যখন আমেরিকায় আসি তখন আমেরিকানদের সংগে থাকতে পাই, যা স্থানীয় নিগ্রোরা পায় না। আমেরিকার বাইরে থেকে যদি কেউ আমেরিকানদের সমান মজুরী পায় তবে আমরা পাই এবং ফিলিপাইনেরাও পায়। ফিলি-পাইনোরা স্বাধীন হবার উপযুক্ত কারণ তাদের লোকবল, এবং তাদের দেশের মাটির নীচে এবং উপরে দরকারী জিনিস পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আম, কাঁটাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু আম কাঁটাল বিক্রি করে কি আমরা বাঁচতে পারি? আমরা আমেরিকার ঘাড়ে উঠে বসেছি, কোন মতেই আমরা আমেরিকার ঘাড় হতে নামব না। আমেরিকার অসৎ লোক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুক, তাদের কথা কে শুনে?

বাস্তবিক পুর্তরীকো দ্বীপ হতে আমেরিকার কোন লাভই হয় না। পিমীর এবং স্কট্রা নামক দ্বীপ দুটি রক্ষা করার জন্য বৃটিশ সরকার যেমন বিনা দ্বিধায় টাকা খরচ করেন, তেমনি আমেরিকাও পুর্তরীকো দ্বীপটির রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হল। আসলে পুর্তরীকো দ্বীপ কখনও একটি ব্যবসায়ের স্থান হবে না।

পুর্তরীকো ভদ্রলোক সে রাতটি আমারই সংগে কাটিয়ে পরের দিন হতে আমার ঘরে রীতিমত আসতে থাকেন এবং তাঁর সাহায্যে আমি

আমেরিকার অনেক কথা জানতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই পুর্তরীকো ভদ্রলোক আমেরিকার প্রায় দেশই ভাল করে বেড়িয়েছেন। একদিন তাকে "হিন্দু আমেরিকা" সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে বলেছিলেন হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না, তবে আরব সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা আছে। ঘটনাক্রমে তিনি টানজিয়ার্স হয়ে স্পেনে যান এবং সেখান থেকে দেশে ফিরে আসেন। স্পেনের সংগে আরব সভ্যতার সমূহ সম্বন্ধ রয়েছে এবং স্পেনিশ সভ্যতাই দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক হতে বিদায়ের পূর্বে একটা ছোট কাফেতে কয়েকজন লোকের সামনে বসে হঠাৎ কি একটা কথা বলেছিলাম। সেখানে ছিলেন রকফেলার বিল্ডিংএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আমাকে তিনি তাঁদের বিল্ডিং সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। আমি তার উত্তর আমার মতেই দিয়েছিলাম। অনেকের ধারণা বড় বড় বিল্ডিংএর ভারে নিউইয়র্ক ডুবে যাবে। আমি বলেছিলাম, "হাঁ সেরূপ ধারণা করার মত লোক পৃথিবীতে অনেক আছে তবে আমি সেরূপ হিন্দু নই। শক্ত 'বটম' (পাথর) যথায় উপরে ভেসে উঠেছে এবং যথায় গ্রেনেট হাতুড়ি দিয়েও ভাংগা যায় না সে স্থানে অট্টালিকার ভারে নগর ডুবে যাবে তা বাতুলই বলতে পারে।" বোধ হয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মহাশয় সাধারণ লোকের কাছ থেকে এরূপ কথা শুনেননি। তাই আমাকে তাঁর বাড়ি দেখতে নিমন্ত্রন করেন। পরের দিন যখন রকফেলার বিল্ডিং দেখতে গেলাম তখন দর্শকরূপে অনেক লোক তথায় হাজির ছিল। একটি একটি করে অনেক রুম দেখান হল। যখনই আমাকে কোন প্রশ্ন করা হচ্ছিল আমি হাঁ হুঁ করেই জবাব দিচ্ছিলাম। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বললেন, "এরূপ বিল্ডিং দেখে

আপনার মন যেন উঠ্‌ছে না বলে মনে হয়, তার কারণ কি?" আমি বললাম, "দেখার মত এমন কিছু এখনও চোখে পড়েনি, যার উপর কোন মন্তব্য করা চলে। কংক্রিট, কাঁচ, লোহা, টিন—এর বেশি এখনও কিছুই দেখিনি।" তখন তিনি আমাকে ঘরের দরজার সামনেকার কয়েকখানা পাথর দেখালেন।

আমি পাথর সম্বন্ধে কিছু জান্‌তাম। তিনি আমাকে করলেন, "এই পাথর কখানা যদি পাইরাইটিশ হয় তবে তার ওজন কত হবে?" আমি বললাম, "পাইরাইটিশ গলান যায় কিনা তা আমি জানি না এবং যদি গলান সম্ভব হয় তবে প্রত্যেক খানার ওজন পন্‌চাশ হতে ষাট টন হবে।" আমার জবাব শুনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বুঝলেন, আমি একমাত্র মাটির উপর ঘুরেই সন্তুষ্ট হইনি, মাটির নীচের সংবাদও কিছু রাখি। একটুকু বাজিয়ে দেখে আমাকে তাঁদের রেডিও সিটিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের দেশে কতগুলি ভাষার সাহায্যে লোকে কথা বলে?" বুঝতে পারলাম, আমি যা বলব তাই অম্‌নি ব্রডকাষ্ট হবে। জবাব দিলাম, "ভারতে বর্তমানে একটি মাত্র ভাষা, যা প্রায় সকলেই বুঝে।"

"তার নাম কি?"

"হিন্দুস্থানী।"

"শুন্‌তে পাই ভারতে প্রায় শ'খানেক ভাষা আছে?"

"আমিও শুনেছিলাম, আমেরিকায় সবাই মিলিয়োনিয়ার।"

"তবে কি কথাটা প্রপেগেণ্ডা?"

"অনেকটা তাই।"

"আপনার জানামতে অন্য কোন ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে কি?"

"হাঁ।"

"তার নাম কি ?"

"তামিল।"

"হিন্দুস্থানী এবং তামিল ভাষার মাঝে প্রভেদ কি ?"

"দুটি ভাষা দুটি মূল হতে বের হয়েছে।"

"তামিলরা হিন্দুস্থানী বুঝে ?"

"পূর্বে বেশ ভালই বুঝত, মাঝে ইংলিশ ভাষা শিখতে গিয়ে হিন্দুস্থানী ভুলে যায়, এখন তারা আবার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তুলছে।"

"অন্য তিনজন ভারতীয় পর্যটক বলেছেন যে ভারতে অন্তত পন্চাশটি ভাষা বিদ্যমান।"

"আমি বলি আমেরিকায় সত্তরটি ভাষার প্রচলন আছে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বল্‌তে চান ?

"আমি বলব মিথ্যা কথা।"

"আমি বলছি সত্য কথা। ঐ দেখুন গ্রীক্, শ্লাভ, ইতালীয়ানো, জার্মান, ফ্রেন্‌চ, পর্তুগীজ, স্পেনিশ ভাষায় সংবাদপত্র রয়েছে, তবুও বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি ? তারপর মেডিটেরিনিয়ান্‌বাসীদের মধ্যে কত ভাষার প্রচলন আছে তা যদি দেখতে চান তবে চলুন ২০ নম্বর স্ট্রীটে। এসকল ভাষা তো কতকগুলি লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ। ঠিক সেরূপ ভারতেও কতকগুলি ভাষা কতকগুলি লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ. কিন্তু সকলেই বোঝে হিন্দুস্থানী। এখন বলুন এই সত্য সংবাদ দিবার জন্য আমাকে কত দিবেন এবং কতইবা মিথ্যা সংবাদ-বিক্রেতাদের দিয়েছেন ?"

হঠাৎ চারদিক আলো করে বাতিগুলি জ্বলে উঠল। হাজার লোকে বসে যেখানে থিয়েটার শুনে, প্রবেশমূল্য যেখানে সকলের পকেটে সকল সময় থাকে না, হলিউডের স্টাররা যেখানে কথা বলে ধন্য হয়, পৃথিবীর

সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং ইম্‌পেরিয়েল বিল্ডিং ছাড়া আর কারো সংগে যার তুলনা হয় না—সেই বিল্ডিং দেখে নয়ন আমার সার্থক হল। আজ আমার পরিব্রাজক-জীবন ধন্য হল—ঠকি নাই বলে, লোভ করি নাই বলে, দেশকে বেচি নাই বলে, ছোট-খাট ভাব আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই বলে। আজ আমি আর নিউইয়র্ক-এ থাকতে চাই না। নিউইয়র্কবাসী তথা আমেরিকাবাসী জেনেছে, ভারতের প্রকৃত পর্যটক টাকায় বশ হয় না, কারু কাছে মাথা নত করে না।

রকফেলার বিল্ডিং-এ বসবার স্থান যেমন করে করা হয়েছে পৃথিবীতে আর তেমনটি কোথাও নাই। বসবার স্থানটিকে ওডিটরিয়াম বলা হয়। পূর্বকালে এরূপ বসার স্থান গ্রীকরা ব্যবহার করত সেই ধরনে লস্-এন্‌জেলসে অলিম্পিয়া গড়া হয়েছে কিন্তু রকফেলার বিল্ডিংএ বসার স্থান অন্য ধরনের। এর তুলনা শুধু এরই সংগে হয়। আমাদের দেশের লেখকগণ দিল্লীর বাদসার মসনদের কথা বেশ করে বলে ধন্য হয়েছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতে যাননি। যদি দিল্লীর বাদসার মসনদের বর্ণনাকারিগণ চীন-সম্রাটের মসনদ দেখতেন তবে দিল্লীর বাদশাকে ফরগণা গ্রামের ফকিরই বলতেন, আর বলতেন ভারতবাসীও দরিদ্রের জাত। চীন সম্রাটের প্রাসাদ, মসনদ এসবের সংগে তুলনা করার মত এমন কোন মসনদ অথবা প্রাসাদ ভারতে গড়ে উঠেনি। তাজমহলের নাম এখানে মোটেই বলা চলে না।

বর্তমান সময়ের বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল কি করে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি হয়েছিল এখানে তা বক্তব্য বিষয় নয়। সময় আসলে তাজমহলের 'আশ্চর্য' জিনিসটুকু আপনি প্রকাশিত হবে।

পুর্তরীকো ভদ্রলোককে সংগে নিয়ে আরও অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দেখতে গিয়েছিলাম। অট্টালিকাগুলি দে'খে বড়ই আনন্দ

হয়েছিল। নিউইয়র্ক নগরের বড় বড় বিল্ডিংএর একটি বিজ্ঞপ্তি পত্র আছে। সেই বিজ্ঞপ্তি পত্র অনুযায়ী নিউইয়র্ক নগরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ভবিষ্যতের পর্যটকগণ যদি দেখেন তবেই ভাল হবে কারণ বিজ্ঞপ্তি পত্রের রদল বদলও হতে পারে।

রেডিও সিটি দেখে মনে একটা কি ভাব হল তা বলতে পারি না। একদম রুমে এসে মিঃ ও মিসেস মুখার্জির কাছে পত্র লিখেই তা পোস্ট করলাম এবং সাইকেল বের করে ছোট ঝোলাটি কেরিয়ারে বেঁধে সটান চিকাগোর পথে এসে দাঁড়ালাম।

আজ আমি নিউয়র্ক হতে বিদায় নিব।

চিকাগো নিউইয়র্ক হইতে অনেক দূরে। হাজার মাইল পথ চলে যাব কয়েক দিনের মাঝে ভেবে পথে বেরিয়েছিলাম কিন্তু আমার মনে ছিল না আমাকে একটি বৃহৎ সেতু পার হতে হবে। এরূপ সেতু পৃথিবীতে আর নাই বললেও চলে। উপর দিয়ে চলেছে এলিভেটর, তার নীচে চলেছে মোটরগাড়ির লহর। মিনিটে মিনিটে সেতুর নীচে ফেরী বোটগুলির চিমনিগুলি উপরের পথিকদের নাকমুখ ধোঁয়া দিয়ে কালো করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে দৃশ্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হল না, হতে পারে না। চলতে হবে, নতুবা পথ বন্ধ হয়ে যায়, ঘাড়ের উপর লোক এসে পড়ে। সেতু পার হয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা স্থানে এসে চোখ ভরে নিউইয়র্ক নগরের রূপ দেখতে লাগলাম। নগরের পরিচিত বন্ধুদের বলে আসিনি কোথায় যাব। তাই কাছের একটি মোটর স্ট্যাণ্ড হতে ফোন করে বাড়িওয়ালীকে আমার পথের নির্দেশ দিয়ে জানালাম, "আজ যদি কেউ আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে জানাবেন আমি কোন্‌পথে গিয়েছি।" বাড়িওয়ালী আমাকে জানালেন যে, এরই মাঝে কয়জন লোক এসে চলে গেছে এবং বলে

গেছে আবার তারা আসবে। বাড়িওয়ালীকে জানালাম, ওয়াল্ড ফেয়ারের কাছেই কোথাও রাত্রি কাটান এবং ঠিকানা জানালে যেন বন্ধুবান্ধবদের তিনি জানিয়ে দেন। বাড়িওয়ালী গুডবাই বলে রিসিভার রেখে দিলেন। এতদিনের পরিচয় নিমেষে কেটে গেল। একেই বলে পথপ্রবাসের বন্ধুত্ব।

পুরাতনের সামনেই যদি নতুন কিছু থাকে তবে পুরাতনের জন্য আপশুষ করতে হয় না। আমার সামনে সবই নতুন। পাশের দৃশ্যও নতুন। হাজার হাজার মোটরকার পার্ক করা রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বৃহৎ কতকগুলি কচ্ছপ রৌদ্রে আরাম করে বসে আছে। শুধু কি তাই? অগণিত নরনারী বিশ্বমেলা দেখার জন্য আগিয়ে চলেছে। তাদের দুদিকের ঘরগুলি তত সুন্দর নয়। দরিদ্র লোক সেই ঘরগুলিতে থাকে। তারা সকলেই কাজে চলে গেছে নতুবা এত নির্জনতা অনুভব হবে কেন? লোকাকীর্ণ পথের দুদিকের দৃশ্য মোটেই সুন্দর নয়। এ স্থান পূর্বে আমি এসে দেখে গিয়েছিলাম, সেজন্যই এই দরিদ্র বাসিন্দার প্রতি একটা সহানুভূতি আপনি মনে জেগে উঠছিল। এখানে হট্ কেইস্ পাওয়া যায় না, প্যারেজ এবং অন্যান্য সুখাদ্য এখানকার রেঁস্তোরায় পাওয়া যায় না, তার কারণ সকলে জানেনা। যারা জানে তারা সেকথা মুখ খুলে বলে না। বলবার উপায় নাই। আমেরিকার ভাড়াটে সাহিত্যিক মজুর শুধু ধনীদের মন যুগিয়েই প্রবন্ধ লেখে। যখনই এই সাহিত্যিক মজুরগণ বেঁকে বসে এবং তাঁদের মনমত লেখতে আরম্ভ করেন তখন দেখতে পান তাঁদের প্রবন্ধ আমেরিকার কোনও সংবাপত্রে স্থান পায় না। আমেরিকানরা আমাদের মত অল্পে তুষ্ট হবার লোক নয়। তারা টাকা প্রচুর চায় কারণ খরচ এন্‌তাহার করতে বাধ্য হয়। আর যারা নিজকে সংযত করে

চলে তারাই বিদ্রোহী অথবা কমিউনিষ্ট বলে পরিচিত হয়। আমেরিকায় বিদ্রোহী অথবা কমিউনিষ্ট রূপে পরিচিত হওয়া আরামের নয়। কাজ করার অধিকারে হতে বন্চিত করা হয়, সমাজের লোক মেলামেশা করতে চায় না, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে। সাম্যবাদের প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে সকল রকমের মজুরকে তাদের গুণানুযায়ী কাজ দিতে হবে, আমেরিকার সরকার সেরূপ কোন আইন এখনও করতে পারেনি, তবে ১৯৩৯ সালের শেষ পর্যন্ত দেখেছি, যারাই কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দিয়েছে তাদের কাছ হতেই কাজ করার অধিকারের পরিচয় পত্র কেড়ে নিয়েছে। আমেরিকা সরকার কাউকে কাজ দেবেন বলে গ্যারেন্টি দেন না বটে তবে যারাই উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করে তারাই কর্মক্ষম বলে একখানা সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্বমেলা

ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের পাশেই কতকগুলি কেবিন ছিল। কেবিন মানে ছোট এক একখানা কাঠের ঘর। তার ভেতরে রান্না করার গ্যাস, স্নানের জন্য গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল এবং একটি বৃহৎ টাব। রান্না করার জন্য বাসন বিনা ভাড়ায় দেওয়া হয়। শুধু খাদ্যদ্রব্য কাছের কোনও গ্রোসারের দোকান হতে কিনতে হয়। কেবিনের ভাড়া প্রতি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মাত্র এক ডলার। আমাদের দেশের হিসাবে তিন টাকা চারি আনা। অনেকগুলি কেবিন দেখলাম। প্রত্যেকটি কেবিনই

খালি, কিন্তু আমার জন্য একটি কেবিনও খালি ছিল না। আমি কালা-আদমী। কালো লোকের থাকবার জন্য বিশেষ কেবিন রয়েছে—সে কথাটি আমার জানা না থাকায় আমায় অনেকক্ষণ চারিদিকে টহল দিতে হয়েছিল। আমার মুখ দেখেই কেবিনের ম্যানেজারগণ আমাকে এস্থান হতে অন্যস্থানে পাঠাতে লাগল। স্পষ্টভাবে কেউ বলল না অথবা কেউ বলতে সাহস করল না,—এই কেবিনগুলি শুধু সাদা লোকের জন্য। শেষটায় যখন নিগ্রোদের কেবিনের কাছে আসলাম তখন একজন ম্যানেজার হেসে বললেন, "Now you have come to the right place, have a cabin!" এতক্ষণে উপযুক্ত স্থানে এসেছেন, এখন একটা কেবিন পেতে পারেন। আমি কেবিনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যখন রেজিষ্টারে আমার নাম বিশুদ্ধ বংগ ভাষায় লিখতে লাগলাম, তখন ম্যানেজারের চমক ভাংগল। ম্যানেজার বলল, "আপনি ইংলিশ লিখতে জানেন না?" আমি বললাম, আমি শুধু নিজের ভাষায় লিখতে এবং পড়তে জানি—ইংরেজী শুধু বলতে পারি।" ম্যানেজার তখন আমার দেশ কোথায়, আমার কি জাত এবং আমার দেশের নানা সংবাদ নেবার পর কেবিনটা পরিষ্কার করবার জন্য একজন লোক পাঠাল। নিগ্রোরা প্রায়ই কেবিন নোংরা করে রেখে যায় বলেই পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়েছিল। ম্যানেজারগণও নিগ্রোদের কেবিন পরিষ্কার রাখার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করে না, কারণ এরা বুঝে না কেবিনে অপরিষ্কার রেখে গেলে পরবর্তী আগন্তুক কষ্ট পায়। কেবিনে সাইকেলটা রেখে, আফিসে গিয়ে ফের নিউইয়র্ক-এ টেলিফোন করে আমার অবস্থানের কথা জানালাম তারপর পুনরায় কেবিনে এসে রান্নার বন্দোবস্ত করলাম। ম্যানেজার মহাশয় দু চারজন আশেপাশের লোককে আমারই কেবিনে ডেকে গল্প জুড়ে দিলেন। কথা হচ্ছিল আমাদেরই দেশ

বিশ্বমেলায় সোভিয়েট রুশের প্রদর্শনী।

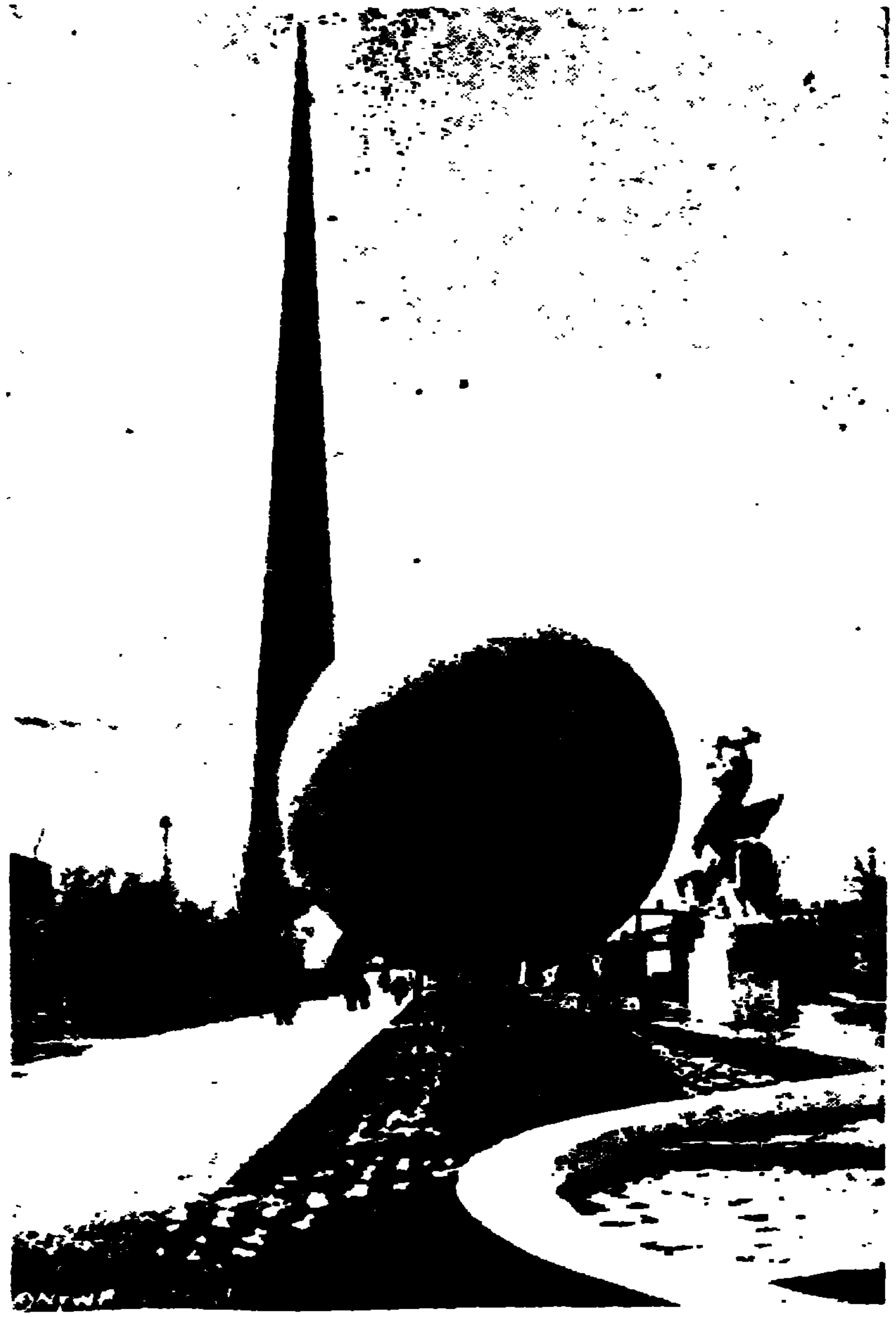

বিশ্বমেলায় একটি দৃশ্য, এই গোলকের পাশেই ভূগর্ভ নীচে বাইবেল ইত্যাদি রক্ষিত আছে।

নিয়ে। আমি তাদের কথায় মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছিলাম, কিন্তু আমার মন ছিল ওয়ার্ল্ড ফেয়ার-এর দিকে। খাওয়া সমাপ্ত করে বিশ্বমেলা দেখতে বার হলাম।

সুন্দর রাত। অনেক দর্শক জুটেছে। দর্শকদের মাঝে যারা "হিচ-হাইক" করে এসেছে, তাদের লোটাকম্বল ঘাড়ে বাঁধা দেখলেই চিনতে পারা যায়। তাদের দু-একজনের সংগে কথাও হল। অনেকে "হিচ-হাইক" করে কালিফরনিয়া হতে এসেছে। আমার ইচ্ছা হল আমিও "হিচ-হাইক" করে পর্যটন করি। এতে দেখবার সুযোগ আরও হবে। অনেক চিন্তা করে "হিচ-হাইক" করা ঠিক করে বিশ্বমেলা দেখতে গেলাম। নিউইয়র্ক এর বিশ্বমেলা দেখতে আমাদের দেশের দুজন মহারাজা গিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বমেলা দেখার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাঁরা যখন মেলা দেখতেন তখন তাঁদের পেছনে বহু লোক চলত। তাঁরা নূতন ধরনের রিক্শায় বসতেন। তাঁরা ইচ্ছামত জিনিসপত্রও কিনতেন। তাঁদের বদান্যতা এবং মুক্তহস্ততার জন্য লোকে ভারতবাসী মাত্রকে ধনী বলেই কয়েক দিনের জন্য মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্রের আগমনে ভারতের ভয়ানক বদনাম শুরু হল। আমেরিকান পর্যটকদের দেখে পৃথিবীর লোক যেমন ভাবে আমেরিকায় লোক সবাই ধনী, আমাদের দেশের রাজা মহারাজাদের দেখেও পৃথিবীর লোক ভাবে আমরাও সকলেই ধনী। আমেরিকার গভর্নমেণ্ট তাদের দেশে যাতায়াতের যে সব আইন-কানুন করে রেখেছেন, তাতে সেখানে শুধু ধনীদেরই যাওয়া চলে। যারা গরীব তারা সেই অধিকারে বন্চিত।

বিশ্বমেলায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশ থেকেই প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। আমেরিকার প্রত্যেক ষ্টেটও তাদের প্রদর্শনী খুলেছিল। এ

সব ছাড়াও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানা আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকদের কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশের আমোদ-প্রমোদ এবং আমেরিকার আমোদ-প্রমোদে অনেক প্রভেদ আছে। আমেরিকার প্রত্যেক খেলাতে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে বলেই খরচ করতেও সক্ষম হয়। বিশ্বমেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ডুবুরিরা কি করে সমুদ্রের নীচে গিয়ে সেখানে কি আছে দেখে—এমন কি, অনেক সময় সমুদ্রের নীচভাগ সারভে পর্যন্ত করে আসে, আমার তাই দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

একটি কাচের ঘর ক্রেইনের সংগে আঁটা রয়েছে। যখনই চারজন লোক এক শত কুড়ি ফিট জলের নীচে যেতে প্রস্তুত হয়, তখনই তাদের ঐ কাচের ঘরে প্রবেশ করিয়ে এক শত কুড়ি ফিট 'সমুদ্রের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়'। এতে সকলেরই বেশ আনন্দ হয়, যদিও এতে মরণের বেশ সম্ভাবনা থাকে। জীবন-মরণ নিয়ে খেলা করতে যে আনন্দ, তা সকলে পছন্দ করে না, কিন্তু আমার তা খুব ভাল লাগে। পঁচিশ সেন্ট দিয়ে এক শত কুড়ি ফিট নীচে নেমেছিলাম। যতক্ষণ জলের নীচে ছিলাম ততক্ষণ কান দুটা বধির হয়ে ছিল। যখন জলের উপর ভেসে উঠলাম এবং কাচের দরজা খুলে দেওয়া হল, তখন মনে হল নূতন জগতে এসে হাজির হয়েছি। আমাদের দেশে, বিশেষত ইউরোপে এমন অনেক বই আছে—যাতে সাগর সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা লেখা রয়েছে। কিন্তু পাঠকগণ জেনে সুখী হবেন, সোভিয়েট রুশিয়ার ডুবুরিয়া কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশ জরিপ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাতে অনেক পুরাতন যুগের বাড়িঘরের সন্ধান পেয়েছে। সাগর গর্ভে প্রাপ্ত জিনিসগুলি যত্নের সহিত উঠিয়ে, সর্বসাধারণের দেখবার

উপযুক্ত করে কোনও মিউজিয়মে রেখেছে। ডুবুরিয়ার কাজ বড়ই বিপজ্জনক। সোভিয়েট রুশের লোক বিপজ্জনক কাজ করতে একটুও ভয় পায় না।

ভারতবর্ষ যেমন ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায় আমেরিকার লোক বিজ্ঞানের এত উন্নত স্তরে উঠেও তেমনি সেই ভাগ্যের কথা ভুলে নি। যেখানে ভাগ্যের দৌরাত্ম্য সেখানে জুয়া খেলার প্রাবল্য। বিশ্বমেলাও সে দোষ থেকে বন্‌চিত হয় নি দেখলাম। ছোট ছোট ঘর বেঁধে জুয়ার সব আড্ডা হয়েছে। লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের সংগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, জুয়াড়ীদের পকেট খালি। যাদের জুয়া খেলার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে তাদেরও পয়সায় কুলাচ্ছে না। আমেরিকার অর্থ সবসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে আর ছড়ান নাই, আমেরিকার অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অর্থের ধর্মই হল তাই। আমার ভ্রমণ সময়ে তিনটি বিশ্বমেলা দেখেছি। সর্বপ্রথম বিশ্বমেলা দেখেছিলাম ব্রসেল্সে। সেখানে ভারতের কতকগুলি চিত্র দেখান হয়েছিল। সেই চিত্রগুলি কুৎসিত ছিল। যে কোন লোক তা দেখে ভারতবাসীকে বর্ব্বর বলে নির্ধারণ করতে পারত। দ্বিতীয় বিশ্বমেলা দেখলাম নিউইয়র্কে। এটি সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর। এখানে ভারতের কোনও প্রদর্শনী খোলা হয়নি দেখে সুখী হয়েছিলাম।

গ্রেট বৃটেনের পক্ষ থেকে এখানে একটি প্রদর্শনা খুলা হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীর পুরোভাগে একটি গোলকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে কি করে সূর্য অস্ত যায় না তাই দেখান হয়েছিল ; লক্ষ্য করে দেখলাম, অনেক দর্শক এই দৃশ্যটি দেখেই থমকে দাঁড়ায়। দর্শকদের মুখভংগি দেখে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারা যায় তারা যেন এই দৃশ্যটি দেখতে ভালবাসে না। এই দৃশ্যটি দেখার পর প্রত্যেকের মুখেই হিংসার ভাব ফুটে উঠছিল। যারা

সাম্রাজ্যবাদ ভালবাসে তাদেরই এই দৃশ্য দেখে অন্তর জ্বলে, আমার কিন্তু সেরূপ কিছুই হয়নি কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানতাম, সাম্রাজ্য বলে কারো কিছু থাকবে না।

তারপরই ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের বংশ পরিচয়ের চিত্র। জর্জ ওয়াশিংটন নাকি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের রক্তের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; বেশ ভাল কথাই। রাজার রক্তে এবং প্রজার রক্তে প্রভেদ আছে বলে যারা পরোক্ষভাবে প্রচার করে তারা আদীম যুগের লোকের মনোভাব পোষণ করে; রাজা সমাজেরই একজন, তার রক্তের গুণগরিমা এক দিন নির্যাতিত লোক করত। যারা ডিমক্রেট বলে বড়াই করে তাদের পক্ষে রাজার রক্তের পরোক্ষভাবে বাহাদুরী করা পুরাতন বর্বরতাকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি সে দৃশ্যটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর অন্যদিকে চলে গেলাম।

আমেরিকার তরফ থেকে কতকগুলি দ্রব্য একটি ভূগর্ভে রক্ষিত হয়েছিল। কি কি দ্রব্য রক্ষিত হয়েছিল তার লিষ্ট আমার জানা নাই; তবে শুনেছি একখানা বাইবেলও রক্ষিত হয়েছে। আমেরিকার লোকের ঠিক ধারণা রয়েছে পৃথিবীটা একবার লয় হবে এবং এই পৃথিবীই আবার গঠন হবে। বৈজ্ঞানিকদের জানা উচিৎ যা একবার লয় হয় তা আবার সেই আকৃতি এবং প্রকৃতিতে গড়ে উঠে না।

আমেরিকার পল্লীগ্রাম

প্রভাতে উঠে মেলা পিছনে রেখে এগিয়ে চললাম। অনেক গ্রাম পথে পড়তে লাগল। মনে হল আমার গ্রাম দেখা উচিত। তাই গ্রামে গ্রামে সময় কাটাতে আরম্ভ করলাম। ইউরোপের অনেক গ্রাম দেখেছি, কিন্তু আমেরিকার গ্রাম অন্য ধরনের। গ্রামে বিজলী বাতি, গ্যাস, গরম ও ঠাণ্ডা জলের কল, আধুনিক স্বাস্থ্যনিবাস, পেট্রল স্ট্যাণ্ড, হোটেল, রেস্তোঁরা, কেবিন সবই বর্তমান। গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কোলাহলহীন। প্রত্যেক গ্রামে ছোটদের স্কুল এবং বড়দের কলেজ আছে। সব গ্রামই জনবহুল। ছোট গ্রামে শুধু ছোটদেরই স্কুল আছে। আমাদের কলকাতা শহরেও এমন কোনও স্কুল-গৃহ নেই যার সংগে সেসব গ্রামের স্কুল-গৃহের তুলনা করতে পারা যায়। অনেকে বাংলো করে বাস করে এবং সেরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ বাংলো ভারতে কোথাও দেখি নি।

আমেরিকার গ্রাম এবং ইউরোপের গ্রামে অনেক প্রভেদ রয়েছে। ইউরোপের গ্রামের পথগুলি প্রায়ই বাঁকা, ফুটপাথ অপ্রশস্ত, বাড়ীর ভিটি কোথাও বেশ উঁচু আর কোথাও একেবারে নীচে নেমে এসেছে। আমেরিকার পার্বত্য অন্চলে কোনও সময়ে ইউরোপের মতই বাড়ি ঘর এবং বাঁকা পথ ছিল, কিন্তু যখন থেকে ফোর্ড কোম্পানী মাটি কাটার কল তৈরী করেছে, সে সময় থেকে পার্বত্য গ্রামেও সোজা পথ, সমান লেভেলে বাড়ি গড়ে উঠেছে। আমেরিকার গ্রামে নতুনের গন্ধ পাওয়া যায়। ইউরোপের গ্রামে পুরাতনের প্রাধান্য বর্তমান।

আমরা ভারতবাসী, আমরা ইচ্ছা করেই বলব, আমেরিকার গ্রামও একদিন পুরাতন হবে, ইউরোপের গ্রামের মত হবে। আমি বলছি তা হবে না। আমেরিকার গ্রাম চির নতুন থাকবে। হয়ত বর্তমান অবস্থা হতে আমেরিকার গ্রাম আরও উন্নত হবে, কারণ আমেরিকাতে এখনও ধর্মের বদখেয়ালী নাই। ভবিষ্যতে 'অধর্মরূপী ধর্ম' পৃথিবীর উপর তাণ্ডব নৃত্য করতে সক্ষম হবে না।

আমেরিকার গ্রামে ক্রমেই লোক সংখ্যা বাড়ছে। ভবিষ্যতে প্রত্যেকটি গ্রাম শহরে পরিণত হবে। শহরের লোক আনন্দে দিন কাটাবে। ইউরোপের ধরনেই আমেরিকার গ্রাম গড়ে উঠেছে. আমেরিকার গ্রাম কিন্তু ইউরোপের গ্রামের ছাপ প্রায় মুছতে বসেছে। ইউরোপের প্রত্যেকটি গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে একটি চার্চ থাকে। চার্চকে কেন্দ্র করে গ্রামের গঠন হয়। আমেরিকার গ্রামে সেরূপ কিছুই নাই। গ্রামের মধ্যস্থলে বিদ্যালয়, সিনেমা, বিচারালয়, দোকান, বাজার এসব থাকে বটে কিন্তু তাতে গ্রামের সৌন্দর্য্য মোটেই লোপ হয় না, বরং বাড়ে। গ্রামের পাশে গোলাবাড়ি থাকে না, গৃহপালিত জীব দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রাম দেখলেই আনন্দ হয়। আমার আনন্দ হত গ্রোসারী দোকান দেখে। দই, দুধ, ক্রিম, ঘনদুধ, নানারূপ মিঠাই, শাক, সবজী এবং নানারূপ ফল মূল স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখে। এসব দেখে সুখী হতাম কিন্তু ভোগ করার উপায় ছিল না।

প্রত্যেক গ্রামের একটু দূরেই পাইকারী বাজার। পাইকারী বাজারে শুধু দোকানীরাই যায়। দোকানীরা পাইকারী বাজার হতে মাছ, মাংস, সবজী, দুধ, মাখন ইত্যাদি কিনে নিকটস্থ ফেক্টরীতে গিয়ে "ড্রেস" করে। "ড্রেস করার বাংলা শব্দ আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয়নি। হবার কথাও নয়। সেজন্য "ড্রেস" শব্দটি ব্যবহার করলাম। যেদিন আমাদের

দেশ স্বাধীন হবে, পাইকারী বাজার হবে এবং তার কাছে ড্রেস করার ফেক্টরী হবে সেদিন ড্রেস করার বাংলা শব্দ আপনি গড়ে উঠবে। ড্রেস করা কাকে বলে এখন তাই বলছি।

ধরে নেওয়া যাক একজন মাছ বিক্রেতা আধ মণ ওজনের একটা মাছ কিনল। আমাদের দেশ হলে মাছবিক্রেতা শিয়ালদহ হতে সেই মাছটা ঝাকায় করে অন্য কোন বাজারে নিয়ে গিয়ে তাই কেটে বিক্রি করত। আমেরিকায় তা হতে পারে না। ঝাঁকায় করে মাছ সহরের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। মাছবিক্রেতা নিকটস্থ ফেক্টরীতে যেতে বাধ্য এবং সেখানে গিয়ে সে মাছটাকে তার ইচ্ছা মত কাটবে আইস ছাড়াবে, ধুয়ে পরিষ্কার করে, জল নিংড়িয়ে ফেলবে, তারপর ওয়েল পেপারে পেক করে খুচরা বাজারে নিয়ে আসবে। ক্রেতা সেই মাছ আর না ধুয়েই কড়াইএ চড়াতে পারে। ক্রেতাকে মাছ কেনার পর বাড়িতে এসে কাটতেও হয় না ধুইতেও হয় না। অন্যান্য জিনিসও ঠিক সে রকমেই ছোট বাজারে আনতে হয়।

ইংলণ্ডে আস্ত গরু, শূকর ঘরের ভেতর বিক্রয়ার্থ টাংগিয়ে রাখা হয়। অনেক সময় ভেড়ার হাড় সমেত মাংসও দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার কোথাও সেরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। আপার সারকুলার রোডে অথবা হগ্ মার্কেটে ইংলণ্ডের নমুনা সকলের চোখেই পড়ে অনেকেই সেদৃশ্য এড়িয়ে যান, অনেকে মুখ হতে থুথুও ফেলেন, কিন্তু "বিলেত ফেরতা" বাবুদের ইংলণ্ডে সেরূপ দৃশ্য দেখে থুথু অথবা মুখ ফেরাতে দেখিনি। আমেরিকায় সেরূপ দৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। আমাদের দেশে যে সকল গৃহপালিত জীবকে হত্যা করা হয় তা শহরের ভেতর দিয়ে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আমেরিকায় তা কখনও হতে পারেনি, ভবিষ্যতেও হতে পারবে না। কশাইখানা সর্বদাই গ্রাম

অথবা শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সেখানে আজকাল মোটর যোগে জীবকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হয়। মোটরের যখন ব্যবস্থা ছিল না তখনও গ্রামের ভেতর দিয়ে কশাইখানাতে গৃহপালিত জীব নিয়ে যাওয়া হ'ত না।

আমেরিকার পত্তন হতেই কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল যা পুরাতন মহাদেশে প্রচলিত ছিল না। পুরাতন মহাদেশের শহর অথবা গ্রাম দেখলে মনে হয় যেন সবই দোকান, সবই বাজার কিন্তু আমেরিকায় তা নাই। শহরের অন্তস্থলে নীরবতা বিরাজ করছে। যে স্থানে বাজার, বিচারালয় এসব রয়েছে সে স্থানকে বলা হয় ডাউন্ টাউন। ডাউন টাউন ছেড়ে দিয়ে কয়েক ব্লক অগ্রসর হলেই গ্রাম্য ভাব দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যই আমেরিকার গ্রাম ইউরোপের গ্রাম হতে অনেক সাজানো এবং আরামপ্রদ।

এসব দিক দিয়ে গ্রামগুলি বাস্তবিক সুখের। কিন্তু আমার কাছে একটি কারণে তা বিশ্রী মনে হতে লাগল। গ্রামের লোক নিগ্রো এবং হিন্দুকে একই চক্ষে দেখে, সেজন্য কোনও হোটেলে তাদের স্থান দেয় না, এমন কি অনেক সময় বিপদ আপদে সাহায্যের কথাও ভুলে যায়। অনেক বক্তৃতা করলে, অনুনয় বিনয় করলে হয়ত কারও দয়া হয়, নয়ত নিগ্রোদের মতই আমাদেরও সংবর্ধনা হয়ে থাকে। ছোট ছোট গ্রামে নিগ্রোদের থাকার জন্য কোনও কেবিন নাই। এই রকম ছোটখাটো অভাব আমাকে বিব্রত করে তুলছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আজই সাইকেলটাকে ট্রেনে অন্যত্র পাঠিয়ে দিই কিন্তু তা করলাম না। আমি নিগ্রো গৃহস্থের বাড়ি খুঁজে তাদেরই মধ্যে থাকতে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য—অন্তত পক্ষে কয়েকখানা গ্রাম দেখে এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া। সাইকেলে লেখা ছিল "হিন্দু-ট্রেভালার", তাতে

কাগজ এঁটে দিলাম। লোকে আর বুঝতে পারছিল না আমি কোথাকার লোক। এতে আমার অসুবিধা মোটেই হয় নি। কেউ কোনও প্রশ্ন আমাকে করত না, আপন মনেই দিন কাটাতাম। শেষে ব্রিংহামটন নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের কাছে এসে বেশ বড় এক নিগ্রোপল্লী পেলাম; এবং তাতে কয়েক দিন থাকব ভেবে একটা হোটেলে স্থান নিলাম।

নিগ্রোদের মধ্যে বসে সময় কাটান একটা কষ্টকর কাজ। এদের মাঝে আমোদ-প্রমোদের কথাই বেশী। খেলার কথা নিয়ে তর্কাতর্কির সময় এদের মধ্যে ছুরি আর পিস্তলও চলে। সিনেমার কথাটা বড় উঠে না, কারণ যতগুলি অভিনেতা অভিনেত্রী নিগ্রোদের মাঝে হয়েছে তাদের কখনও নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। জো লুইকে নিয়েই যা তাদের বাহাদুরি। রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ে তারা আলোচনা করতে মোটেই পছন্দ করে না। মাঝে মাঝে ধর্ম নিয়ে বেশ আলোচনা করে। যখনও অবতারদের নিয়ে কথা হয় এবং তাদের আদিপুরুষ কে তা খুঁজে পাওয়া যায় তখনই তারা ভগবানের তত্ত্বকথায় ফিরে আসে। ক্লাবে বসে যখন তারা এসব কথা আমার সামনে বলত, আমি নীরব থাকতাম। আমি যে একজন পর্যটক এবং পর্যটকদের কাছে যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, সে ধারণা তাদের মোটেই ছিল না। এদিকে আমি এমন কোনও উপলক্ষ খুঁজে পেলাম না, যাতে করে এদের সংগে কোনও কথা বলতে পারি।

এমনি করে একটি দিন কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন ক্লাবে বসে একটা বই পড়ছি, এমন সময় বাইরে-রাখা সাইকেলটা একটি শ্বেতকায়ের চোখে পড়ায় তিনি ভিতরে এসে আমার সন্ধান করতে লাগলেন। আমার পোষাক দেখে কেউ ধারণা করতে পারত না যে আমি পর্যটক; কারণ আমি মামুলী পোষাক পরতেই ভালবাসতাম এবং এখনও তাই

ভালবাসি। সাদা লোকটি অনেক জিজ্ঞাসা করে আমার খোঁজ পেয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে আমার সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সংগে কথোপকথনের পর মিনিট দশেকের মধ্যে ক্লাবের হলে যারা উপস্থিত ছিল তাদের নিয়ে একটা শ্রোতৃমণ্ডলী তৈরি করা হল। আমি তাদেরই কথা তাদের কাছে বলতে আরম্ভ করলাম। আমেরিকান লোকটি কাগজে ঢাকা সাইকেলের লেখা না ছিঁড়েও আমার সন্ধান করেছিলেন আর যাদের মাঝে আমি বসে রয়েছিলাম তারা আমরদিকে চেয়েও দেখেনি, আমার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই তাদের মনে জাগে নি। নিগ্রো এবং আমেরিকানে এখানেই প্রভেদ।

মাসের শেষ। আমাদের দেশেও মাসের শেষ হয়, মাসের আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে এ দুটা সময় শুধু শহরেই অনুভূত হয়, গ্রামের লোক অনেক স্থলে কোন্ মাস এল আর কোন্ মাস গেল তার বড় একটা সন্ধান রাখে না। আমেরিকার গ্রামে মাসের শেষ হওয়ার সংবাদ সকলকেই রাখতে হয়। ঘরের ভাড়া দেওয়াটা অবশ্যকর্তব্য। গ্রামে ভাড়া ইত্যাদি দেবার সপ্তাহিক প্রথা নাই, গ্রামে আছে মাসিক ভাড়া দেবার প্রথা। মাসের শেষে ভাড়া দিতে না পারলে মালিক এসে পুলিসের সাহায্যে ভাড়াটেকে ঘর থেকে বার করে দেয়। ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবা নূতন ঘরের অন্বেষণে বার হয়েছে, পুলিস আইন বজায় রাখতে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এরূপ দৃশ্য গ্রামে মাসের শেষে বিরল নয়। গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামের মালিক নয়। Real Estate Owner বলে এক রকমের কোম্পানি আছে, তারাই হল গ্রামের মালিক। তবে দু-এক জনের বাড়ি যে নাই তা নয়. রিঅ্যাল এস্টেট ওনার কোম্পানিই বর্তমানে আমেরিকার গ্রামে গ্রামে প্রাধান্য লাভ করছে। আমার মনে হয়,

এরূপভাবে আর কিছুদিন গেলে আমেরিকার গ্রামগুলি রিঅ্যাল এস্টেট কোম্পানিরই হাতে চলে যাবে। গ্রামের লোক হবে প্রলিটারিয়েট। ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রলিটারিয়েট-এর সংখ্যাবৃদ্ধি মনে হয় সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রসার নয়তো নাৎসীবাদের দমননীতির আওতায় সমাজকে নিয়ে আসা। আমেরিকার গ্রাম দেখে আমার ভয় হল, মনে হল দেশটা এক অন্তর্বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গ্রামের লোক পরিবর্তনের পথ চেয়ে বসে আছে। যে কোনও রকমে যে কোনও পরিবর্তন আসুক না কেন, মনে হয় গ্রামের লোক সাদরে তা গ্রহণ করবে। আমেরিকার মেরুদণ্ড গ্রামের কথা ওয়াল্‌স্ স্ট্রীটের কর্তারা যে সংবাদ রাখেন না, তা নয় তবে শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখবার চেষ্টা করেন।

নিগ্রো বাসিন্দাদের মাঝে ঘর ছেড়ে দেওয়া বা নূতন করে ঘর নেওয়ার কোনও চিন্তা নাই। তারা দৈনন্দিন দাস্যবৃত্তি করে কায়ক্লেশে যা পায় তাই দিয়ে ঘরের মালিকের মুখ বন্ধ রাখে, খাবার এবং পোষাকের প্রতি দৃষ্টি না রেখেই দিন গুনে যায়। একে জীবন বলা যেতে পারে না, একে বলা যেতে পারে নামরা পর্যন্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রটাকে চালু রাখা। এই অবস্থায় থেকেও এরা নিজেদের সুখী মনে করে, দিনটা কাটলেই যেন সকল বালাই চুকে গেল।

নিগ্রোপল্লী থেকে শ্বেতকায় পল্লীতে যাবার নিমন্ত্রণ হল। নিমন্ত্রণ মানে কথা বলবার এবং কথা শোনবার নিমন্ত্রণ। যখন ওদের পাড়ায় গিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম, ওরা দেখল আমি নিগ্রোদের মত কোন ভাবভংগী দেখাচ্ছি না, ওদের অন্যান্য মানুষের মতই গণ্য করে কথা বলতে আরম্ভ করেছি, তখন ওদের মাঝে সান্ত্বনা এল, বুঝল হিন্দুস্থানের হিন্দু তাদের সমকক্ষ। মানুষের মন দুর্বলতায় ভরতি।

একটু সমবেদনা পেলেই দুর্বল আপন হৃদয়ের দরজা খুলে দেয় ; যেখানে তার যত ক্ষত তা দেখিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করে প্রতিকারের কথা। সাদা পল্লীর লোক ভবিষ্যৎ যুদ্ধ এবং সে সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পরিবর্তন আসবে কিনা—এই প্রশ্নের উপরেই তারা জোর দিল বেশী। কিন্তু আমি একজন পর্যটক মাত্র। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনতে পারি, হয়ত সমবেদনাও জানাতে পারি কিন্তু প্রতিকার করতে পারি না। হয়ত আমি বর্তমান জানি, বর্তমানের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের কথা বলতেও পারি, কিন্তু সেটা হবে আমার একটা অভিমত মাত্র।

দেখলাম গ্রামে নগরে সর্বত্র সমানভাবে অভাবের আক্রমণ শুরু হয়েছে। যারা পারছে তারা নানামতে তার প্রতিবিধান করছে, যারা পারে না তারা অসহায় ক্লান্ত বৃদ্ধের মত পথের পাশে দাঁড়িয়ে পথের দৈর্ঘ্যের সংবাদ লোককে জিজ্ঞাসা করছে। তবু আমেরিকা ধনকুবেরের দেশ। ধনীর দেশের লোকেরও এরূপ অবস্থা দেখে বাস্তবিক আমার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল।

এরূপ কষ্টের মধ্যে থেকেও গ্রামের লোক চুপ করে কেন থাকে সে কথাটা তলিয়ে দেখা সমূহ দরকার। আমেরিকার ধনীরা বেশ ভাল করেই জানে, যদি গ্রামের লোকের প্রতি অত্যাচার করা হয় তবে বিদ্রোহ অনিবার্য। কিন্তু বিদ্রোহ হয় না। ধনীরাই বিদ্রোহ করতে দেয় না। সি, আই, ও গিয়ে গ্রামের লোকের সাহায্য করে। ফেডারেসন অব্ লেবার প্রতিবন্ধক জন্মায়। কেউ দিতে যায় আর কেউ অপহরণ করতে যায়। যারা দিতে যায় তারা দিয়ে আসে, আর যারা অপহরণ করতে যায় তারাও অপহরণ করতে সক্ষম হয়।

সি, আই, ও সর্বসাধারণের অভাবের কথা অবগত হয়ে তাদের

অভাব মিটাবার চেষ্টা করে। ফেডারেসন অব্ লেবার সর্বসাধারণের সংগে সম্পর্ক না রেখে, সর্দার মজুরদের ঘুষ দিয়ে মজুরে মজুরে যাতে বিবাদ হয় তারই চেষ্টা করে। সর্দার মজুরের যখন পেট মোটা থাকে তখন সে সাধারণ মজুরের দাবী ভুলে গিয়ে আরাম করে। ফেডারেসন অব্ লেবারও একটি মজুর প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি মজুরের হিত না করে অহিতই করে বেশি। মজুর হয়ে মজুরের কেন অনিষ্ট করে সেকথাটা জানতে হলে আরও একটু গভীর জলে ডুব দিতে হবে। আমি এত গভীর জলে পাঠক শ্রেণীকে টেনে নিব না।

গ্রামের মামুলী একটা আভাষ পেয়েই মনে হল এমন করে যদি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই, তবে আমার সমূহ ক্ষতি হবে। তাই সাইকেলখানা ট্রেনযোগে ডিট্রয় পাঠিয়ে দিয়ে হিচ্ হাইক্ করার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রথম দিন হিচ হাইক্এর স্বাদ মোটেই অনুভব করতে পারিনি, কারণ গ্রামবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন আমি একজন পর্যটক, আমি তাদের দেশের হবো নই। পর্যটকের সম্মান সভ্যদেশে সর্বত্র বিরাজমান। তাই গ্রামবাসী মোটরকারে করে আমাকে ব্যাফেল পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম এরূপ করে ভ্রমণ করা কি আমার পক্ষে উচিত? পৃথিবীর প্রত্যেক ধূলিকণা আমার ভ্রমণের সাক্ষী থাকবে কিন্তু আমেরিকার ধূলিকণা ত দূরের কথা একটি লোকও আমার ভ্রমণের সাক্ষী থাকবে না। যেইমাত্র এই কথা মনে আসা অমনি স্থির করলাম আমার পক্ষে মোটরে আরাম করে বসে থাকা উচিত নয়, নেমে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। আমি মোটর হতে নেমে পড়লাম।

মোটর গাড়ি হতে নেমে আমি দাঁড়ালাম পথের পাশে। আমার

সামনা দিয়ে অনেক গাড়ি চলে যাচ্ছিল। অনেকে ভদ্রতা করে আমাকে তাদের সংগে যেতে ডাকছিল কিন্তু আমার মন কিছুতেই কারো সংগে যেতে চাচ্ছিল না। যখন নিউইয়র্ক-এ ছিলাম তখন যারা আমার সংগে অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা বলতে আসত তাদের দস্তুর মত গাল দিয়ে বিদায় করে দিতাম, কিন্তু আজ আমারই মনে সেই ভূয়া অধ্যাত্মতত্ব জেগে উঠল কি? যে কোন প্রকারেই হউক আজ আমি পথে দাঁড়িয়ে পথের সৌন্দর্যই দেখব।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার আসল। আকাশে তারকারাজি ফুটে উঠল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস বইতে লাগল। দু একটা মোটরকার ফুস্‌ফাস্‌ করে চলে যেতে লাগল। সত্তর আশি মাইল যে মোটরকার ঘণ্টায় চলে তাদের ফুস করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কি বলা চলে?

আমাদের দেশের লোকের আমেরিকার 'হবো'দের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। আমেরিকাতে হবোরা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আমাকেও অনেকে অনেক সময় ভুল করে হবো ভাবত। আবার যখনই বুঝেছে আমি হবো নই তখনই সম্মান এবং ভালবাসা দেখাতেও কসুর করে নি। আমেরিকাতে অনেক ভাবপ্রবণ যুবক পথের ডাক শুনে হঠাৎ বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করে পথে বেরিয়ে যায়। ভাবপ্রবণতা অনেক সময়ই ভুল পথে পরিচালনা করে। আমেরিকার যুবকগণ খামখেয়ালী করে যখন পথে বেরিয়ে পড়ে তখন তাদের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। তবে পথে বেড়িয়ে কি লাভ হবে? কোনো উদ্দেশ্য না দিয়ে যদি খামখেয়ালী করেও পথে বেরিয়ে পড়া যায় এবং কয়েকদিন পর দেশ পর্যটনের একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে লোক সমক্ষে তা ধরা যায় তবুও কোনমতে অনেকদিন বেড়িয়ে আসা যায়। আমেরিকাতে যে সকল যুবক পথে বের হয় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে

এড্ভেনচার করা এবং সেই প্রত্যক্ষ এড্ভেনচার থেকে বই লেখা। দুঃখের বিষয় আমেরিকাতে সেরূপ বন জংগল নাই, আফ্রিকাতেও বন জংগল শেষ হতে বসেছে, অতএব কল্পিত এড্ভেন্চারের বই পাঠ করে যারা হবো হয় তারা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

১৯৩১ সালের জুন মাস হতে ক্রমাগত ভ্রমণ করে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আমি ভ্রমণ করেছি। এই সময়ের মাঝে অনেক আপদ এবং বিপদ এসেছিল। আপদ বিপদের করা বেশি লেখা হলে আসল কথায় ফাঁকি দিতে হয় সেজন্যই নিজের সুখ দুঃখের কথা মোটেই লেখতে প্রয়াসী হইনি।

আজকের আমেরিকায়, আমেরিকার কথা বলাই ভাল। আমেরিকাতেও আমার আপদ বিপদ ঘটেছে। সংক্ষেপে একটি ঘটনা বলব। একদিন একটি সভাতে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম এবং সেই সভায় যাওয়া ও ঠিক হয়েছিল। মিঃ ওডাইয়া নামক একজন পারসী ভদ্রলোকের রেঁস্তোরা হতে বের হয়ে পথে এসে সভাতে কি বলব তারই কথা ভাবছিলাম।

অভ্যাস মত পথ চলছিলান। লাল রংগের বাতিগুলি যখন প্রজ্জলিত হয়ে উঠে তখন পথ অতিক্রম করতে হয়। নীল বাতি প্রজ্জলিত হলে দাঁড়াতে হয়। একটা পথের সামনে এসে (বোধহয় মেডিশন এ্যাভিনিউই হবে) দেখতে পেলাম অন্যদিক দিয়ে লাল বাতি প্রজ্জলিত হয়েছে। এবং আমি যে দিকে যাব সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। কি ভেবে একটু দাঁড়ালাম এবং সামনার উইন্ডো সো দেখে যে মুহূর্তে পথে আসলাম অমনি পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাঁ দিক থেকে একখানা মোটরকার হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটি যদি কসে ব্রেক না টানত তবে সেদিনই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত। অবশ্য

আমার অসাবধানতার জন্য বেশ গাল শুনতে হয়েছিল। বেঁচে গেছি বলেই আমি সুখী হয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি এই ছোট বিষয়টিকে ফেনিয়ে বড় করে লেখে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে হবে।

হবোরা কিন্তু এ ধরণের খাঁটি এড্‌ভেনচারই লোকের কাছে বলার জন্য পিপাসু হ'ত কিন্তু এরূপ এড্‌ভেনচার কি সকল সময় ঘটে? এরূপ এড্‌ভেনচার খুঁজতে গেলে মরণেরও সম্ভাবনা থাকে। আমেরিকার দুষ্ট লেখকগণ সরল সচ্চরিত্র যুবকদের বিপথগামী করে খাঁটি থ্রিলিং গল্প পাবার জন্য ফরমাইস দিয়ে অনেক যুবককে পথে টেনে নিয়ে আসত। অবশ্য এখন সেরূপ বিপথগামী হবো খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

হবোরা প্রথম যখন পথে বের হয় তখন তাদের থাকে একটা সৎ উদ্দেশ্য, কিন্তু কয়েকমাস পর যখন কোন উদ্দেশ্যই সফলতার দিকে অগ্রসর হয় না তখন তারা বিগড়ে যায় এবং অন্যায় পথ অবলম্বন করে। কোনমতে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়াই হয়ে যায় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমেরিকাতে কোনমতে জীবন কাটান বড়ই কষ্টকর বিষয় সেজন্যই হবোদের কেউ পছন্দ করে না, পারলে বেকার বলে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। সেরূপ হবো আমাদের দেশে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় অবশ্য আমাদের দেশের হবোদের জেলেও যেতে হয় না, খাদ্যের অভাবেও কষ্টও পেতে হয় না। তারা হল সাধু। সাধুদের আমরা প্রতিপালন করি পাপ হতে মুক্ত হবে বলে। অনেক বিদ্বান লোক সাধুসেবা করে ধন্য হন কিন্তু এই অশিক্ষিত বিদ্বানের দল জানেন না এরাও আমেরিকার হবোদের মত জেলে বাস করারই উপযুক্ত। ভারতের হবোরা পথে বের হয় ভগবানের ডাকে, আর আমেরিকার হবোরা পথে বের হয় পথের ডাকে। উভয় দেশের হবোদের মাঝেই পথে বের

হবার বেলা চিত্তের বিকার হয় এবং উভয় দেশের হবোদেরই যখন চিত্তচান্‌চল্য ঘটে, তখন বিপথগামী হয়। তবে দুঃখের বিষয় আমেরিকার হবোদের সর্বসাধারণ ঘৃণা করে এবং তাদের জেঁলে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে। আর ভারতের হবোরা ভারতের সর্বসাধারণের মাথায় নারিকেল ভেংগে তাই ভক্ষণ করে আনন্দে জীবন কাটায়। আজ আমার জীবনেও যেন আমেরিকার হবোদের ভাবই ফুটে উঠল। গভীর রাতের ঠাণ্ডাকে অবহেলা করে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। নিদ্রা বেশ হল। ঘুম থেকে উঠে মনে হল দুর্বলের একমাত্র অস্ত্র হল হুকুম তামিল না করা, কিন্ত আমি দেখছি দুর্বল হতেও অধম। প্রকৃতির আদেশের তাবেদারী করছি। কেন আমার শরীরে ঠাণ্ডা লাগবে? উত্তম ঘরে উত্তম বিছানায় শোয়াই হল প্রকৃতির আদেশ অমান্য করা, মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া। তা যদি না হত তবে আমাতে আর বন্য পশুতে অথবা অসভ্যদের মাঝে পার্থক্য কি?

মলিন মুখে উঠে দাঁড়ালাম। পথে এসে দাঁড়ালাম এবং একটি মোটরের চালককে ইংগিত করা মাত্র সে আমাকে তার মোটরে উঠিয়ে নিল। কোনো হবোকে কেউ মোটরে উঠিয়ে নেয় না কিন্তু যারা হিচ্‌ হাইক্‌ করে তাদের অনেকেই সাহায্য করে। কারণ সাহায্যকারী অবগত আছে এই লোকটি দায়ে পড়েই সাহায্য নিচ্ছে, অন্যথায় কখনও সাহায্য নিত না। আমার সাহায্যকারী আমাকে ব্যাফেল পৌঁছে একটি হোটেলের সামনে নামিয়ে দিলেন। আমি আমার সাহায্যকারীকে সেদিন ধন্যবাদও দেইনি কারণ আমার মন হোটেল সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল। চিন্তাস্রোতে ভাসতে ভাসতে হোটেলে গেলাম। হোটেলে স্থান পেলাম। স্নান করে খেয়ে যখন রুমে শুতে যাচ্ছি তখন একজন বলল, "এ লোকটা কে হে, স্পেনিস হবো নয়ত?" অন্য জন জবাব

দিল লোকটাকে স্পেনিস বলে মনে হয় না, তবে নিগ্রো নয় এটা নিশ্চয়, আর হবো ত নয়ই।

যখন আমার ঘুম ভাংল তখন পরের দিনের বিকাল বেলার তিনটা বেজেছিল। হোটেলের কেউ আমার ঘুম ভাংগায়নি নিজেই জেগেছিলাম। বিকাল বেলা ফের স্নান এবং খাওয়া সমাপ্ত করে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

সারাটি বিকাল বেড়িয়ে এসে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন যে ভদ্রলোক আমাকে মোটরে করে পথ থেকে নিয়ে এসেছিসেন, হঠাৎ তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম জন হার্টস এবং তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকতে আমাকে অনুমতি দিলেন। আমিও আমার নাম ধরে ডাকতে তাঁকে অনুমতি দিলাম। অবশ্য নামটাকে ছোট করে বললাম আমার নাম 'রাম'। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব পেকে উঠল এবং মিস্টার হার্টস্ আমাকে নিয়ে ডিট্রয় যাবেন বলে স্বীকার করলেন। হার্টস্ একজন বেকার যুবক। তাঁর সংগে চুক্তি হল, আমি মোটরের পেট্রল খরচ বহন করব এবং তিনি মোটর চালাবেন। পথে অন্য যা কিছু খরচ হবে তা দুজনে সমান ভাগে বহন করব।

আমার নিউইয়র্ক-এর বন্ধুগণের সংগে তখনও দেখা হয় নি। হার্টস্‌কে বলেছিলাম, হয় তিনি আমার হোটেলে চলে আসুন, নয় ত আজ থেকে ছয়দিন বাদ দিয়ে সপ্তম দিনে এসে আমার সংগে দেখা করুন। এর মাঝে আমার নায়গ্রা প্রপাতও দেখা হয়ে যাবে।

আমেরিকায় ওয়াই. এম. সি-কে ওয়াই বলা হয়। হার্টস্ সেখানে গেলেন। সেখানে আমার মত ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ। চিকাগো, সল্টলেক্ সিটি, স্যানফ্রানসিসকো এবং লস্-এ্যান্‌জেল্‌স্‌এর

ওয়াই দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ওয়াই এক জাতীয় হোটেল বিশেষ। তাতে পুরুষ মাত্রেই থাকতে পারে। ওয়াই দু রকমের। একটা হল শ্বেতকায়দের জন্য, অন্যটা হল কালোদের জন্য। ব্যবসায়ের হিসাবে ওয়াই এর ব্যবসা বেশ লাভজনক। ওয়াই সম্বন্ধে এর বেশী যদি কিছু বলতে হয়, তবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবার সম্ভাবনা। অতএব এ সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভাল।

আমার নিউইয়র্কের সংগীরাও ওয়াইতেই থাকতেন। আমাকে নিগ্রো হোটেলগুলিতে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় সাদা হোটেলে খুঁজতে আরম্ভ করে আমার সাক্ষাৎ পেলেন। আমাকে পেয়ে তাদের কি আনন্দ। সাদায় কালোয় যে কত অন্তরংগতা হতে পারে তা তখনই মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম। ওদের সংগে বিশেষ ঘনিষ্টতা থাকায়, অনেক দিন পর দেখা হল বলে তারা হেসে এবং চীৎকার করে রুমটাকে মাথায় তুলতে লাগল। কিন্তু তারা যখন আনন্দ করছিল তখন আমি মনের দুঃখে হাসতেও পারছিলাম না। অবশ্য সেজন্য তাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

আমি তাদের বলেছিলাম, "বন্ধুগণ, আমার ভাবান্তরে আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি আজ অন্য কথা ভাবছি। আপনাদের দেশে যেমন নিগ্রোদের প্রতি সামাজিক অত্যাচার হয়, ঠিক সেইরূপই আমাদের দেশেও অনেকেরই প্রতি সেরূপ সামাজিক অত্যাচার হয়। তার প্রতিকার করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। কেন জানেন? যাকে আপনারা ডিমোক্রাসি বলেন, আর আমরা যাকে গণতন্ত্র বলি, আসলে তা কিছুই নয়। আপনাদের সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু আপনারা যে পর্যন্ত না আমাকে হিন্দু বলে আপনাদের সমাজে পরিচয় করিয়ে দেবেন সে

পর্যন্ত আপনাদের সমাজে আমার স্থান নাই। কি করে এই পাপ পৃথিবী থেকে দূর হয় তাই আমি মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ভাবি। আমার দেশে আমার সামাজিক স্থান তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের মাঝেই। যদি আফ্রিকা ও আপনাদের দেশ পর্যটন না করতাম, তবে এরূপ চিন্তা আমার মাথায় আসত না। মোগল সম্রাট, পাঠান সম্রাট আমাদের দেশ শাসন করেছেন, কিন্তু এখনও তাঁদের বংশধররা সর্বত্র স্পৃশ্য নন। এই বর্বরতায় তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করেন নি, লুটিয়ে রাজত্ব করতেই ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু সে ছিল এক যুগ, এখন নবযুগ এসেছে। এই নবযুগেও, বলতে গেলে নবযুগের অগ্রদূত সভ্য আমেরিকাবাসীদের মধ্যেও, ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক বর্বরতা বর্তমান দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।"

তাদের সংগে কথা হল আমি একা যাব 'নায়গ্রা ফল্‌স্' দেখতে। নায়গ্রার মত এত বড় একটা পরিব্রাজকের তীর্থেও বর্ণবৈষম্য মানা হয় কি না দেখব। পরদিন প্রাতে বাসে গিয়ে বসলাম। যে সকল বাস নায়গ্রায় যায় তাদের 'স্ট্যাণ্ড' শহরের বাইরে। বাস প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর ছাড়ে। সেখান হতে বাসের ভাড়া কুড়ি সেণ্ট। আমাকে বাসে বসতে দেখে অনেকেই পরের বাসের অপেক্ষায় রইল। আমি একা। এদিকে বাস ছাড়বার সময় হয়ে গেছে কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কোনও প্যাসেন্‌জার বাসে উঠেনি। অগত্যা আমাকে নিয়েই বাস ছাড়তে বাধ্য হল। কনডাক্টরকে জিগ্যাসা করলাম, "আমি একা চলেছি, অন্যান্য যাত্রীরা আমার জন্যেই বাসে উঠেনি, সেজন্যে কি আমাকে বেশী কিছু দিতে হবে।" কনডাকটর বলল, "আজকে আপনাদের লোক (মানে নিগ্রো) এদিকে বড় বেশী আসে নি, তাই এমন হয়েছে, নতুবা আমাদের ক্ষতি বড় একটা হয় না। অবশ্য পথে

অন্য যাত্রী পাব, তারা আপনার বসার জন্যে কিছুই মনে করবে না।" কথাটা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ আমার কাছে সামান্য অর্থ-ই ছিল।

পথে অন্যান্য যাত্রী উঠল। কেউ আমার গা ঘেঁসে বসল না। প্রত্যেকটি আসনে দুজন করে বসা যায়। স্থানাভাবে অনেকে দাঁড়িয়ে রইল, তবুও আমার পাশে কেউ বসল না। মনে মনে ভাবলাম, বর্বরদের মত বর্বর হয়ে লাভ নাই, আমিই উঠে দাঁড়াই। উঠে দাঁড়ালাম। দুটা বর্বর আমার পরিত্যক্ত স্থান দখল করল। অমনি তাদের গিয়ে বললাম, এখানের একটা সিট আমার, আপনাদের একজনকে দাঁড়াতে হবে। নীরবে দুজনেই উঠে দাঁড়াল। আমি ফের গিয়ে সিটএ বসলাম। এই দৃশ্যটি অনেকেরই চোখে পড়ল কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করল না। আমিও চিন্তিত মনে আকাশ ভরা মেঘমালার দিকে তাকিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম।

নায়গ্রা প্রপাত

বাস একটা প্রকাণ্ড সাগর তুল্য হ্রদের তীর দিয়ে চলছিল। হ্রদের মাঝে কবি-বর্ণিত নির্মল জলের অভাব। জল ধূসর বর্ণের। হ্রদের তীরে নানা রকমের এলোমেলো বাড়ি ঘর। দেখলেই মনে হয় এদিকে আমেরিকার ইন্‌জিনিয়ারদের দৃষ্টি পড়ে নি। এককালে রেড ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচার এদিকে বেশই হয়েছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এককালে যেমন করে গৃহসজ্জা করতে হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও বর্তমান রয়েছে। কেন যে আমেরিকার ইন্‌জিনিয়ারগণ এদিকে হাত বাড়াতে পারেন নি, তা নিয়ে মনে মনে অনেক ভাবলাম, কিন্তু উপসংহারে আসতে পারলাম না।

বাস ক্রমাগত চলছে। বাসের গতি ঘণ্টায় মাত্র পনের মাইল। এত আস্তে যাবার কারণ, পর্যটকদের হ্রদের সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ দেওয়া। বাস কোম্পানি সাধারণের সুবিধার দিকে বেশ দৃষ্টি রাখেন। তাঁরা যেমন অর্থ উপার্জ্জন করেন, তেমনি যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। বাস নায়গ্রা শহরের গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানীর স্টেশনে এসে হাজির হল। নিগ্রো কুলীরা প্রত্যেকের লাগেজ বার করে নিয়ে লাগেজরুমে রাখল। প্রত্যেকেই লাগেজের রসিদ নিয়ে নিজের নিজের লাগেজ মুক্ত করে যে যার পথ ধরল। আমার কোনও লাগেজ ছিল না তাই আমি পথে এসে দাঁড়ালাম। ইচ্ছা রাত্রি কাটাবার জন্যে সর্বপ্রথম একটা হোটেল ঠিক করে একটু আরাম করি, তারপর নায়গ্রা প্রপাত দেখতে যাই।

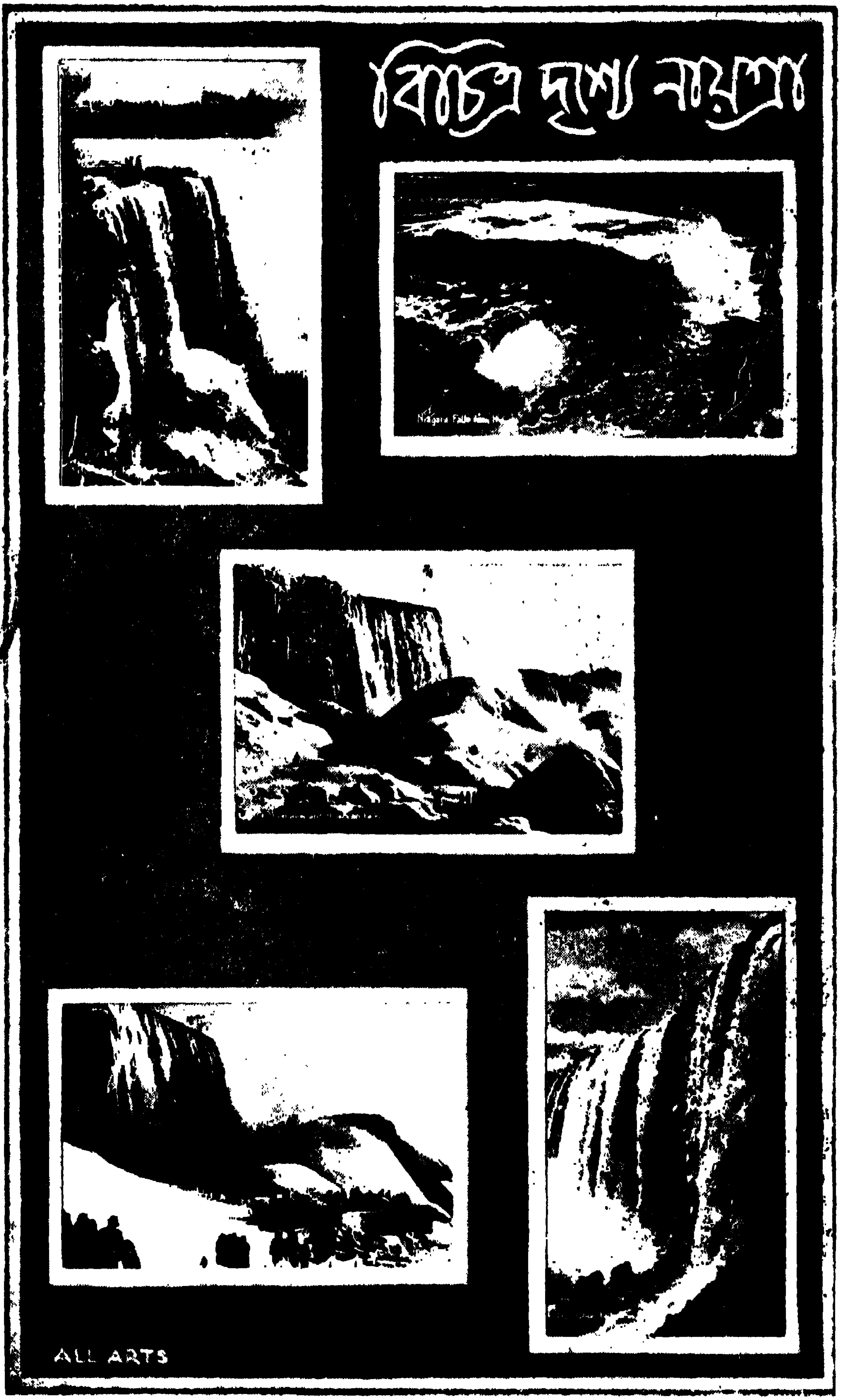
বিচিত্র দৃশ্য নায়গ্রা
ALL ARTS

নায়গ্রা শহরটাই হল কতকগুলি হোটেল নিয়ে গঠিত। অনেক হোটেলে গেলাম। সব হোটেলেরই ম্যানেজার স্থান নেই বলে আমাকে বিদায় করে দিল। তারপর আমি হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে অনেক হোটেলের ম্যানেজারের কাছে ঘর পাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতেও কেউ আমাকে স্থান দিল না। অর্থাৎ টাকা দেখিয়েও ঘর পাওয়া সম্ভব হল না। অনেক কষ্ট করে অবশেষে একটি নিগ্রো হোটেল খুঁজে বার করলাম। হোটেলের মালিক আমাকে পেয়ে বেশ আনন্দিত হল এবং আমার থাকার জন্য একটি রুম দেখিয়ে দিল।

রুমের ভাড়া প্রত্যেক রাত্রির জন্য দেড় ডলার করে (প্রায় সাড়ে চার টাকা) দিতে হয়েছিল। ঘরের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একটু আশ্বস্ত হলাম। হোটেলের মালিক আমার পরিচয় পেয়ে বড়ই দুঃখিত হল। সে আমাকে রাত্রে তার রেস্তোঁরায় খাব কি না জিজ্ঞাসা করল। আমি রাজি হলাম না, কারণ সাদা হোটেলের খাবার ভাল এবং সস্তা। উপরন্তু তারা আমাকে রেস্তরাঁয় ঢুকতে নিষেধ করে না। আমাকে রেস্তরাঁয় প্রবেশ করতে নিষেধ করে না শুনে হোটেলের মালিক একটু আশ্চর্য বোধ করল। আমি তাকে বললাম, "তোমরাও যদি আমার মত সাহস করে রেস্তরাঁয় গিয়ে খাবার দিতে আদেশ কর তবে হয়ত তোমরাও খাবার পেতে পার। দাবি করবার শক্তির তোমাদের অভাব।" হোটেলের মালিক এ কথারও কোনও জবাব দিল না, শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভগবানের উপর দোষারোপ করল। আমি আর কোনও কথা না বলে নায়গ্রা প্রপাত দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

নায়গ্রা প্রপাত দেখতে বেরিয়ে একেবারে প্রপাতের কাছে এসে পড়লাম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু বিজলী বাতি চারিদিকে এমন তীক্ষ্ণ আলো বিতরণ করছে যে একদম যেন দিনের আলোর মত

মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রপাতের শোভা দেখলাম। এতক্ষণ দেখেও তৃপ্তি হল না, অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। যতই দেখতে লাগলাম ততই দেখবার ইচ্ছা হতে লাগল। আরও খানিকক্ষণ পায়চারি করে একটা পরিষ্কার স্থানে বসলাম এবং প্রপাতের দিকে চেয়ে রইলাম।

চোখে দেখতে লাগলাম প্রপাত, কানে শুনতে লাগলাম তার গর্জ্জন। জল পড়ছে তার শব্দ, জল পড়ে ঘুরে উপরে উঠছে তার শব্দ, নানা তরংগের ঘাতপ্রতিঘাতের শব্দ। কি বিচিত্র, কি সুন্দর! অভিভূত মন নিষ্কর্মা হয়, কোনও গভীর চিন্তা তখন মনে আসে না। এ যেন আধজাগ্রৎ অবস্থা।

অনেকক্ষণ বসে যখন শরীরের রক্ত জমাট হবার উপক্রম হল, তখন উঠলাম। এতেই নায়গ্রা প্রপাত মনে গভীর রেখাপাত করল।

রাত অধিক হয়েছে, তাই আমাকে হোটেলে ফিরে আসতে হল। রাত্রে বেশ আরাম করে শোব ভেবেছিলাম, কিন্তু ক্রমাগত রেলগাড়ির সাণ্টিংএর শব্দে আর ঘুম হল না। ঘরের পাশ দিয়েই সান্টিং করার লাইন ছিল। প্রাতে সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু আমার আমেরিকার বন্ধুরা ফিরে আসার দরুন আর না ঘুমিয়ে তাদের নিয়ে বার হয়ে পড়লাম। একটি সিগারেট বিক্রেতার দোকানের কাছে এসে গতকল্য যা দেখেছি ও শুনেছি তার বর্ণনা করলাম তারপর আমরা রেস্তরাঁয় বেশ করে পেট বোঝাই করে খেয়ে আবার নায়গ্রা প্রপাতের তীরে এলাম।

মানুষ চিন্তা করতে ভালবাসে, কিন্তু উগ্র চিন্তা পছন্দ করে না। যারা শুয়ে শুয়ে উপন্যাস অথবা ভ্রমণকাহিনী পাঠ করতে ভালবাসে তাদের কাছে ইন্‌জিনিয়ারিং অথবা ভূতত্ত্বের কথা বলতে যাওয়া মহা অন্যায় কাজ! তবুও আমাকে এবার ভূতত্ত্বের কথা বলতেই হবে নতুবা

আমার ভ্রমণকথার সমাপ্তি হবে না। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রপাত দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী দেশ বিদেশ থেকে এসে থাকে। একটির নাম নায়গ্রা, অপরটির নাম ভিক্টোরিয়া। দুই প্রপাতই আমি দেখেছি, দুই-ই এক ধরনের। তবে ঋতুর প্রভাবে জলের স্রোতের প্রখরতার কমিবেশি হয়ে থাকে। নায়গ্রা প্রপাতে যখন বন্যার জল আসে তখনকার অবস্থা চোখে না দেখলে ছবি দেখে কিছুই বোঝা যায় না। জল বহুদূর হতে আসে, বহুদূর হতে জল আসার জন্য স্রোত তীব্র হয়ে উঠে। তারপর সেই প্রবল জলধারা একসংগে দেড়শত ফুট নীচে পড়ে যে ভীষণ শব্দের ? করে তা সত্যই বর্ণনাতীত। নায়গ্রা প্রপাতের আরও একটি বিশেষত্ব আছে। শীতের সময় এই প্রবল জলস্রোত বরফে পরিণত হয়। প্রপাতের জায়গাটিতে বরফের ফোয়ারা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য যা দেখিনি তা নিয়ে বেশি কথা বলা কথার বাহুল্য মাত্র।

ভিক্টোরিয়া প্রপাতের জল পড়া অন্য ধরনের। ছোট ছোট নদী নালা বয়ে জল আসছে। তারপর চলছে এক সমতর ভূমির উপর দিয়ে। সেই সমতল ভূমির উপর বাঁদর লাফাচ্ছে, ছাগল ঘাস খাচ্ছে, এমন কি চড়ুই পাখীও কখন কখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জল খাচ্ছে। এখানে নায়গ্রা এবং ভিক্টোরিয়ায় অনেক প্রভেদ। আবার বর্ষার সময় ভিক্টোরিয়ার জল যখন পর্বত থেকে নীচে নেমে আসতে থাকে, তখন বাস্তবিক এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

নায়গ্রা প্রপাতের দুই দিকে বিস্তীর্ণ ভূমি। উভয় দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যায় শস্যশ্যামল ও সমতল শস্যক্ষেত্র। নায়গ্রা প্রপাতের অবস্থা দেখে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ যে স্থানে প্রপাতের ঠিক আরম্ভ হয়েছে সেখানে পাথর ধ্বসতে ও খসতে আরম্ভ হয়েছে। ভয় এই যে ধ্বসা এবং খসা নিবারণ না করলে কালক্রমে

নায়গ্রা আর প্রপাত থাকবে না, হয়ে যাবে একটা ছোট নদী। কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটস পৃথিবীর এমন একটি সৌন্দর্যকে হারাতে চায় না। যে রকম শুনলাম আর বুঝলাম তাতে মনে হয়, নায়গ্রা প্রপাত যদি বেশি দিন প্রপাতরূপে বাঁচে তবে আর একশত বৎসর মাত্র। নয়গ্রা প্রপাতকে বাঁচাবার একটি মাত্র উপায় আছে। সাময়িকভাবে তার জলধারার গতি পরিবর্তিত করে যে সকল স্থান ভাংতে আরম্ভ করেছে সেই সকল স্থানের পাথর সরিয়ে দিয়ে যদি নূতন করে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলা হয়, তবে হয়ত নায়গ্রা প্রপাত অনেক দিন বাঁচবে। ইউনাইটেড স্টেট্স্‌ই এরূপ আর একটা প্রপাত ছিল, যার জলধারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সরে যাওয়ায় সেই প্রপাত এখন শুকনা নদীতে পরিণত হয়েছে।

নায়গ্রা প্রপাতের জল যেখানে সোজা হয়ে পড়্‌ছে, সেখানকার গভীরতা মাত্র একশত পন্‌চাশ ফিট। এই স্থান থেকে নীচের দিকে তিন মাইল পর্যন্ত আমি গিয়েছি এবং দেখেছি জলের গভীরতা কমছে। অনেক স্থানে মাছের পর্য্যন্ত চলাচল আছে। আমার ইচ্ছা ছিল আরও নীচে গিয়ে দেখি, কিন্তু তা আমার দ্বারা সম্ভব হল না। ক্রমাগত উঁচু নীচু ভূমি চলেছে। রেল লাইন এবং নানারূপ কারখানায় নদীর তীর আবদ্ধ থাকায়ই যেতে পারিনি। সিনেমায় নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্যাবলী বেশ সুন্দর করে দেখান হয়। সাধারণ জ্ঞান লাভার্থে তা যথেষ্ট বলে মনে করি।

জাহাজে করে নায়গ্রা প্রপাতের কাছে গিয়ে দেখবার ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ মনে হল একটু মজা করা যাক। সাথী আমেরিকানদের বললাম, "আপনারা এখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি জাহাজের টিকেট কিন্‌তে যাব, দেখব, টিকিট আমার কাছে বিক্রি করে কি না।" তাঁরা

বললেন "টিকেট নিশ্চয় পাবেন, তবে নিগ্রো বলে হয়ত জাহাজে কোথাও বসতে দিবে না।" যাই হ'ক, একখানা টিকিট কিনলাম এবং জাহাজের একটা সীটে গিয়ে বসলাম। বাপরে! কত লোক আমার প্রতি যে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তার আর শেষ নাই। সকলের দৃষ্টিই যেন বলতে চায়, "উঠে যা কালো ভূত। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই আমার প্রতি ঘৃণাসূচক একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। আমি তাদের দেখেও না দেখবার ভান করে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলাম।

নায়গ্রা প্রপাত দেখে অনেকের মনে কবিত্ব আসে। অনেক সুন্দর বই লেখে। সেই বইয়ের খুব কাটতি হয়। আমি প্রপাতে এসে সুখী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু এক বিষয়ে একটা কাঁটা মনের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে ছিল। ওই যে কতকগুলি চোখ, ঘৃণার বশবর্তী হয়ে আমার দিকে ক্রমাগত তাকাচ্ছিল তাতে মন অসুস্থ বোধ করছিলাম। এত শিক্ষা দীক্ষাতেও কেন যে এদের মনের ঘৃণ্য ভাব দূর হয় না, তা আমি কোনও মতেই ভেবে পাই নি। আমার চামড়াটার কালো রংএর জন্য যে আমি দায়ী নই তা ত বোঝা উচিত। এরূপ মনোভাবের লোক সকল দেশেই আছে কিন্তু এখানে খুবই কম। তার কারণ কি? এদের কখন পরিবর্তন আসবে। তাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আমেরিকায় কালার বার থাকবে না, কারণ অশ্বেতকায়দের মাঝে বেশ সাড়া পড়েছে এবং কোথায় অশ্বেতকায়দের দুর্বলতা অনেকেই তা অনুভব করে মনের উন্নতির চেষ্টা করছে।

প্রপাতের কাছে যতই জাহাজখানা কেঁপে কেঁপে অগ্রসর হচ্ছিল ততই বৃষ্টির মত জল এসে আমাদের উপর পড়ছিল। প্রপাতের উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ভিজে প্রপাত দেখার জন্য ওয়াটার প্রুফ নিতে হয় এবং সেজন্য ওয়াটার প্রুফের ভাড়া পন্‌চাশ সেণ্ট করে প্রত্যেকের

কাছ থেকে নেওয়া হয়। সবাই যখন বর্ষাতি নিতে গেল আমিও তাদের সংগে গেলাম। বর্ষাতির কোটের রক্ষক আমাকে দেখে মহা বিপদে পতিত হল। আজ পর্যন্ত কোন কালো লোক তার কাছ থেকে বর্ষাতি কোট চেয়ে নেয় নি। সর্বপ্রথমেই বর্ষাতি রক্ষক আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার দেশ কোথায়? আমার দেশের নাম বললাম। লোকটি আমার কথা বিশ্বাস না করে আমি যে হিন্দু তার প্রমাণ চাইল। আমি আমার পাসপোর্টখানা দেখালাম। আমার পাসপোর্ট দেখে বর্ষাতি রক্ষক আমাকে একটি বর্ষাতি দিয়ে বিদায় করল। এসব অপমান সহ্য করেও যারা কবিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আমি তাদের দলের লোক নই।

বাইরে এসে নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে কালো লোকদের বর্তমান জীবনের কথাই ভাবতে লাগলাম। নায়গ্রা প্রপাতের নানা দৃশ্য চোখে আসল আর গেল কিন্তু তাতে মনে কোন দাগ কাটতে পারল না। আমার আত্মসম্মানবোধ আছে তাই নায়গ্রা প্রপাত দেখে ভাবুক সাজতে সক্ষম হই নি। যারা কাপুরুষ তারাই আত্মসম্মানের কথা ভুলে গিয়ে দার্শনিক হয়, কবি হয়। আর যারা পুরুষ তারা সকল কথা ভুলে গিয়ে আত্মসম্মানের কথাই ভাবে। জাতের অথবা স্বদেশের সর্বাংগীন স্বাধীনতাই আত্মসম্মানের একমাত্র প্রতীক।

প্রপাত দেখা সমাপ্ত করে আমেরিকার বন্ধুদের সংগে আবার এসে মিশলাম এবং আমার মনের ভাব তাদের কাছে প্রকাশ করলাম। তারা বলল, "যতদিন পুঁজিবাদ এই পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে ততদিন এই পশুভাবও থাকবে।" তাদের কথা শুনে সুখী হই নি। আজও বুঝতে পারি না, সত্যই এই পুঁজিবাদ পৃথিবী হতে বিদায় নিবে?

নায়গ্রা প্রপাতের দৃশ্যাবলীর কথা বলার পূর্বে, কি করে নায়গ্রা

প্রপাত জন্ম নিল সে কথা বলব। পার্বত্য ভূমির উপর অনেক সমতল ভূমি থাকে। সাধারণতই এরূপ সমতল ভূমির উপর এবং নীচ দিয়ে জল নানা রকমে প্রবাহিত হয়। অনেক স্থানে দেখা যায় সামান্য জল বয়ে গিয়ে একটা গর্তে পরিণত হয়েছে। জল জমে সে জলে কুণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে। জল নীচের দিকে প্রবাহিত হয় বলেই এরূপ কুণ্ডলীর সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন অসভ্য থাকে তখন সেরূপ জলকে "কুণ্ড" বলে অবিহিত করে। অনেকে সেই কুণ্ডের তীরে পশু হত্যা করে এবং পশুরক্ত কুণ্ডে নিক্ষেপ করে। সেরূপ দৃশ্য আমি একটি দেখেছি। এরূপ কুণ্ডে অনেকদিন জলের কুণ্ডলী থাকে না, কারণ নীচের ফাঁকগুলি কাঁদায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং নীচের দিকে জল আর চুয়াতে পার না। যখন কুণ্ডের জল স্থির হয় তখন অসভ্য লোক ভাবে জলদেবতা তাদের পূজায় সুখী হয়েছেন।

নায়গ্রা প্রপাতের অনেক দূর নীচে গিয়েও দেখেছি সর্বত্রই পাথরের ভেতরে নানা রকমের পঁচা মাটি এখনও রয়েছে। পঁচা মাটি পরিষ্কার করেই এই দুটি প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমি বিষয়টা আরও বিষদ্ ভাবে বলতে পারতাম, কিন্তু পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। এতে ভ্রমণ কাহিনী ভূগোলে পরিণত হয়। ভ্রমণ কাহিনীতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্থান নাই শুধু ইংগিত থাকে।

নায়গ্রা শহরটি যদিও ছোট তবুও তাতে বেশ পারিপাট্য আছে। খাদ্যদ্রব্য এবং ভোগ বিলাসের অভাব নাই। এখানকার শ্বেতকায় হোটেলে আমি প্রবেশ করতে সক্ষম হইনি। বাইরের দৃশ্য দেখেই এখানকার অবস্থা অনেকটা অনুভব করতে হয়েছিল। আমার সাথীরা সে বিষয়ে অনেকটা সাহায্যও করেছিলেন। বাইরের দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল এখানেও ব্যভিচারের অন্ত নাই। ভাল এবং মন্দ নিয়েই

সংসার। তবে আমাদের দেশে যেমনভাবে অত্যাচার চলে তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। এখানকার অত্যাচার এবং ব্যভিচারের শেষ কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে তা পাওয়া যায় না।

বোধ হয় ছেলেটি স্পেনিশই হবে। মাঝে মাঝে দুএকটা স্পেনিশ শব্দও বলছিল। পথের পাশে দাঁড়িয়ে সে অনবরত "জুতা পরিষ্কার করুন" বলে চিৎকার করছিল। আমার সাথীদের প্রত্যেকেরই জুতা পরিষ্কার ছিল তবুও তারা জুতা পরিষ্কার করতে ছেলেটির কাছে গেল. প্রত্যেকেই জুতা পরিষ্কার করাল। প্রত্যেকেই তাকে তার প্রাপ্য দিল। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না। চামারের ছেলের প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখাতে রাজি নয়। চামারের ছেলে আমাদের পাশেও আসতে পারে না। আমরা তাদের মানুষ বলেও স্বীকার করি না এদের জন্ম-মৃত্যু, সরকারী খাতায় উঠে, আমাদের মনের খাতায় উঠে না। এরা যদি নির্বংশ হয় তবুও তাদের জন্য আমরা ভাবি না। অতএব আমেরিকার দোষ আমাদের মনের খাতায় উঠাবার পূর্বে নিজেদের দোষের খাতাটা একটু দেখলে ভাল হবে। আমেরিকা সর্বাংশে আমাদের অনেক উঁচুতে বসে রয়েছে। আমরা তাদের নীচে থেকে যদি তাদের খারাপের দিকটা দেখি তবে আমরা আরও নীচে নেবে যাব. একথাটা সকল সময় মনে রেখে ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করলে বাধিত হব।

ব্যাফেলো হতে ডিট্রয় পর্যন্ত অনেক মোটর রোড আছে। তার মাঝে সোজা পথ হল কানাডা হয়ে। কানাডা হয়ে যেতে হলে পরিচয়পত্রের দরকার। আমেরিকানদের পরিচয়পত্র নানা রকমের হয়— মোটরকার লাইসেন্স, কাজের সার্টিফিকেট ইত্যাদি। আমায় মনে হয়

ভারতে পোস্ট অফিস যেরূপ সহজে পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে, এরূপভাবে কেউ কোনও পরিচয়পত্র দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আমেরিকায় পরিচয়পত্র পেতে হলে পনের মিনিট সময় লাগে। নিজের দুখানা ফটো নিয়ে যে কোনও পুলিস স্টেশনে হাজির হলেই হল। পুলিশ সর্ব-সাধারণের চাকর। তাকে দেখতে হয় ফটো দুখানা এই লোকের কি না, তার মুখে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে কোনও দাগ আছে কি না। এই দুটা ফটো দেখেই সরকারী পরিচয় পত্র দিয়ে দেওয়া হয়। কলনিয়েল পুলিসের প্রবচনতুল্য অশিষ্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত আমরা, আমেরিকার পুলিসের শিষ্ট ও সুন্দর ব্যবহারে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না। কি সুন্দর সদ্‌ব্যবহার আমেরিকার পুলিশের! আমার সংগীদের পরিচয়পত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে গেল। তারপর আমরা চললাম গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানির বাসকে পিছনে রেখে। স্টুর রাস্তায় ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালাবার অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের গাড়ি চলেছে ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল করে। গাড়ি চলছে তো চলছে। মাঝে মাঝে ঈট্‌স্ (Eats) সাইন বোর্ড দেওয়া আছে। এসব খাবারের দোকানে সকল রকমের খাদ্য সকল সময় সুপক্ক অবস্থায় মজুদ থাকে। খাবার পাক করে বরফের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। গ্রাহক যাবামাত্র গ্যাসের উনুনে গরম করে খেতে দেওয়া হয়। এসব খাদ্য উপকারী এবং সুস্বাদু।

ঈট্‌স্ ঘরগুলিতে কোনও পারিপাট্য নাই, বিজলী বাতির ছড়াছড়ি নাই। দোকানী প্রায়স্থানেই পুরুষ। পুরুষগুলি শুষ্ক বদনে দণ্ডায়মান। দেখলে মনে হয়, হাসবার শক্তি ওদের লোপ পেয়েছে সব সময়েই যেন সন্ত্রস্ত, কিন্তু সুযোগ পেলেই দুর্বলের উপর হামকি তুমকি করতে ছাড়ে না। আমার পাসপোর্ট বেশ ভাল করেই পরীক্ষা করা হচ্ছিল,

কিন্তু সংগীদের সেরূপ কিছুই হচ্ছিল না। ব্রিটিশ হতে ডোমিনিয়ন স্ট্যটাস পেয়ে কলনিয়েল্ লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় আজ তা ভাল করে বুঝলাম। পূর্বে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দেও একবার বুঝেছিলাম। তখনকার কথা মনে ছিল না, এখন ফের নূতন করে মনে হল। প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি নামক পুস্তকে তা বলা হবে।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ড্রাইভার সাথীকে বলে গাড়ি থামিয়ে লক্ষ্মীছাড়া গ্রামগুলি দেখতে লাগলাম। গ্রামের খড়ের ঘরগুলি খড়ে পূর্ণ, চারদিকে কোনওরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার লেশ নাই। হয়ত গত একমাস যাবৎ এদিকে কেউ আসেই নি। গরুতে খড় খেয়েছে এবং খড় চারিদিকে এলোমেলো করে রেখে গেছে। ইঁদুর তাতে বেশ বড় বড় গর্ত করেছে। গরু মাঠে আপন মনে চরছে তাদের ভাল জলের কোনও বন্দোবস্ত নাই। শূকরগুলি আপন মনে দৌড়াচ্ছে, এবং শুচ্ছে, মনে হয় যেন তাদের কেউ দেখবারও নাই। গৃহস্থের ঘর অপরিষ্কার। কোথাও ভেংগে পড়েছে, কোথাও প্রখর সূর্যালোক টালিহীন ছাদের ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারছে। ইলেকট্রিক লাইট দেখলাম না, বোধ হয় মোমবাতিই ব্যবহৃত হয়। কৃষক কাংগাল হয়ে পথে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছে। কৃষকপত্নী ম্লান মুখ নত করে সেলাইএর কাজে রত। ক্যানাডার লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল মনে হল না।

গ্রামে যুবক-যুবতীর দল মুদীখানার দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। হাসছে বটে, কিন্তু সে হাসিতে অভাবের ছাপ মারা রয়েছে। যুবকদের স্বাস্থ্যশ্রী অনুজ্জ্বল। কিন্তু কেন? ক্যানাডার লোক কি এতই দরিদ্র যে ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্যবিধান পর্যন্ত করতে পারে না? আমার মনে হয় তারা যা পায় তাতে তাদের অভাব মোচন হয় না। হতশ্রী গ্রাম

আর দেখতে ইচ্ছা হল না। সাথীদের বললাম আর গ্রামে গাড়ি থামিও না। আমরা আর কোথাও থামি নি, সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যায় উইণ্ডসর্ নামক স্থানে এসে পৌছলাম।

উইণ্ডসর শহর। পথ ঘাট লণ্ডনের মত আঁকাবাঁকা। তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। লোকের চলাচল বেশি নয়। যারা পথে চলছে তাদের মুখ দেখলে মনে হয় তারা চিন্তিত। হাসির তো কথাই নাই। বেশীক্ষণ এরূপ পুঁজিবাদী শহরে থাকতে ইচ্ছা হল না। একটি রেস্তরাঁয় সামান্য পানাহার করে এক সুড়ংপথে চললাম। সুড়ংএর উপরে হ্রদের জল খেলছে। বড় বড় জাহাজ সুড়ংএর উপরের জলে চলাফিরা করছে। সুড়ং পথটি সুন্দর করে গড়া হয়েছে। দুখানা মোটর স্বচ্ছন্দে আসা-যাওয়া করতে পারে। পথটির দৈর্ঘ্য অন্তত আড়াই মাইল হবে বলে মনে হল। এরূপ সুড়ং-পথ তৈরী করতে অনেক টাকা লেগেছে সন্দেহ নাই, অবশ্য সর্বসাধারণের তাতে অশেষ সুবিধা হয়েছে।

ডিট্রয়

সুড়ংএর ওপারে ডিট্রয় নগর। ডিট্রয় প্রকাণ্ড নগর। এখানে আসার পর পাসপোর্ট পরীক্ষা হল। এই পরীক্ষায় আমাকে একটুও কষ্ট পেতে হয় নি। তবে ইমিগ্রেশন অফিসার আমার বন্ধুদের একটু যেন ধমকে কথা বললেন কিন্তু তাদের তাতে গ্রাহ্যই নাই; উল্টা ধমক দিয়ে বলল, "ইউ গাইজ্ আর টু ফ্যাট, এ?" এর মানে হল "তোমরা বেশ মোটা হয়েছ নয় কি?" ইমিগ্রেশন অফিসর ওদের কথা শুনেই

চুপ। কেননা এই ভংগীটাই খাঁটী আমেরিকান। ওদের কথা কাটাকাটি শুনে আমার মনে হল, ওরা বেশ ভাল করেই জানে কি করে সরকারী চাকরবাকরদের শিক্ষা দিতে হয়। আমাদের লাগেজ পরীক্ষার পর তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। আমার বন্ধুরা আমাকে একটা হোটেলে রেখে সেই রাত্রেই চিকাগোর দিকে রওনা হল। পথে শুনেছিল চিকাগোতে অনেক কাজ খালি পড়েছে। কাজের অন্বেষণে যাওয়া বড়ই চমকপ্রদ কাজ। অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় না, তা বলে কি পেটে হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে? নিশ্চয় না। পেটে এবং মাথায় হাত দিয়ে বসে কুকুর প্রকৃতির লোক, মানুষ কাজ না পেলে কেড়ে খায়। অনেকে বলেন আমেরিকায় অনেক ক্রিমিনেল্‌স আছে। যদি কেউ ক্রাইম্‌ করে তবে পরাধীন দেশের লোক, স্বাধীন দেশের লোক ক্রাইম্‌ করতে পারে না। ক্রাইম্‌ কাকে বলে তাও তারা জানে না।

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় যখন ছিলাম তখন অস্ট্রিয়াতে অনেক লোক বেকার ছিল। তা বলে কোন বেকারই ক্ষুধায় মরেনি অথবা তাদের স্বাস্থ্যেরও হানি হয় নি। তারা প্রত্যেক পাঁচ জনে মিলে এক একটি দল বেঁধে 'ধনীদের বাড়ীতে যেত এবং প্রত্যেকে দশ সেণ্ট করে ধনীর কাছে চাইত। যে ধনী তাদের ভিক্ষার আদেশ অবহেলা করত, সেই ধনীর বাড়ী হতেই তারা সামনে যা পেত তাই কেড়ে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করত। প্রথম প্রথম স্থানীয় পুলিশ এসব পাপীদের জেলে পুরতে লাগল। জেলে কয়েদীর সংখ্যা প্রত্যহ বাড়তে লাগল। ধনীর দল দেখল এরূপ ভাবে যদি লোককে জেলে পুরতে হয় তবে অস্টিয়ার শতকরা পঁচানব্বই জনকে জেলে পুরতে হবে। অস্ট্রিয়া হয়ে যাবে জেলখানা। সেজন্য বেকার মজুরদের ভিক্ষার্থীরূপে দেখলে সকলেই

কিছু কিছু দিত। এটাকে ক্রাইম্ বলে না, এটাকে বলে দরবারের অভাব মেটানো।

আমেরিকাতেও সেরূপই চলে। আমেরিকার ধনীর দল পুলিশের সাহায্যে তাদের ব্যাংক এবং অন্যান্য ধন দৌলত পাহাড়া দিয়ে রাখে। বেকার মজুর সুযোগ পেলেই লুট করে। এতে নরহত্যা হয়। ক্ষুধা নীরবে কেউ সহ্য করতে পারে না। সুখের বিষয় এই তথাকথিত পাপীর দল ভুলেও কোন খাদ্য ভাণ্ডার লুট করে না, তবে অর্থাভাবে খাদ্য খেয়ে চলে গেলেও অর্থাগমে খাবারের দোকানের দেনা সর্বপ্রথমই মিটিয়ে দেয়।

একদিন আমি একজন হোটেলের মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই যে তিনটি লোক ভাড়া না দিয়েই রুমে প্রবেশ করল তারা কি পুলিশের লোক?" হোটেলের মালিক বললেন এই তিন জন ভদ্রলোক, বেকার মজুর, তাদের হাতে অর্থ নাই, এঁরা যখন কাজ পাবেন তখন তাঁর দেনাই সর্বপ্রথম মিটিয়ে দেবেন বলে মৌখিক প্রতিজ্ঞা করেছেন। এঅন্চলে মুখের কথারও মূল্য আছে কারণ ছোট বেলা হতে ছেলেমেয়েরা মুখের কথার উপর নির্ভর করেই চলে।

ক্রাইম্ শব্দটি পুঁজিবাদীদের দ্বারা রচিত। গরীবকে পুঁজিবাদীরাই ক্রাইম্ করতে বাধ্য করে এবং পুঁজিবাদীরাই যারা ক্রাইম্ করে তাদের আইনের সাহায্যে ধরে শাস্তি দেয়। যে সকল পুঁজিবাদী দেশের লোক সৎসাহসী তারা আইনকে অমান্য করতে সকল সময়ই বাধ্য হয়, বিদেশের এবং পরাধান দেশের লোক পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র পাঠ করে তাজ্জব হয়ে যায়। যাদের পূর্বপুরুষ শুধু স্বর্গ নরকই ভাবত, তাদের পক্ষে আমেরিকার যুবকদের সৎসাহসের কথা শুনে ঘৃণা হবার কথাই।

আমেরিকার সর্বত্র Daw (ডও) বলে একটা কথার প্রচলন আছে। তারই সংগে আর একটি কথারও প্রচলন হালে হয়েছে, তাকে বলা হয় রেস্ যাকে আমরা বলি ঘোড়দৌর। "ডও" বলে কথাটার যেমন প্রচলন আছে, তেমনি তার কাজও চলে।

নিউইয়র্কের ১০৮ নং স্ট্রীট যেখানে মেডিসন এ্যাভেনিউ কেটেছে, ঠিক তার মোড়ে একটি গ্রোসারী দোকান আছে। এই দোকানে গিয়ে আমি প্রায়ই ফোন করতাম নিজের ঘরেও ফোন ছিল, কিন্তু তা ব্যবহার না করে দোকানের ফোনই ব্যবহার করতে ভালবাসতাম। একদিন ফোন করে এসে দোকানের ভেতরই একটা চেয়ারে বসেছিলাম, অমনি দুজন লোক দোকানে প্রবেশ করে আমাকে চেয়ারে বসা দেখেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। আমার একমাত্র অপরাধ, শরীরের রং আমার কালো। এদের অগ্নিশর্মা মুখ দেখে আমি একটুও ভয় পেলাম না, বরং আরও উৎসুক নয়নে আরও একটু চেয়ে থাকলাম। দোকানী তাড়াতাড়ি করে উঠে আগন্তুকদের কাছে কি বলল এবং আগন্তুকদের মুখের অবস্থা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হল। একজন আগন্তুক আমার কাছে এসে বসল এবং বলতে লাগল "এই দেখুন আমার বাবা একজন ঢেম্ জু" এ পর্যন্ত বলেই লোকটি কথা বন্ধ করল, তারপর দোকানদারের মুখের দিকে চাইল। দোকানদার ইংগিত করল। ফের লোকটি আমার আরও কাঁছে এসে বলল "আপনাদের দেশে কি ডও প্রথা প্রচলিত নাই? ডও প্রথা কাকে বলে তা আমি জানতাম না, সেজন্য লোকটিকে বললাম ডও প্রথা কাকে বলে আমি জানি না।

লোকটি আমাকে দোকানের বাইরে নিয়ে গিয়ে বলল তাদের দেশে অনেক বেকার মজুর আছে, তারা যে প্রকারে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য ছোট খাট দোকানদার হতে সাপ্তাহিক কিছু কিছু করে চাঁদা আদার করে,

সেজন্য কোনও রসিদ দেওয়া হয় না। যে সকল দোকানদার "ডও" দেয় না তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। আমরা আজ আমাদের এলাকায় ডও আদায় করতে বের হয়েছি। প্রত্যেক দোকানদারই কিছু কিছু করে আজ দেবে। চাঁদার সাহায্যে অনেকগুলি বেকার খেয়ে বাঁচবে। আমি একটু হেসে বললাম "অহো সেকথা, আমাদের দেশেও তার প্রচলন আছে"। মিথ্যা বলতে আমার একটুও ঠেকল না, কারণ এরূপ মিথ্যার আশ্রয় না নিলে প্রথমত নিজের দেশের বদনাম হয়, দ্বিতীয়ত বিপদেও পতিত হতে হয়। উভয় সংকট হতে একটি মিথ্যা কথায় উদ্ধার পেয়ে ফের দোকানে এসে বস্‌লাম। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি সত্যিই কি একজন জু?" লোকটি বলল "না মহাশয় আমার বাবা একজন কোয়েকার, তিনি আমার কাজ পছন্দ করেন না বলেই আমি তাঁকে জু বলেছি। আপনি হলে কি বলতেন?" "আমি বল্‌লাম কাপুরুষ কারণ জুদের আমরা ঘৃণা করি না।" লোক দুটি আর কোন কথা না বলে দোকানদার হতে দুটি ডলার আদায় করল এবং বিদায় নিয়ে অন্য দোকানের দিকে রওয়ানা হ'ল। তাদের সংগেও মোটরকার ছিল। দোকান হতে বের হয়ে তারা মোটরে না বসে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। তাদের নির্ভিক ভাবে কাজ করতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।

দরিদ্র, দীন মজুর, দরিদ্রনারায়ণদের আরও একটি কাজ চলে। কতকগুলি সংবাদপত্র তাদের সেই সৎসাহসকে বাধ্য হয়ে সাহায্য করে। কাজটি অতি সোজা। শহরের প্রত্যেক এলাকায় এক একটি কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রগুলি প্রায়ই গ্রোসারী দোকানে হয়। দোকানদার জিনিস বিক্রয় করার সময় কখন কখন বেশ হাসে। যখনই হাসে তখনই তার হাতে জুয়াখেলার টিকিটের চাঁদা এসেছে বুঝতে হবে।

দোকানী চাঁদার পয়সাগুলি গুণে নেবার সময়ই যিনি চাঁদা দিলেন তার ঠিকানার একখানা কাগজও সে সংগে দিয়ে দেয়। চাঁদা কত দিল তাও কাগজের টুকরায় লেখা থাকে। চাঁদা আদায় হয় বেলা বারটা পর্যন্ত। তারপরই চাঁদা আদায়কারী সেদিনের চাঁদা বাবত কত টাকা হয়েছে তাই একটার মধ্যে যথাস্থানে জানিয়ে দেয়। বিকালের চারটার সময় যে কোন শস্তা সংবাদপত্র কৌশলে কোন এলাকার কে সেদিন লটারী পেল তাই জানিয়ে দেয়। এমন সুন্দর এবং সহজ ভাবে এতবড় একটি বেআইনী কাজ পৃথিবীর অতি কম স্থানেই হয়। এসব করতে লোক-বল এবং অর্থবল যেমন থাকা চাই তেমনি থাকা চাই একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস।

যার ঘাড়ে একবার এই ভূত চেপে বসে সে সহজে এ ভূতকে নামাতে পারে না। এপ্রোভার হয়ে রক্ষা পাবার উপায় থাকে না, ইন্‌ফরমারের স্থান সেখানে নাই। একেই বলে কর্মতৎপরতা এবং সাহসের পরিচয়। এরূপ লটারী পদ্ধতি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে আছে এবং আমেরিকার অনেক নগরে চোখ থাকলেই দেখতে পাওয়া যায়।

সুখের বিষয় আমার সাথীরা সে রকমের লোক ছিলেন না, বাস্তবিকই তাঁরা কাজের খোঁজে বেরিয়েছিলেন।

গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানির স্টেশনের পেছনে একখানা পাঁচতলা বাড়ি, সেখানে অনেক যাত্রী সময়ে অসময়ে গিয়ে থাকে। এই হোটেলে কালো চামড়ার প্রবেশ নিষেধ নাই। বিনা আপত্তিতে একটি ঘর ভাড়া পাবার অধিকার পেয়ে অনেকটা শান্তি বোধ করলাম। হোটেলে রাত্রিবাস করবার উপযোগী একটি রুমের জন্য ভাড়া দিতে হয় এক ডলার। ঘরটার দরজা জানালা খুলে দিয়ে শহরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। এমন সৌন্দর্য আমেরিকাতেই শুধু দেখা যায়। পৃথিবীর কত জায়গাতেই

ত ঘুরলাম, এমনটি আর কোথাও দেখি নি। মাইলের হিসাবে অর্ধলক্ষ মাইল আমার ভ্রমণ করা হয়েছে। বাইসাইকেল পর্যটক হিসাবে, বাইসাইকেলে ভ্রমণের ইতিহাস শুরু হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত আমিই সকলের চেয়ে বেশী দেশ ও মাইল ভ্রমণ করেছি। তার রেকর্ড আমার কাছে আছে। যদি আমেরিকান কিংবা ইউরোপীয় হতাম তবে আমার রেকর্ড সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত হত। যাই হোক, আমেরিকার নগরীর দৃশ্য, বিশেষ করে রাত্রিবেলায়, এক অভিরাম বস্তু। আমেরিকার শহর এবং নগরের রাত্রির সৌন্দর্যের সংগে ইউরোপ ও এসিয়ার কোনও নগরের রাত্রির সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানির স্টেশনগুলি জি আই পি এবং এ বি আর স্টেশনের চেয়েও বড়। যাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। গ্রে হাউণ্ড বাস কোম্পানিতে বিনা টিকিটে কেউ ভ্রমণ করতে পারে না। রেলগাড়িতে আমেরিকায় অনেক লোক বিনা পয়সায় যাওয়া-আসা করে। রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছা সব দেশেই আছে, তবে আমাদের দেশের মতন আমেরিকায় কেউ কখনও রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করে সাধারণ লোকের সর্বনাশ করেছে বলে আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। আমেরিকার রেলগাড়িতে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে তা প্রধানত কোম্পানিদের দোষেই। নির্দোষ লোকের প্রাণহানি করে তারা এর প্রতিশোধ নেয় না, প্রতিশোধ নেয় অন্যভাবে।

আমাদের দেশে যেমন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আছে, আমেরিকাতেও তেমনি আছে। আমাদের দেশের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টকে যেমন নানারকম সরকারী খেয়ালের আইন মেনে চলতে হয়, সে দেশে তেমন নয়। আমেরিকার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট শুধু বিজ্ঞান-সম্মত আইন মানে। একবার নিজামের হায়দরাবাদ শহরে গিয়েছিলাম পথে বার হবার পর

কয়েকজন সাংবাদিক আমাকে তাঁদের শহরটি সম্বন্ধে আমার ধারণা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলাম, "ভারতের অন্যান্য শহর যেমন, হায়দরাবাদও তেমনি। ওই দেখুন সামনে মসজিদ পথ বন্ধ করে রেখেছে, বাতাসের অবাধ গতিও বন্ধ করেছে, মসজিদ্‌বাড়ি থেকে পচা ইট খসে পড়ছে, তবুও দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝে। এতে শহরটির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু নাগরিকদের সেদিকে হুঁশ নাই।"

আমেরিকার প্রত্যেক শহরে এবং নগরীতে "ডাউন টাউন" বলে এক-একটা স্থান আছে। এই সব স্থানে সিনেমা হোটেল বড় বড় দোকান রেস্তঁরা প্রভৃতি এবং আমোদ-প্রমোদের স্থান থাকে। ডাউন টাউন-এ গৃহস্থের বাসের উপযুক্ত স্থান থাকে না। ডাউন টাউন ছাড়া নগরের অন্যত্র কোথাও সিনেমা, বড় বড় দোকান এবং বিলাসিতার সামগ্রী বিক্রয় করতে হলে সর্বসাধারণের ভোট নিয়ে তা করতে হয়। আদেশ না পেয়েও যদি কোন দোকান কিংবা অন্য কিছু করা হয়, তবে তার স্থায়িত্বের ঠিক থাকে না। যদি কোনও লোক দোকানীর বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য জনমত যোগাড় করে, তবে দোকানীকে দোকান ছেড়ে চলে যেতে হয়। আমেরিকাতেও অনেক বে-আইনী কাজ হয়ে থাকে বটে, কিন্তু ধরা পড়লে তার আশু প্রতিবিধান হয়।

খানিকক্ষণ পরে স্নান করবার জন্য স্নানাগারের দিকে রওয়ানা হলাম। স্নানাগারে ঢোকবার পথে একস্থানে লেখা আছে—এই হোটেল শুধু পুরুষদের জন্যই! স্নানাগারের সামনে লেখা রয়েছে—একজন করে স্নানাগারে প্রবেশ করবে! লেখাগুলি পড়ে মনে নানারূপ সন্দেহ হল। বাড়িটাও দেখে মনে হল এটা যেন গৃহস্থের বাড়ি; বর্তমানে পার্টিশন লাগিয়ে বাড়িটাকে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। স্নানাদি সমাপ্ত করে ফল কিনতে বের হব এমন সময় পথে দেখা হল হোটেলের

ম্যানেজারের সংগে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে বড়ই আদর করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে বাড়িটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ম্যানেজার বললেন, "দেখে বোধ হয় এটি গৃহস্থের বাড়ি, কিন্তু এরূপ স্থানে গৃহস্থ থাকে না, থাকতে পারে না। কিন্তু কর্পোরেশনের চোখে ধুলা দিয়েই বাড়িটা রাতারাতি প্রস্তুত হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই চালাকি ধরা পড়ে এবং যিনি বাড়ি করেছিলেন তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয়। তাই আপাতত এই কাঠের পার্টিশন; সত্বরই অন্য ব্যবস্থা হবে।" ঘুষ দেবার পাপ করা শুধু ভারতেই প্রচলিত নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই আছে, বিশেষত পুঁজিবাদীদের রাজত্বে। আমেরিকায় কনফিডেন্স ম্যান, ক্রুক প্রভৃতির সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। কে কোন্ মতলবে বাড়িখানা তৈরী করেছিল তা কে জানে। আমেরিকায় বাড়ি তৈরী কর গির্জা তৈরী কর, যা ইচ্ছা তাই তৈরী কর, স্বাস্থ্যবিধির আইন মেনে চলতে হবেই। এখানে আমেরিকা ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ বর্জন করেছে দেখে ভারী আনন্দ হল।

আমেরিকার মজুররা যেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে, দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর কোনও দেশের মজুর তেমন সুবিধা পাচ্ছে না। আমেরিকার মজুর কোনও রকমে যদি সপ্তাহে তিন দিন কাজ করতে পারে তা হলে সপ্তাহের বাকী দিন কটা সে কাজ না করেই কাটিয়ে দিতে পারে, অবশ্য যদি সে স্ত্রীপুত্রপরিবার-বেষ্টিত না হয়। কলকাতার দু-হাজরী তিন-হাজারী ইউরোপীয় কর্মচারীরা যেভাবে অবসর যাপন করে, আমেরিকার একক ঝাড়ুদারও সেইভাবে অবসর সময় যাপন করতে পারে এজন্য সপ্তাহে তার তিন দিন কাজ থাকলেই যথেষ্ট।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে একটি ছোট রেস্তরাঁয় খেতে গেলাম। অনেক লোক তাতে বসে খাচ্ছিল। কেউ বা আপন আপন বন্ধুবান্ধবদের

সংগে খাওয়া শেষ করে গল্প করছিল। সেসব কথায় দুঃখের ছায়া নেই, হালকা সরস আনন্দময় কথাবার্তা! মাঝে মাঝে তার দু-একটা আমারও কানে আসছিল—ম্যেকিরুনি, জো লুই, খেলার কথা, সুন্দরী বালিকাদের কথা ইত্যাদি। তার মানে ওই রেস্তরাঁয় বসে যারা খাচ্ছিল তাদের কেউই বেকার নয়। যখন লোকের কাজ থাকে, অভাব তার থাকে না (কথাটা শুধু আমেরিকাতেই খাটে), মনে তখন তার হাসিখুশির কথাই আসে। কর্মের গাম্ভীর্য দিনের শেষে কাজ শেষ হবার সংগে সংগেই শেষ হয়ে যায়। এখন কাজের কথা, দায়িত্বের কথা আর ওদের মনে নাই, তাই ওরা এখন সুখী। তারা এটাও ভাল করে জানে, যখন তারা বুড়ো হবে তখন তারা প্রত্যেকে পেনশন পাবে। পেনশন না পাবে, তা দ্বারা তাদের ভরণ পোষণ চলবে, তারপর 'হেম এণ্ড এগ্' আন্দোলন তো চলেছেই। তাই আমেরিকার মজুর কাজ করতে পারলেই সুখী। যারা কাজকর্ম খুঁজে পায় না বা যাদের মাঝে নূতন ভাবের সন্চার হয়েছে, তারাই অবনত ও বিষণ্ণ মুখে জীর্ণ বসনে আবৃত হয়ে পথে চলেছে। পাশ্চাত্য জাতকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। এদের মনের বল যে কত তা আমাদের ধারণাতীত। আমরা অনেক সময়েই পেটের নজির দিয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে সমর্থন করি, এজন্য কাল্পনিক সম্মানের নজির দিতেও কসুর করি না; কিন্তু ওদের সেসব নাই।

রেস্তরাঁর দরজার সামনে একটু প্রকাশ্য স্থানেই বসেছিলাম এবং ওয়েটারকে দুধ আনতে বলেছিলাম। ওয়েটার গেলাসে করে ঠাণ্ডা দুধ এনে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা দুধ খেতে চাইলে তার সংগে সরু খড়ের নল দেওয়া হয়। আমি ঠাণ্ডা দুধ খেতেই পছন্দ করি। ধীরে সুস্থে খাচ্ছিলাম আর নানা কথা ভাবছিলাম। কিন্তু দরজার সামনে বসে নির্বিকার চিত্তে নিঃসংকোচে দুধ খাচ্ছি দেখে অনেকেই আমাকে

পাড়াগেঁয়ে নিগ্রো বলে ভাবছিল, এবং বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। একখানা প্রভাতী সংবাদপত্রও আমার হাতে ছিল এবং মাঝে মাঝে সে দিকে চাইছিলাম। আমার এরূপ বেয়াদবি অনেকেরই বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল না, তাই ওয়েটার একসময় আমার কাছে এসে বলল, "মশাই, এভাবে দরজার গোড়ায় অনেকক্ষণ বসলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়।"

"কি রকম ?"

"আজ্ঞে তাই।"

"এঁরা যে বসে আছেন, এঁদেরও বলুন।"

"আগ্যে এঁরা আর আপনি, মানে—

"বুঝেছি ; ওরা শ্বেতকায় আর আমি কৃষ্ণকায় ; এই তো ?"

পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বললাম, "একেই বলে আমেরিকান ডিমোক্র্যাসি। এরই এত বড়াই আপনারা করে থাকেন। অন্যায় হয়েছে এদেশে আসা, দূর থেকেই লিংকনকে স্মরণ করা উচিত ছিল কাছে এলে স্বপ্নভংগ হয়।" পরে বললাম, "আমি এদেশের লোক নই, আমি হিন্দু।" ওয়েটার তৎক্ষণাৎ বললে, "বসুন, বসুন, তবে বসুন, আমাদের ভুল হয়েছে।" আমি বললাম, "পুঁজিবাদী আমেরিকান আপনারা, আপনাদের ধন্যবাদ, নিগ্রোদের হরিজন করে রাখাই হল পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রথম সূত্র।"

লোকটি আরও কি বলিতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে অনেকগুলি লোক এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটি লোক আমাকে বললে, "You talk against Imperialism. Why not against British ?"

বললাম, "বিশেষ করে কোনও জাতের বিরুদ্ধে ত আর আমি

কিছু বলছি না, সাধারণভাবে নীতির বিরুদ্ধেই বলছি। আপনি বোধ হয়—"

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, কতকগুলি লোক "উনি একজন পাকা দরের হুভারপন্থী, চলুন বাইরে যাই," বলে আমাকে সংগে করে বাইরে চলে এল। আমরা আমার হোটেলের দিকে চললাম।

এদের সংগে নিয়েই হোটেলে আসলাম এবং নানা কথার পরে শুয়ে পড়লাম। পরদিন প্রাতে স্থানীয় হিন্দুদের সংগে দেখা করবার জন্য গেলাম। তারা থাকেন লাফিয়েট ষ্ট্রীটে। মিঃ জগৎবন্ধু দেব-ই হলেন সকলের চেয়ে বয়সে বড় এবং আমেরিকার নাগরিক। তাঁর সংগে দেখা হবার পূর্বেই মিঃ হাসিমের সংগে দেখা হয়। হাসিম পূর্বে অশিক্ষিত ছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে লেখাপড়া শিখেছেন। তাঁর হৃদয়ে অদম্য শক্তি, কাজে অসাধারণ পটুতা, দেশভক্তি তাঁর প্রবল। দেশের জন্য আত্মবলিদানে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং থাকবার জন্য তৎক্ষণাৎ মিঃ নাগকে একটা রুম ভাড়া করে দিতে বললেন। তিনি পনর মিনিটের মধ্যে আমার জন্য ঘর ঠিক করে দিয়ে বললেন, "Settle up yourself, then we will have talk।" এবার আপনি বিশ্রাম করুন আমরা পরে এসে কথা বলব। আমি তাঁকে বাধা দিয়ে দুজনকেই বললাম, "চলুন আমার রুমেই গিয়ে বসি; সেখানে বিশ্রামও হবে কথাও হবে।" কংগ্রেস ষ্ট্রীটে আমার জন্য যে ঘর ভাড়া করা হয়েছিল তার মালিক ছিলেন একজন হংগেরীয়ান্।

দুপুরে আমরা আমাদের দেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত রেস্তরাঁতে খেয়ে এলাম। খাদ্যের সুন্দর বন্দোবস্ত। ডাল পাওয়া যায় না বলে আমেরিকান পীচ দিয়ে ডাল তৈরী করা হয়। হলুদের বদলে

স্পেন থেকে একরকম হলদে গুঁড়া আনিয়ে তাই ব্যবহার করা হয়। আমেরিকাতে যে লঙ্কা পাওয়া যায় তা মিষ্টি। কিন্তু কাঁচা লংকার গন্ধ তাতে আছে, সেই গন্ধ পাবার জন্য মিষ্টি লংকার সংগে গোলমরিচ মিশিয়ে তরকারিতে দেওয়া হয়। তবুও ভারতীয় তরকারি খাওয়া চাই। মাঝে মাঝে আমেরিকার ধনী নিগ্রোরা এবং 'সাদা নিগ্রো'রাও 'হিন্দু কারি'র আস্বাদ নিতে আসে। ভারতের যদি কোন সংস্কৃতি থাকে তবে 'কারি' আর 'শাড়ি'। ভারতীয় প্রথায় আমেরিকাতে হাতে করে খেতে দেওয়া হয় না। যদি হাতে খেতে হয় তবে ভিতরে বসে খেতে হবে, বাইরে বসে খেতে হলেই কাঁটা চামচ ব্যবহার করতে হবে।

দুপুরবেলা খাবার সময় আমার আগমনে হিন্দুদের মধ্যে এক সাড়া পড়ে গেল। সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের ডাকা হল। তাঁদের সংগে অনেক কথা হল। কিন্তু আমাকে হিন্দুরা পূর্বেই বলে দিয়েছেন যে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী বিষয়ে কথা বলতে হবে। "Out and out you should be a nationalist।" তাই হল; যাঁরাই এলেন, শুধু হিন্দুস্থান ও হিন্দু ছাড়া আর কোনও বিষয়ে কিছু বললাম না। 'হিন্দু' শব্দটা ব্যবহার করতে অনেক মুসলমান প্রাণে ব্যথা পেয়ে থাকেন তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তা বললে কি হবে, উপায় নাই; ইণ্ডিয়ান বললে এরা Red Indian ভাবে; ন্যাসন্যালিজম আজকের দিনে পুরানা কথা। আমি ন্যাসন্যালিষ্ট হয়ে একটি সাংবাদিকের সংগে কথা বলছিলাম। শ্রীযুক্ত জগৎবন্ধু দেব (ত্রিপুরা) আমাকে সেই আলাপে সাহায্য করেছিলেন।

"আপনি বলছেন, জাতে আপনি হিন্দু, দেশ হিন্দুস্থান, যাকে ইংলিশে লেখা হয় ইণ্ডিয়া। আপনাদের দেশের সকল লোকই যে স্বাধীনতা চায় সে কিরূপ স্বাধীনতা?"

"এই ধরে নিন ক্যানাডার মত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্।"

"এতে কি আপানাদের দেশের লোক সুখী হবে, না হতে পারে? রাজা, নবাব, জমিদার এসব কি রাখতে চান্? এতে কি রিয়েল এস্টেট ওনার-এর সংখ্যা বাড়বে না? গরীবের সর্বনাশ হবে না? এতে কি সাদা পুঁজিবাদীদের জায়গায় ব্রাউন্ পুঁজিবাদীদের বসান হবে না?"

"তা হোক মশায়, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।"

"এই ধরে নিন হরিজন, দরিদ্র, এরা কি উন্নতি লাভ করতে পারবে? এরা কি শিক্ষিত হয়েও, ধনী হয়েও এ দেশের নিগ্রোদের মত সমাজের উচ্চ স্তরের লোকের সংগে মিশতে পারবে? এরা কি মানুষ বলে গণ্য হবে?"

"হোক না হোক বয়ে গেল, আমাদের স্বাধীনতা হলেই হল।"

ন্যাসন্যালিজম এর বেশী এগোয় না। ন্যাসন্যালিজম পুরাতন কথা। পুঁজিবাদী এবং সমাজের শত্রু এতে আত্মগোপন করে সুখে স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে।

রিপোর্টারের সংগে কথা হবার পর শ্রীজগৎবন্ধু দেব বললেন, "ফরগেট ইট" ভুলে যান। আমি কিন্তু ভুলতে পারি নি। কেন যে বলেছিলেন 'ভুলে যান' তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমেরিকার যত হিন্দু আছেন তাঁরা প্রায়ই জাতীয়তাবাদী। জর্জ ওআশিংটন থেকে লিন্কন পর্যন্ত সকলেই জাতীয় ভাবের পূজারী ছিলেন। তাঁদের মতবাদ এখনও আমেরিকার শতকরা সত্তরজন লোক মেনে চলে। তারাই রাষ্ট্রের নীতি ধার্য করে। তাদের নীতি যারা মানে না তাদের তারা কোনওরূপ সাহায্য করে না। যদি দেখে সরকারী তহবিল থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত কেউ তাদের নীতির বিরুদ্ধে চলছে, অমনি তার সাহায্য

বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমেরিকায় এখনও হিন্দুরা বসবাস করবার অধিকার পায় নি; এমন অবস্থায় তাদের মনের আসল ভাব গোপন করাই কর্তব্য। দে মহাশয়ের মনের ভাব কি তা আমি জানতাম না, আমাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করিয়েছেন বলে মনে হল। পর্যটকদের এমন ভাবে অনেকে ব্যবহারে লাগায় তা আমি আগেও জানতাম তাই চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ভারতীয় পর্যটক বিদেশে ভারতের সম্বন্ধে সত্যপ্রচারের নানারকম বাধা বিঘ্ন পায়। এই সব বাধা বিঘ্ন দূর করবার আশায় বিট্ঠল ভাই পেটেল অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ডিট্রয় নগরীতে অনেক দিন ছিলেন। তাঁর দুঃখের কথা তিনি অনেক সময় বলতেন। অনেক অশিক্ষিত হিন্দুরাও সে করুণ কাহিনী শুনে অনেক অপকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধের চারিপাশে শতাধিক লোক সকল সময় বসে থাকত। তিনি মুসলমানদের মোল্লা ছিলেন না পীরও ছিলেন না, তবু তারা তাঁকে সর্বদা ঘিরে বসে থাকত তারা ভারতের অশিক্ষিত মুসলমান। শওকত আলি জানতেন, সাগর পারের মুসলমানরা পেটেলকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, কত আদর-অভ্যর্থনা করত। যাঁরা দুঃখকষ্ট সয়ে ভারতের গরীবদের সংগে মিশেছেন তাঁরাই জানেন, ওরা কত উদার। আমি যখন ডিট্রয় পৌছই, বিট্ঠল ভাই পেটেলের কথা তখন প্রত্যেক লোকের কাছে শুনতে পেতাম। বিট্ঠল ভাই পেটেল যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি অনেক বেকার হিন্দুকে সাহায্য করেছিলেন। তারা হয়তো আর ভারতে ফিরে আসবে না, এলেই হয়ত দুঃখে কষ্টে তাদের জীবন কাটাতে হবে। আমেরিকাতে তাদের কাজ করবার অধিকার নাই সেইজন্যই তারা কষ্ট পাচ্ছে। কাজ করবার অধিকার নাই শুনে অনেকে হয়তো ভাববেন তাদের কেরানীগিরির অধিকার

নাই। কেরানীর কাজের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। আমেরিকায় কোন পুরুষ লোক কেরানীর কাজ করে না। জুতা পরিষ্কার করা, পথ পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, নাপিতের কাজ, চাষার কাজ, ফেক্টরী মজুরের কাজ এসব কাজই ভারতবাসীরা চায়।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে বিদায় দিয়ে শ্রীযুক্ত দেবকে সংগে নিয়ে কাছেরই একটা থিয়েটার হলে গেলাম। সিঁড়ি ভয়ানক অপরিষ্কার ছিল। হলের চেয়ারগুলা অনেক দিনের পুরাতন। সভাপতির আসনের পিছন দিকের দরজার কাচ ভাংগা ছিল। দিবালোক তা দিয়ে ঢুকে এমন ভাবে শ্রোতাদের চোখে মুখে পড়ছিল যে, সে আলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালে সভাপতি বা বক্তার মুখই দেখা যায় না। রেষ্টরুমের (পাইখানা) অবস্থা এত কদর্য ছিল যে, সমস্ত হলটাতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন তাদের পায়ের মোজা কতদিন যে ধোয়া হয়নি তার ঠিক নাই; পায়ের মোজা হতে দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল। দুর্গন্ধের জন্য শ্রোতাদের কাজে বসা কষ্টকর হচ্ছিল। এরূপ শ্রোতা দেখতে পাওয়া যায় গির্জ্জায়, যেখানে শ্রোতাদের কিছু খাবার খেতে দেওয়া হয়। চার্চের লেকচারে যদি খাওয়ার খেতে দেওয়া না হয়, তবে লোক চার্চে যেত কি না সন্দেহ। এই সভায় খাবারের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না বরং শ্রোতাদের পকেটে হাত পড়বার সম্ভাবনা ছিল তবুও ঘরটা দেখলাম একেবারে লোকে ভর্তি হয়ে গেছে।

যখন গিয়ে আমি গ্যালারিতে দাঁড়ালাম, তখন অনেকেরই মনে খট্‌কা লেগেছিল। এরা ভেবেছিল আমি একজন নিগ্রো। লোকের সে চাহনিতেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। নিগ্রো কি মানুষ নয়, তারা কি শিক্ষিত হতে পারে না? এই কথাটা নিয়েই অন্তত এক ঘণ্টা

বলেছিলাম। শেষে বলেছিলাম, কাউকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা মানে ভবিষ্যতে নিজেরই দমিত হবার পথ প্রশস্ত করা।

সুখের বিষয়, আমেরিকায় লেকচারের পর শ্রোতাদের পক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রথা আছে। আমেরিকার সাধারণ লোক সংবাদপত্র পাঠ করে তৃপ্ত নয়, মুখের কথায় সংবাদ শোনবার আগ্রহই যেন তাদের বেশী। যখন বললাম আমি ভাল ইংলিশ জানি না বলে কেউ যেন কিছু মনে না করেন, তখন অনেকেই বললেন, আপনি ভাল ইংলিশ জানেন না শুনে আমরা আনন্দিত। ভাল ইংলিশ জানলে সরল ভাষায় সত্য কথা বলতে সক্ষম হতেন না, যত সব বুদ্ধি খাটানো বজ্জাতি আর কূটনীতিপূর্ণ ভাষার বাহুল্যে আমাদের কর্ণকুহর পূর্ণ হত। আজ আমেরিকার লোক আর জিজ্ঞাসা করে না ভারতে শিশু-বিবাহের কারণ কি, হরিজন কি করে হল। যারা ফিউড্যালিজ্‌ম-এর উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করেছে এবং সম্রাট সৃষ্টির কারণ শুনেছে, তারাই বুঝেছে হরিজনের সৃষ্টি কেমন করে হয়। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ একদা হীন স্তরে পৌঁছেছিল তার সংবাদ অনেকেই জানত না। শুনেছি মার্কস্‌-ও নাকি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে যান নি। আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থার সংগে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সংগে হরিজনদের তুলনাই হয় না। ভারতে হরিজনদের মনুষ্যত্ব থেকে বন্‌চিত করে রাখা হয়েছে এ কথা বলতে বাধ্য।

আজ ব্রিটেনের সাধারণ শিক্ষিত লোক ভারতের আধ্যাত্মিক সংবাদ জানতে চায় না। তারা জানতে পেরেছে, যে-দেশে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বন্‌চিত করে রাখা হয়েছে, সেদেশের বড় বড় তথ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা—আধ্যাত্মিকতাই নয়। তবে যারা ভারতের আধ্যাত্মিকতার সংবাদ শুনে বিভোর হয়, সংবাদপত্রে ভারতের আধ্যাত্মবাদের

বক্তৃতাদি আগাগোড়া ছাপিয়ে দেয়, তারা হল আমেরিকার ধনী সম্প্রদায়।* এই ধার্মিকরা অপরকে ঠকিয়ে ধনী হয়েছে, তাই চায় ধর্মযাজকদের ঘুষ দিয়ে একটু পারলৌকিক সদ্গতি সন্চয় করতে। তারা বড় বড় বিল্ডিং গড়ে দিচ্ছে এবং ধর্মযাজকদের সর্বতোভাবে সুখী রাখবার চেষ্টা করছে। যারা চোরের উপর বাটপাড়ি করে, তাদের মনের শক্তি অসীম। এই শক্তিই বোধ হয় ভারতের আধ্যাত্মিকতা।

বক্তৃতার পর আমি পারিশ্রমিক চাই নি। সভাপতির কথায় গরীবরা পকেট খালি করে একটি টুপিতে ফেলতে লাগল আর বলতে লাগল, "আজ খাঁটী হিন্দুর কাছ থেকে পৃথিবীর অনেক সত্য সংবাদ শুনতে পেয়ে পকেট শূন্য করে ফিরতে দুঃখ নাই।"

এখানকার নিগ্রোসমাজ বেশ বড়। শহরের একচতুর্থাংশ তাদেরই দখলে। তাদের বাড়িঘর আমেরিকানদের মত, তাদের চালচলনও সে রকমেরই। শিক্ষার দিক দিয়েও এরা খুব উন্নত। অনেক সময় দেখা যায় অনুপাতে শ্বেতকায়দের চেয়ে নিগ্রোরা বেশী শিক্ষিত। অর্থের দিক দিয়েও তারা দরিদ্র নয়। কোন অংশে কম না হলেও এরা হোটেলে শ্বেতকায়দের সংগে খেতে পায় না। শ্বেতকায়দের হোটেলে গিয়ে শুতে পায় না। এই ব্যবহারিক বৈষম্যের ফলেই এদের মাঝে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছে। শ্বেতকায়রা প্রতি পদেই সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে এবং সেই সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। নিগ্রো চাকরানী রান্না করতে পারে, বাসন মাজতে পারে, খাবার এনে টেবিলে দিতে পারে, পাশের ঘরে উত্তম শয্যায় শুতে পারে, মনিবের ছেলেমেয়েকে ঠেংগাতে পারে, অনেক সময় মনিবকে গাল দিতে পারে, কিন্তু ওই ঠেংগানো

* যীশুখৃষ্ট পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সহস্র বৎসর কাল রাজত্ব করবেন এই মতে বিশ্বাসী।

ছেলেই যখন শেতকায়দের রেস্তরাঁয় গিয়ে খেতে বসে তখন ঘরের চাকরানী একসংগে রেস্তরাঁতে প্রবেশ করতে পারে না।

আমাদের দেশের জনৈক ভদ্রলোক ডিট্রয় শহরে বাস করেন। তিনি নিজকে মিঃ গুহ বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। লোকমুখে শুনলাম তিনি রুশিয়ার নাগরিক। রুশিয়ার নাগরিক বলেই তিনি কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রকাশ্যে লেকচার দিতে সক্ষম হন। তাই যদি না হ'ত তবে বহু পূর্বেই তাঁর মুখ বন্ধ হবারও বন্দোবস্ত হত। সুখের বিষয় এই ভদ্রলোক অন্যান্য ভারতবাসীর মত শ্বেতপাড়াবাসী হবার প্রত্যাশী নন। তিনি থাকেন নিগ্রো পাড়ায়। লেকচার দেন তাদেরই কাছে এবং যাতে করে নিগ্রোদের উন্নতি হয় সে কথাই তাদের সকল সময় বলে থাকেন।

ডিট্রয় প্রকাণ্ড শহর। এ শহরের লোকসংখ্যা অর্ধ লক্ষ বলেই শুনেছি। এখানে ফোর্ডের কারখানা রয়েছে। সকাল বেলা যখন মজুরের দল ফোর্ডের কারখানায় প্রবেশ করে সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। বিদেশ হতে যারাই ডিট্রয় শহর দেখতে আসে তারাই ফোর্ডের কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে সকাল বেলা মজুরদের কারখানায় প্রবেশ করা দেখে। সে দৃশ্য দেখতে সকলেরই ভাল লাগে। মজুরের দল সুবিন্যস্ত এবং তাজা মন ও শরীর নিয়ে কাজ করতে আসে, সকলেরই হাসি মুখ। সকলের হাত, পা, বুদ্ধি এবং শরীর কাজ করতে উৎসুক। সেদৃশ্য আরামদায়ক।

হাজার হাজার মোটরকার একটানা স্রোতের মত ক্রমাগত গেট দিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করে। একটি লোকও কথা বলে না কিংবা একটি লোকও মোটরে হর্ন দেয় না, অভ্যস্তমতে অন্যের সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে কারখানাতে প্রবেশ করে। তাদের এই আচরণের

পিছনে ধর্মের প্রেরণা নাই, কারও আদেশ নাই ; আছে শুধু ডিসিপ্লিন। অনেকের ধারণা, যাদের অভাব নাই, শৃঙ্খলা তাদেরই থাকে। আমাদের দেশে অনেকের অভাব নাই, অথচ তাদের মাঝে ডিসিপ্লিনের লেশও দেখা যায় না। মজুর সমাজকে সাধারণত পশুর সংগে তুলনা করা হয়। ফোর্ডএর কারখানার মজুরদের দেখলে মনে হয় প্রতেকটি মজুর ভদ্র, শান্ত এবং সভ্য। আমাদের দেশে কেরাণী, ইন্‌জিনিয়ার, ডাক্তার এরা কিন্তু নিজেদের মজুর বলতে রাজি নয়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হতে আরম্ভ করে ডিস্‌ওয়াসার সকলেই মজুর।

মজুরের দল যখন কারখানায় প্রবেশ করে তখন তারা মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করে। তাতে আমাদের দেশের অমুক কি জয়-এর মত ফোর্ডএর বা কারও নাম জড়িত থাকে না। তারা জয় দেয় নিজ নিজ জাতের—সর্বসাধারণের, কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়। আমাদের দেশের মজুর অনাহারে থাকে আর ফোর্ডের মজুররা পকেট ভরে মজুরি পায়, পেট ভরে খায়, প্রাণ ভরে ঘুমোয় এবং স্বচ্ছন্দে পরিশ্রম করে শরীরের রক্তচলাচল সতেজ রাখে ; তাই তাদের পরিষ্কার মগজে নিত্য নূতন পরিকল্পনা জন্মাবার সুযোগ হয়। অন্য দেশের মজুরদের মাঝে যেমন দোষ গুণ সবই আছে ফোর্ডের কারখানাতেও যে দোষ একেবারে নাই তা নয়, তবে যখনই কোন দোষ দেখা দেয় এবং তা ধরা পড়ে তখনই তার প্রতিকার করা হয়। সুপারভাইজার, সাধারণ মজুর এবং ম্যানেজ্যর, সবাইকেই ফোর্ড বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের মধ্যে অফিসার ও সাবঅর্ডিনেট কেউ নয়, তাঁরা সকলেই মজুর ও সহকর্মী ; সকলেরই মনে রাখা উচিত এই কারখানাতে কেউ কোনওরূপ বিশেষ অনুগ্রহ পাবে না ; খোশামোদকারীকে ডিসমিস করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রমোশন সেখানে ভোটের সাহায্যে হয়, প্রমোশন

দেবার অধিকার কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাই। এই ধরনের আরও এমন কতকগুলি আইন আছে, যা দেখলে মনে হয় সে সব নিয়ম রুশিয়া থেকে ধার করে আনা হয়েছে। এজন্যই ফোর্ডের কারখানায় ধর্মঘট হয় না এবং মজুরদের দেখলেই মনে হয় তাদের মনে সুখ শান্তি আছে।

যুগের বাতাস এহেন কারখানাতেও বইছে দেখতে পেলাম। এরই মাঝে মজুরদের মাঝে রব উঠেছে মিঃ ফোর্ড নিজে থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যারা কারখানার মুনাফা থেকে বৎসরের শেষে মোটা টাকা বার করে নেন, তা বন্ধ করতে হবে, মিঃ ফোর্ডকেও নূতন মতে নূতন পথে চলতে হবে।

ফোর্ডের কারখানাতে আগে অনেক হিন্দু কাজ করতেন। বর্তমানে ইমিগ্রেসন আইন মতে যাদের সেকেণ্ড পেপার (second paper) নাই অর্থাৎ যারা আমেরিকার বাসিন্দা নয়, তাদের আর নূতন করে কাজ দেওয়া হয় না, উপরন্তু যারা পূর্বে কাজ করত তাদেরও কাজ থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। এখন ফোর্ডের কারখানায় আর কোনও হিন্দু কাজ করে না।

ভারতবাসীকে কাজ হতে তাড়িয়ে দিবার কারণ দেখান হয়েছে ভারতবাসী বিদেশী। বিদেশের লোক এসে যদি আমেরিকার লোকের কাজ কেড়ে নেয় তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমাদের দেশেও বলা হয় উড়ে এবং হিন্দুস্থানীরা বাংগালীর কাজ কেড়ে নিচ্ছে। কি সুন্দর কথা। যেকথা বলে আমেরিকার ধনীরা তাদের স্বদেশবাসী মজুরদের ক্ষেপিয়ে অপরের সর্বনাশ করছে সেই কথা আমাদের দেশের অর্থতত্ত্ববিদরাও উঁচু গলায় চিৎকার করে প্রতিধ্বনি করছেন মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে মজুর কখনও মজুরের শত্রু হতে পারে না। ধনীরা

মুনাফা বেশি করে পাবার জন্যই জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে মজুর দিয়ে মজুরের সর্বনাশ করায়।

সুখের বিষয় আমেরিকার মজুররা আর ঘুমিয়ে নাই। তারা আজ আর সংকীর্ণ জাতীয় ভাবের দাস নয়। আমেরিকার মজুর যাতে তাদের অবস্থা এবং সকল মজুরের অবস্থা ভাল করে বুঝে সেজন্য ভারতীয় বেকার মজুরগণও চেষ্টা করছে। আমেরিকার ভারতীয় মজুরগণ আর ধর্মের দাস হয়ে থাকছে না। পূর্বে তারা ধর্মের দাস হয়ে থাকবার জন্যই আমেরিকার নাগরিকত্ব হারিয়েছে, সেকথা আজ অনেকেই বুঝতে পেরেছে। আজ আর তারা তাদের পৃথক সত্ত্বা দেখে না। তারা দেখতে পেয়েছে পৃথিবীর সমস্ত মজুর একটা শ্রেণী। সেই শ্রেণীতে তাদেরও স্থান, অতএব বিশেষ করে নিজের অথবা নিজের দেশেয় মজুরের কথা চিন্তা করে কোন লাভ নাই। মজুরদের মাঝে ছোট ছোট গণ্ডিগুলিই মজুরের শক্তি ক্ষয় করে এবং ধনীদের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

ফোর্ডের কারখানা দুবার দেখতে গিয়েছিলাম। বড় বড় মেশিন, বড় বড় গুদাম, বড় বড় যন্ত্র দেখে যেমন মনে বিস্ময়ের সন্চার হয়েছিল, তেমনি কলকারখানার ল্যাবরেটরিতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সব নিক্তি দেখে মনে হয়েছিল অত বড় মোটর তৈরী কাজে কত ক্ষুদ্র জিনিসেরও দরকার হয়। যারা এই কারখানায় কাজ করে তাদের পোষাক এবং আচার ব্যবহার দেখলে মনে হয় না এরা পদমর্যাদায় কেউ কারও চেয়ে ছোট। মনে হয় এদের মাইনের কোনও প্রভেদ নাই, এদের মধ্যে ছোট বড় নাই। কেউ কাউকে 'বড়বাবু' 'বড়সাহেব' বলে তোষামোদ করছে না, সবাই সমান ভাবে কাজ করে চলেছে। পরিশ্রম করছে বলে কারও কপালে ঘাম আর দিনের কাজ শেষ করেছে বলে কারও মুখে হাসি ফুটে উঠছে। কেউ অন্যকে হিংসা করে না। তারা প্রত্যেকে জানে কাজ করতেই

হবে। নারী মজুরগণ পুরুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য সময় করে এসে পুরুষদের কাছে দাঁড়িয়ে সাহস দিচ্ছে, মিষ্টি কথা বলে পুরুষদের শক্তিশালী করে তুলছে।

ফোর্ডের কারখানায় মজুরগণ যখন কারখানা বন্ধ থাকে তখনও তারা কিছু পায়। আমেরিকার অন্য কোন কারখানায় সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। উৎপাদনের চাহিদা মিটিয়ে কল বন্ধ করে দেয়। কলের মালিকগণ লাভের টাকা দিয়ে আনন্দ করে আর মজুরগণ হাঁ করে অপেক্ষা করতে থাকে কখন আবার কল খুলবে। তবে আমাদের দেশের মজুরের মত তারা হাঁ করে থাকে না, তারা অন্য কিছু করে, যেজন্য অনেক সময় সেনেটের মেম্বারদেরও কেঁপে উঠতে হয়। আমার লেখা ভাগ্যক্রমে যদি কোন ভারতীয় মজুর পাঠ করে তবে হয়ত ভাববে আমেরিকার মজুরও হাঁ করে থাকে, আমাদেরও তাই করা উচিৎ। সেজন্যই কথাটা আরও বিশদভাবে বলতে হচ্ছে। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে পূর্বে অনেক বলা হয়েছে সেজন্য কথা বাড়িয়ে আর লাভ নাই।

ফোর্ডের কারখানায় দুদিন যাবার পরও মনে হত আবার গিয়ে দেখে আসি, কিন্তু সেরূপ করবার মত সুযোগ আমার হয়ে উঠেনি। আমাকে চিকাগোর দিকে রওয়ানা হবার পূর্বে ডিট্রয়ের আরও অনেক কিছু দেখতে সময় ক্ষেপণ করতে হয়েছিল। ডিট্রয় নগরে অনেকগুলি পার্ক আছে। লেক্‌এর তীরে একটি পার্কে বসেছিলাম আর লেক্‌এর জল কেমন করে তীরে এসে আঘাত করছিল তারই দিকে লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় একটি লোক আমারই পাশে বসল।

লোকটির কপাল হতে ঘাম পড়ছিল। পোষাক অপরিষ্কার ছিল, পায়ের জুতা ছেঁড়া ছিল। সে আমার কাছে বসেই একটা সিগারেট

চাইল। আমি তাকে সিগারেট দিয়ে ভাবলাম এদের যত লজ্জা সবই নিজের লোকের কাছে। অশ্বেতকায়দের কাছে এরা ভিক্ষা করতেও কোনরূপ লজ্জা অনুভব করে না। কারণ, অশ্বেতকায়দের এরা মানুষ বলে স্বীকার করে না। লোকটি যুবক। বয়স বোধহয় আঠার উনিশ হবে। তবে শরীরের গঠন দেখলে মনে হয় তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। যুবক জানত না আমি তাকে ভয়ও করি না, তার কোন তোয়াক্কাও রাখি না। সেজন্যই জিজ্ঞাসা করলাম, "কাজের খুঁজে গিয়েছিলে বুঝি?" লোকটি বলল, "বেশ বুঝতে পেরেছ ত? সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঘুরে এলাম কোথাও কোন কাজ পেলাম না। পায়ের জুতা ক্ষয় হয়ে গেছে। ভয় করার কিছুই নেই, আর একটা দিন দেখব তারপর হেস্তনেস্ত একটা কিছু ঠিক করে নেব।"

আমেরিকার যুবকগণ যখন কাজ পায় না তখন তারা গলায় দড়ি দিয়ে গংগায় ডুবতে যায় না। ভাগ্যের উপর সব ছেড়ে দিয়ে পথে বসে না। তাদের দেশে এখনও ভাগ্য এবং ভগবানের স্থান নাই। তাদের আছে পুরুষত্ব। কাপুরুষ, ধূর্ত, এবং ইতরগণই ভাগ্য এবং ভগবানের কথা বলে সকল অন্যায় কাজই করে। যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম কোন্ দিকে যাবে স্থির করেছো? যুবক হেসে বললে "তুমি কি আমাকে গ্রেপ্‌স বয় ভাবলে নাকি? এত বড় শরীরটা কাজেই লাগবে হে। দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব।" তারপর সে কতক্ষণ হাসলে। উঠবার পূর্বে আমার কাছ থেকে দশ সেণ্ট চেয়ে নিয়ে নিকটস্থ একটা রেঁস্তোরায় বসে এক পেয়ালা কাফি খেয়ে আমার কাছে পুনরায় আসল। তাকে আর একটা সিগারেট দিলাম। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি কাদের দালাল হে?" আমি হেসে বললাম, "আমি কারো দালাল নই তবে সবই ত জানি।" যুবক ফের আমাকে জিজ্ঞাসা

করল, "বলত কোন দলে যোগ দেওয়া ভাল?" আমি আরও একটু হেসে বললাম, "আমি কোন দলের সন্ধান রাখি না, আমি বিদেশী পর্যটক। আমি একজন হিন্দু তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি। এদেশে নানারূপ দলের কথা আমাদের দেশের লোকের কাছে শুনেই সেজন্যই এত কথা বলতে সক্ষম হলাম। তোমার মত আরও অনেক যুবকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কোন দলে যোগ দেবে? আমি প্রত্যেককে বলেছি 'কমিউনিষ্ট দলে যোগ দাও তবেই ভবিষ্যতে ভাল হবে।" যুবক কি একটা কথা বলে আমার কাছ থেকে উঠে চলে গেল। বোধহয় ফ্রেন্চ বলেছিল। যখনই কারো রাগ হয় তখনই তাদের মাতৃভাষা কণ্ঠে এসে ভর করে। আমাদের যখন রাগ হয় তখন আমরা ইংলিশ আরবী, ইরাণী সবই বলি শুধু বলি না মাতৃভাষা।

শক্তিমন্ত যুবকগণ যখন কাজ পায় না তখন তারা দলে যোগ দেয় এ কথাটা আমি জানতাম। এই যুবকগণ, প্রায়ই ডাকাতের দল গঠন করে এবং রাজকর্মচারী বড় বড় ধনী, ব্যবসায়ী এবং সর্বসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেশ শাস্তি দেয়। বড় বড় ডাকাতি, নরহত্যা তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যখনই হত্যার সংখ্যা বেড়ে চলে তখনই সরকারের চাপে ধনীরা নতুন নতুন কাজ আরম্ভ করে। ধনীরা টাকা ব্যাংকে রেখেই সুখী হয়, তারা টাকা খাটাতে চায় না, তারা যখন দেখে লোক না খেয়ে মরছে তখন তারা সুখী হয়। এটা রীতি নয় নীতি। আমেরিকার ধনীরা সেই 'সুনীতি' পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আজ আমেরিকাতে এত বড় বড় বিল্ডিং উঠেছে এই ডাকাতদেরই আদেশে। এত স্কুল কলেজ, শিশুসদন, বৃদ্ধদের পেন্‌সন, মাতৃজাতির রক্ষা. কারো লেকচার শুনে অথবা কারো

অনুকম্পায় গড়ে উঠছিল না, ঐ বেকার মজুররা যখন ডাকাতি করত, ধনীদের বেতনভুক চাকর সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেখত, আর পারা যায় না তখনই তারা ধনীদের চাপ দিয়ে নানা সৎকাজে নামাত। আমাদের নব পরিচিত যুবকও সে সব দলেরই কোনও একটাতে যোগ দিতে চলেছিল।

আমেরিকার নিগ্রোরা এরূপ দলে যোগ দেয় না তবে সাহায্য করে। নিগ্রোরা বড়ই কম কথা বলে এবং তাদের কাছ থেকে কোন গোপনীয় কথা বের করতে পারা যায় না। সেজন্য নিগ্রোরা আমেরিকানদের এজেন্টের কাজে নিযুক্ত হয়। নিগ্রোদের যেমন করে আমেরিকানরা নির্যাতন করে তেমনি নিগ্রো সাহায্য ছাড়া এদের চলেও না। লক্ষ্য করে দেখেছি যখন কোন নিগ্রো কোন আমেরিকানের সংগে কথা বলে তখন নিগ্রো প্রায়ই হয় উপদেষ্টা আর আমেরিকান হয় আদেশ-পালক।

এরূপ নিয়ম কিন্তু সর্বত্র সকল সময় প্রতিপালিত হয় না। এটি শুধু আমেরিকাতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং আমেরিকার নিগ্রো দ্বারাই সম্ভবে। অনেক সময় দেখা যায়, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা নিগ্রো চাকরের ঘরে খেতে এবং থাকতে ভালবাসে। যেদিন আমেরিকান যুবক মাতৃগৃহ হতে বিতাড়িত হয় সেদিন মা যেমন করে কাঁদে, তেমনি কাঁদে নিগ্রো চাকর।

ইউরোপ এবং আমেরিকার সর্বত্র ছেলেদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়মের আর্ষ প্রয়োগও আছে। ধনীরা তাদের ছেলেদের তাড়ায় না। তাদের ছেলে যদি অপদার্থও হয় তবুও তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। আমি সাধারণ লোকের ছেলেদের কথাই বলছি। আমেরিকায় মধ্যবিত্ত বলে আর একটি শ্রেণী নাই। ধনীরা যখন গরীব হয় তখন তারা হয়,

গরীব শ্রেণীভুক্ত মধ্যবিত্ত হয় না আর গরীবরা যখন ধনী হয় তখন তারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েই ধনী হয়। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত বলে একটি শ্রেণী পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা এখন না বলে যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলছি।

আমেরিকান মা শিশুরক্ষার ভার নিগ্রো চাকর অথবা চাকরাণীর হাতেই ছেড়ে দেন। এতে ছেলেমেয়েরা নিগ্রো ঘেসা হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠে তবে কেন লিন্‌চ্ করা হয়। শুধু নিগ্রোদেরই লিন্‌চ্ করা হয় না শ্বেতকায়দেরও আমেরিকাতে লিন্‌চ করা হয়। শ্বেতকায়দের লিন্‌চ্ করার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় না, শুধু নিগ্রোদের কথাই প্রকাশিত হয়।

আমেরিকার লোক বড়ই মাতৃভক্ত। ডিট্রয়ে অনেকবার সাদা এবং কালোতে লড়াই হয়েছে, কিন্তু যেখানে নিগ্রো রমণী ঝাঁটা হাতে করে শ্বেতকায়দের আক্রমণ করেছে সেখানেই শ্বেতকায়রা বন্দুক, পিস্তল এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র পরিত্যাগ করে পালিয়েছে। আমেরিকানরা নিগ্রো রমণীকেও তাদের শ্বেতকায় মা বোনদের মতই সম্মান করে।

আমেরিকায় লিন্‌চ্ প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, কে অথবা কারা এর প্রবর্তন করেছিল তা আমি জানি ; তবে এসব কথা অশ্লীল হবে বলেই এখানে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। শ্বেতকায়দের লিন্‌চ্ যাতে না করা হয় সেজন্য স্ত্রীলোকদের দোষ দেখিয়ে একখানা ফিল্মও করা হয়েছিল, সে ফিল্ম এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। পান্‌জাবীরা আমেরিকায় গিয়ে সার্ট অর্থাৎ আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় কামিজ লম্বা পেণ্টের উপরে ঝুলিয়ে রাখত বলেই হয়ত ভারতবাসী আমেরিকার নাগরিক হতে পারবে না। পন্‌চাশ বৎসরের পুরাতন অপকর্মের ফলের জের আমাদের টান্‌তে হবে। ইরাণীরা বলে "আপ রুচি খানা আর পর

রুচি পরনা।" আমরা প্রবাদটি জানি কিন্তু প্রবাদ অনুযায়ী কাজ করি না।

ডিট্রয় নগরে যখন আমি একাকী ভ্রমণ করতাম তখন ইচ্ছা করেই নিগ্রোদের মত কথা বলতাম এবং ফেল্ট হেটের অগ্রভাগটা ঘোমটার মত টেনে দিতাম। এতে আমার মাথার চুল এবং লম্বা নাক অনেকটা লুকাতে পারতাম। চলার মাঝেও রকম আছে। যদি কারো একাজটি করতে হয় তবে মন হতে কর্ম তালিকা বাদ দিয়ে ধীরে সুস্থিরে পথ চলতে হবে। দেওয়াল ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে থাকতে হবে, পথচারীকে বুঝাতে হবে যে তুমি একজন বেকার নিগ্রো। পৃথিবীর খাবার অন্বেষণ ছাড়া আর কিছু তোমার করার নাই, তবেই নানা লোক নানা কথা তোমার কাছে বলতে ভয় করবে না।

ডিট্রয় শুধু কলকারখানার কেন্দ্র নয়। আমাদের দেশের লাটগণ শীতের সময় পাহাড়ে পর্বতে চলে যান এখানেও ঠিক সেরূপ গরমের সময় অনেক ধনী লোকের সমাগম হয়। ধনীদের মুখ হতে নানা কথা অতর্কিতে বেড়িয়ে পরে। ধনীর গৃহমজুর সে সংবাদ চড়া দামে সংবাদ-পত্রে বিক্রি করে বেশ লাভবান হয়। সংবাদ বিক্রি করার জন্য দরিয়া বিবির মত "দিল্লীতে সংবাদ বিক্রির জন্য দৌড়াতে হয় না।"

পলিটিক্সই হ'ল লোকের প্রাণ। সেই প্রাণ নিয়ে যারা খেলা করে তাদের প্রতি লোক তাকিয়ে থাকে। ১৯৩৯ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে আমি ডিট্রয় পৌছি। সে সময়ে ডিট্রয়ে বেশ হল্লা গোল্লা করে রাষ্ট্র-নীতির কথা চর্চ্চা হচ্ছিল। আমি রাষ্ট্রনীতির কথা শুনতে বেশ ভাল-বাসতাম বলেই সেই কথাগুলি কান পেতে শুনতাম এবং যতদূর পারি ততটুকু কাগজে এবং মনের কোণে টুকে রাখতাম।

ওদের কথা শুনে মনে হ'ত আমেরিকার মজুরশ্রেণী আমেরিকার

ধনিকদের মত ভূমি সাম্রাজ্যবাদ মোটেই পছন্দ করে না। আমেরিকার মজুর বেশ ভাল করেই জানে তাদের কাঁচা মালের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয় না। খনিজ দ্রব্য তাদের প্রচুর আছে, তবে কেন কয়েক মণ চিনি, আর শনের জন্য ফিলিপাইনোদের নিজের ঘরে ডেকে এনে কাজ দেওয়া হবে। ফিলিপাইনোরা আমেরিকা হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হউক ইহাই হল মজুর শ্রেণীর মনের কথা। মজুরের কথা শুনে ধনীরা চলে না। ধনীরা মজুরদের খাটায়, মজুরদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, মজুর তাই মাথা পেতে সহ্য করে, অতএব মজুরের কথার কোন মূল্যই নাই।

কথা হচ্ছিল বেকার মজুরদের কি করে খাটানো যায়। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাসই কলের মালিক কল বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয় কারণ বাজারের চাহিদার বেশি যদি মাল উৎপাদন করা যায় তবে মাল সস্তা হয়ে যাবে, বাজার মন্দা হবে, ডলারের ভাও কমে যাবে, এটা যে একটা মহা ফেসাদ। সেই ফেসাদ কি করে মিটিয়ে ফেলা যাবে তাই নিয়ে হচ্ছিল কথাবার্তা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক কি করল না করল তা নিয়ে আমেরিকার ধনীরা মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না।

মজুরদের সি, আই, ও হতে বেকারী ভাতা দেওয়া হয়, তাই নিয়ে অনেক ধনী অনেক সময় বিগড়ে যায়। এদিকে যদি মজুর মরে যায় তবে ভবিষ্যতে কাজও চলবে না, মহা চিন্তার বিষয় বটে, সংকটের কথা বটে, বিপদের কথা বটে। মজুরকে খেতে দিতে ভাল লাগে না, মজুর মরে গেলেও কল চলবে না, এটা কি কম চিন্তার বিষয়। স্বর্গভূমি আমেরিকা, তোমার কোলের ধনীরা কি করে শান্তি পেতে পারে সেকথা তারা চিন্তা করে বের করতে পারছে না; তা দেখে চীনের ছোট্ট সোভিয়েটও হাসে! হাসবার কথাই। মানুষের যখন অর্থলিপ্সা বেড়ে

যায় তখন তার হিতাহিত জ্ঞানও লোপ পায়। সুখের বিষয় আমেরিকার বৃটিশের মত ভূমি সাম্রাজ্য নাই, তাতেই রক্ষা, নতুবা আমেরিকায় ধনীরা কবে পাগল হয়ে নিজের মাথায় নিজে পিস্তল মারত তার ঠিক নাই।

ডিট্রয়ের নিগ্রো অন্চলে একটি ভারতীয় খাবারের দোকান আছে। সেই খাবারের দোকানে আমাকে এক দিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েও ছিলাম। রেঁস্তোরার সামনে কোনরূপ সাইনবোর্ড টাংগানো ছিল না। কিন্তু পথিক সে পথে গেলেই বুঝতে পারে ভারতীয় রেঁস্তোরার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় কারি পাউডারের গন্ধ ঘরের সামনের দরজা খুললেই পথ আমোদিত করে। একজন শ্রীহট্টবাসী এই হোটেলটি পরিচালনা করেন এবং তিনি নিজে পাকও করেন। তিনি প্রত্যহ দুবার করে পাক করেই বিশ্রাম নেন। দোকানের ক্রেতা এবং বিক্রেতা সকলেই নিগ্রো।

খাবার খেয়ে খুব আনন্দই পেয়েছিলাম। সর্বপ্রথম সুপ্ দেওয়া হয়েছিল, মটরডাল পাতলা করে পাক করে তাতে জাফ্রাণ দিয়ে বেশ সুন্দল রং ধরানো ছিল। দ্বিতীয় দফায় ছিল একটি প্লেটে সামান্য ভাত এবং এক থালা শস্তবাটা দেওয়া মাছ, অন্য আর একটি প্লেটে পেয়াজ এবং টমেটো কাটা।

তৃতীয় পদ ছিল সামান্য ভাত, মুরগীর মাংস এবং আমের চাটনী। চতুর্থ বারে এল ফুলকপির ডালনা আর সামান্য ভাত। তারপরই দই এবং পায়স দেওয়া হয়। এই দুটি পদ খাওয়া হয়ে গেলে ছোট্ট পেয়ালা কাফে খেতে দেওয়া হয়। এতগুলি সুখাদ্যের জন্য মাত্র পঁচাত্তর সেণ্ট চার্জ করা হয়। এখানে শুধু নিগ্রোরাই আসে বলে দামও সস্তা। নিউইয়র্কে এই ধরণের খাদ্যের দাম হয় এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট।

চিকাগোর পথে

স্বদেশে যা শুনা যায়, বিদেশে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছা হয়। স্বদেশে থাকতে প্রায়ই শুনতাম আমেরিকাবাসীরা অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি অনেক আমেরিকানকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ; বর্তমানেও নাকি অনেক রামকৃষ্ণ মিশনী সন্ন্যাসী সে কাজে ব্যস্ত আছেন। নিউইয়র্ক, বাফেলো এবং ডিট্রয়ে তার কোনরূপ নিদর্শন না পেয়ে ভেবেছিলাম চিকাগোতে গিয়ে হয়ত চিকাগোবাসীদের হিন্দুরূপেই দেখতে পাব, কিন্তু ডিট্রয়ের হিন্দুরা আমার ধারণা একদম ভ্রমাত্মক এবং অমূলক বলেই বলেছিলেন। ডিট্রয়ের হিন্দুদের কথায় আমি কান দেইনি কারণ ১৯৩৬ সালে যখন ইউরোপ হতে দেশে আসছিলাম তখনও বেলুড়ে গিয়ে শুনেছিলাম, কোনও আমেরিকাবাসী নাকি একটি মঠ তৈরী করতে অনেকগুলি টাকা দিয়েছেন সে মঠ কিরূপ হবে তার একটা মডেলও দেখতে পেয়েছিলাম। আমেরিকাতে হিন্দুধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে সময় সময় ছোট ছোট বইএর বিলি অথবা বিক্রিও ভারতে হয়ে থাকে। ভারতে এতগুলি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যখন নিউইয়র্কে গিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের কোন সাড়া পেলাম না তখন একটু দুঃখিত হয়েছিলাম যদি বলি তবে দোষের হবে না, কারণ আজ পর্যন্তও হিন্দুধর্মের যে সকল ছাপ মনের কোণে জন্ম হতে মেরে দেওয়া হয়েছিল তা মুছতে সক্ষম হইনি। কৌতূহল না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় না। ছোট বেলায় যে সকল কৌতূহল মনের মাঝে গজিয়ে উঠে তা উপলব্ধি করা ভবিষ্যত জীবনের কাম্য হয়ে দাঁড়ায়।

আজও আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলে তৃপ্তি অনুভব করি। গর্বও করে থাকি। আমাদের গর্ব, আমাদের তৃপ্তি এসবের পেছনে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগোর লেকচার। সেই চিকাগো দেখবার একটা প্রবল বাসনা পূর্বেও ছিল তারপর যখন ডিট্রয় আসলাম তখনও সেই ভাবটা আবার ফিরে এল। ডিট্রয় হতে চিকাগোর দিকে সাইকেলে যাবার আর চেষ্টা করলাম না। এরূপ চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। হাতে টাকা রয়েছে অথচ রাত্রে হোটেলে কেবিনে কোথাও থাকতে পাব না, এরচেয়ে কষ্টের আর কি আছে। তাই চিকাগো যাবার অন্য বন্দোবস্ত হতে লাগল। বৃদ্ধ জগৎবন্ধু দেব মহাশয় আমার চিকাগো যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে কংগ্রেস স্ট্রিটের গৃকদের হোটেলে এবং অন্যান্য স্থানে সুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম।

মিঃ নাগের কয়েকজন তুরুক ও গৃক বন্ধু ছিল। তারা আমার সংগে কথা বলে সময় কাটাতে ভালবাসত। তুর্কীয়া আমি বেড়িয়ে এসেছি, তুরকাই ভাষার কয়েকটি কথাও আমি বলতে পারতাম। এসব নানা কারণে এদের সংগে আমার কথাবার্তা বেশ জম্‌ত। গৃক ভদ্রলোক ব্যবসা করতেন আর তুরুক ভদ্রলোক নানা বিষয়ে গবেষণা করতেন। যারা নানা বিষয়ে গবেষণা করে তারা প্রায়ই আনমনা হয়ে থাকে। কথা প্রসংগে একদিন গৃক ভদ্রলোককে জিগ্যাসা করেছিলাম কেন তিনি অনেক সময়ই নানারূপ ভুল করে বসেন? আমার কথার জবাব দিতে তিনি মোটেই পছন্দ করেছিলেন না, অনেক বলার পর তিনি আমাকে তুরুক জাতের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সেই কথাগুলি রাষ্ট্রনীতি নিয়েই জড়িত। রাষ্ট্রনীতি সকল সময়ই কূটনীতির অধীন। এসম্বন্ধে যারা বেশি বকে তারাই পথের লোক,

কাজের লোক এসম্বন্ধে নীরব থাকতে বাধ্য হন। তাই তুরুক ভদ্রলোক নীরব থাকতেই ভালবাসতেন। এইটুকু বলার পরই ভদ্রলোক মুখ খুললেন এবং বলতে লাগলেন, "আপনি সাইকেলে করে চিকাগোর দিকে যাবেন। পথে কোথাও কোন কেবিনে হোটেলে আপনার স্থান হবে না।" তাঁর মুখ হতে একটি অপ্রত্যাশিত কথা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ায় কথাটা বেশ ভালই লেগেছিল। চিকাগোর দিকে মোটরে করে যাব একথা বলায় তিনি সুখী হলেন না। তিনি বললেন সবচেয়ে ভাল হবে যদি আমি গ্রেহাউণ্ড বাস কোম্পানীর বাসে করে চিকাগো যাই। কথাটা আর না বাড়িয়ে এখানেই এবিষয়ে শেষ করলাম। আমি বেশ ভাল করেই বুঝেছিলাম এই ভদ্রলোকের আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক অভিগ্যতা আছে।

ডিট্রয় হতে রওয়ানা হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মিঃ মোহিত নামক এক ভদ্রলোক আমাকে তাঁর মোটর কারে করে চিকাগো নিয়ে যাবেন। যদিও মিঃ মোহিত মামুলী মজুরই তবুও তাঁর ছোট্ট একখানা মোটর কার ছিল। তার মোটর কারের দাম হবে আমাদের দেশের পচাত্তর টাকা। আমেরিকায় আমাদের দেশের তিনশত টাকায় বেশ ভাল মোটরকার কিনতে পারা যায়।

ডিট্রয় হতে চিকাগোর পথে এসে আমার চিন্তা হল পথে অনেকগুলি কেবিনে এবং হোটেলে থাকতে হবে। আমি অথবা মোহিতবাবু যদি হোটেল ম্যানেজারদের কাছে রুম ভাড়া নিতে যাই তবে কোন মতেই আমরা রুম ভাড়া পাব না। হরিদাস মজুমদার ফর্সালোক, তিনি সেকাজ করতে সমর্থ হবেন। তাঁকে সেই কাজের ভার দেওয়ায় তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রথমদিনই একজন কেবিন-ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে ফিরে আসলেন। তাঁকে

অপমান করায় আমরা ঠিক করলাম পথে কোথাও কোন হোটেলে থাকব না, পথেই রাত কাটাব।

একদিন এক রাত আমরা ছোট মোটরকারে কোন মতে কাটিয়ে পরের দিন আর কষ্ট সহ্য করতে পারলাম না। একটা স্ট্রীটের এক পাশে মোটর দাঁড়া করে তারই কাছে মাটিতে বসে পরের দিন রাতটা কাটিয়ে দিলাম। একেই বলে কোনমতে রাত কাটান। আমরা কোনমতে রাত কাটাতে অভ্যস্ত। আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের কবি অনেক পর্যটনকারীকেই কোনমতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। এদেশে সেটি শোভা পায়, কিন্তু আমি যেদেশের কথা বলছি তা হল আমেরিকা। সেখানে মানুষ কোনমতে রাত কাটাতে ভালবাসে না এবং কোনমতে রাত কাটায়ও না। অনেক সময় শোনা যায় অনেক যুবক অর্থাভাবে হোটেলে না শুতে পেয়ে রোগগ্রস্ত হয়েছে, এবং অনেকে মরেছেও, সেজন্য আজ আমেরিকার যুবক বেপরওয়া হয়ে হোটেলে অনধিকার প্রবেশও করে এবং রাতও ভালভাবে কাটিয়ে পরের দিন বহাল তবিয়তে পথে বের হয়। আইন এবং আইনের রক্ষক পুলিশও বেশি কথা বলতে সাহস করে না।

আমরা ক্রমাগতই চলছিলাম। কোনদিন পথের পাশে আর কোন দিন বা স্ট্রীটের মোড়ে রাত কাটিয়ে যখন হয়রান হয়ে উঠলাম তখন এক দিন কথা প্রসংগে মোহিত বাবু বলেছিলেন এমন সুন্দর দেশে থাকতে হলে এটুকু সহ্য করতে হয়ই। মোহিতবাবুর কথা আমার আর সহ্য হল না, আমি মোহিতবাবুকে বলেছিলাম, "কায়স্থ হাজার শিক্ষিত হলেও ব্রাহ্মণের সেবা করেই চলে। আমার জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণকুলে তাই এসব কষ্ট আমি সহ্য করতে সক্ষম নই। দয়া করে 'কোনমতে' আমাকে কালিফরনিয়ায় পৌঁছে দিন, আমি স্বদেশের দিকে ফিরতে পারলেই

বাঁচি।" ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলেই বর্ণ বৈষম্য ভাল করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি সেই পাপ বর্ণ বৈষম্যকে যেমন করে ঘৃণা করি, ভারতের অন্তস্থলের কালোদাগ জাতিভেদকেও তেমনি ঘৃণা করি।

কয়েকদিন ক্রমাগত অতি কষ্টে কাটিয়ে যখন আমরা চিকাগোর কাছে আসলাম তখন রাত দুটা হয়েছিল। চিকাগোতে যথাস্থানে পৌঁছাতে আরও তিন ঘণ্টা কেটে গেল। চিকাগোর লোক ঘুমিয়ে আছে অথবা জেগে আছে তা বুঝবার শক্তি নাই কারণ তখনও লোক পথে ঘাটে দিনের বেলার মতই চলছিল। আমরা নিগ্রোদের বাসস্থান ছেড়ে এমন একটি স্ট্রীটে আসলাম যার একদিকে নিগ্রোদের বাসস্থানের শেষ এবং শ্বেতকায়দের বাসস্থানের শুরু হয়েছে। রাতের বেলায়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই স্থানটিতে লোকের মনের ভাব কত নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। পরে এসে সেই এভাবটি কতদূর নীচ স্তরে নেমেছে তা বুঝতে পেরেছিলাম। মানুষ মানুষকে কি রকমে ঘৃণা করতে পারে তা এখানে আসলেই বুঝা যায়।

শ্বেতকায়দের ওয়াই-এর দরজা খোলাই ছিল। শ্রীযুত ঘোষ এবং হরিদাস আমাকে একটি ওয়াই-এর রুম ভাড়া করে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁরা বলে গিয়েছিলেন পরের দিন বিকালে চারটার সময় এসে আমার সংগে দেখা করবেন।

আমি যে রুমটি ভাড়া করেছিলাম তা ছিল ১৩ তলায়। তের সংখ্যা আমেরিকাতে অপয়া সংখ্যা বলে সকলেই এটিকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমার কাছে তের নম্বরের কোনও মাহাত্ম্য ছিল না। তাই বিনা দ্বিধায় ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে ভাবলাম আগে একটু স্নান করি, তারপর সকালের আহার সেরে নিয়ে সকাল বেলার সংবাদপত্র পাঠ করে একটু ঘুমাই।

স্নানের বেশ ভাল বন্দোবস্তই ছিল। স্নানাগারের দিকে যাবার সময় একদল লোকের সংগে দেখা হল। তাদের ভাবগতি দেখে মনে হল, আমার ওয়াই. এম. সি. এ-তে থাকাটা যেন মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। কোন রকমে চোখ বুঁজে স্নান করে চলে এলাম। পরে রেস্তরাঁয় গিয়ে বসেই গরম 'হট কেক্' আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলাম। কিন্তু কিছুই যেন আসতে চায় না। অগত্যা বয়কে ডেকে বললাম, "আমাকে নিগ্রো ভাববেন না, আমি একজন হিন্দু, আপনার জাত যাবে না।" লোকটি অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কি ভাবল, তারপর খাবার এনে দিল।

আহারের পর তিনখানা সংবাদপত্র কিনে ওয়াই. এম. সি. এ-তে ফিরবার পথে এক ভদ্রলোকের সংগে মুখোমুখী দেখা। পাশ কাটিয়ে পথ ধরে চলেছি, হঠাৎ যেন মনে হল লোকটি আমার পিছন নিয়েছে। তাড়াতাড়ি লিফ্‌টের কাছে এসে উপরে চলে গেলাম, লোকটিও সংগে সংগে এল। লিফ্‌টে সে একটা কথাও আমার সংগে বলল না। ঘরের কাছে গিয়ে লোকটি বলল, "এই ঘরের নম্বরটা অপয়া, তাই এ ঘরে কেউ একা থাকতে সাহস করে না।" তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ভিতর থেকে কান পেতে শুনতে পেলাম লোকটি অন্য একজনের সংগে কথা বলে চলে গেল। আমেরিকার পুঁজিবাদীদের উস্কানীতে অনেক দেশের কুৎসা রটিয়ে অনেক বই রচিত হয়েছে, তার পরিচয় আমরা বেশ পেয়েছি। কিন্তু ওয়াই. এম. সি. এ-তে এসে দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্নীতির যে চরম দৃষ্টান্ত দেখেছি, আমাদের দেশের লোক বোধ হয় তা ধারণাই করতে পারবে না।

একটার সময় ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ঠিক করলাম

স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে দাঁড়িয়ে বেদান্ত দর্শনের কথা বলে আমেরিকার নরনারীকে মোহিত করেছিলেন সেই স্থানটি দেখতে হবে। ওয়াই. এম. সি এ-এর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারীর সংগে সাক্ষাৎ করে সেই স্থানটির সন্ধান চেয়েছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে সেক্রেটারী যেন আকাশ হতে পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "এটা কি ঐতিহাসিক গৃহ? এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

প্রচার বিভাগের লোকটির কথা শুনে একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বললাম, "ভারতের এতবড় একজন দার্শনিক, যার নাম পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে সদাসর্বদা উচ্চারিত হয়, সেই বিবেকানন্দের কোন খোঁজ খবর আপনারা রাখেন না. সেটা সত্যই দুঃখের বিষয়।"

"আজকাল কজন খৃস্টান যিশুখৃস্টের নাম নেয়, সে সংবাদ রাখেন কি?"

"আর কেউ না নিক্ অন্তত আপনারা নিচ্ছেন, এটুকু বিশ্বাস করি।"

"হাঁ, মুসোলিনী হিটলার স্ট্যালিন এখন হয়েছেন অবতার, অতএব যিশুর নাম হয়ত আমাদের ভুলতেই হবে।"

কথা না বাড়িয়ে ফিরে চলে এলাম। নিজের ঘরে ফিরবার সময় ভাবলাম হয়ত আমরা স্বদেশে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা শুনি তা অনেকটাই প্রোপাগেণ্ডা। স্নান করে ভাল করে পোষাক পরে খেতে বার হলাম। উপযাচক হয়ে দুএকজনের সংগে ভারতীয় ধর্ম এবং খৃস্ট ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আমার কথা যেন কেউ শুনতে চায় না। সবাই যেন হিটলার আর মুসোলিনীর খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব, এ ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তাই ছিল না। সুতরাং তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে পথের মানুষ পথেই বেরিয়ে পড়লাম। চলেছি শ্বেতকায়দের পাড়া দিয়ে। আমার মত কালো লোককে নির্ভীকভাবে বেড়াতে দেখে, অনেকেই

দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচদের মত মুখভংগি করতে লাগল। তাদের মনের ও মুখের এরকম পরিবর্তন দেখে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম। আটচল্লিশ নম্বর স্ট্রিটের মোড়ে যাবার পর অনেকগুলি নিগ্রোকে দেখে মনের অবস্থা অনেকটা সুস্থ হল। এখান থেকেই নিগ্রোদের পাড়া শুরু হয়েছে।

কাছেই একখানা সংবাদপত্রের স্টল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে সংবাদপত্র বিক্রি করছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল ডিমক্রেসী বিপদে পড়েছে। আমার সে-দিনের সংবাদ বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। তাই ছেলেটির কাছে গিয়ে বললাম, "ইউরোপীয় ডিমক্রেসী বিপদে পড়ছে বললে ভাল হত।" ছেলেটি আমার কথা কিছুই বুঝল না। দোকানী এসে জিগ্যাসা করল আমি কি বলেছি। তাকে বললাম, "ডিমক্র্যাসীর অর্থ ব্যাপক, অতএব কথাটাকে ছোট করে বলাই ভাল; কারণ ব্রাউন এবং কালো লোক ডিমক্র্যাসীর কোন ধার ধারে না। পোল এবং জার্মান লড়াই করছে; তাতে আমাদের কি? নিগ্রোরা সাদা পাড়ায় হাঁটতে পায় না, সাদা হোটেলে থাকতে পায় না, অতএব পোল অথবা জার্মান জাহান্নামে গেলে নিগ্রোর কিছু আসে যায় না।" দোকানী আমার কথা শুনে একটু ভাবল, তারপর বল্‌ল, "আপনি সত্য কথাই বল্‌ছেন, নিগ্রো নিগ্রোই থাকবে।"

আমেরিকাতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—Italians are builders, Irish are rulers and Jews are owners." দোকানী জাতে জু—বিনয়ী, ব্যবসায়ী এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু সে নূতন ধরনের ইহুদী। লিথোনিয়া হতে এসে আমেরিকাতে বসবাস আরম্ভ করেছে। লিথোনিয়ার ইহুদীরা সব সময়েই সোভিয়েট নিয়ম পছন্দ করে আস্‌ছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, যদি তাদের দেশ জার্মানরা দখল করে

বসে তবে তাদের অবস্থা ভাল না হয়ে খারাপই হবে। এদিকে লিথোনিয়া যদি রাশিয়ার সংগে মিলে যায় তবে মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের পরের দুয়ারে ঘরে বেড়াতে হবে না এবং ভবিষ্যতের আর্থিক দুরবস্থা এবং বর্তমানের সামাজিক দুর্গতির কথা ভাবতে হবে না। সে জন্যই দোকানী আমাকে কোন রকম বাধা না দিয়ে আমার কথায় সায় দিয়েছিল। আমি যে হিন্দু সে কথা তার কাছে না বলে, তাকে আমার কথার সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় সে একখানা "মস্কো নিউজ" আমার হাতে দিয়ে বলল, "যদি ডিমক্র্যাসী জানতে হয় তবে এই পত্রিকাখানি পড়ুন, দাম একটি নিকেল মাত্র।" এক নিকেল দিয়ে "মস্কো নিউজ" কিনে পার্কে গিয়ে তাই পাঠ করতে লাগলাম।

আমেরিকাতে ডিমক্র্যাসীর প্রবল প্রতাপ। ডিমক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা সে দেশে আছে, সংবাদপত্র পাঠ করতে কোন বাধা নাই। আমি জানতাম না পার্কে বসে "মস্কো নিউজ" পাঠ করতে গেলেই গুপ্ত পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। মন দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রটা পাঠ করছিলাম, আর ভাবছিলাম ভাষাটা বেশ সুন্দর অথচ তাতে ভাব প্রণতা মোটেই নাই। মঁশিয়ে বরদিন হলেন পত্রিকাখানার সম্পাদক। তাঁর নাম অনেকদিন অনেক স্থানেই শুনেছি। আজ হঠাৎ তাঁর কথা বিশেষ করে মনে হল। মনে হল তাঁর চীনের কার্যাবলী। তিনিই নাকি একদিন বলেছিলেন যদি মাও এখনই কাজ শুরু করেন তবে চীনের সমূহ ক্ষতি হবে। রুশ বিপ্লবীরা কথা অতি অল্পই বলেন, কি করে তাঁর মুখ হতে এরূপ কথা বের হয়েছিল, তাই আমি ভাবছিলাম।

কাছেই একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর ফিটফাট সাজগোজ, চেহারার জৌলুস, বসবার কায়দা, এসব দেখেই মনে হয়েছিল তিনি

একজন বড়লোক। আমার কাগজ পড়ার ভংগি দেখেই বোধ হয় তিনি কাছে এগিয়ে এসে মস্কো নিউজের বাইরের পাতাটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে একেবারে সটান কাছে এসে বল্‌লেন, "বেয়াদবী ক্ষমা করবেন, কাগজটা একটু দেখ্‌তে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"এটা কোথাকার সংবাদপত্র ?"

"আপনাদের দেশেরই, তবে এসেছে রুশিয়া হতে।"

"আপনার দেশ কোথায় ?"

"ইণ্ডিয়া"

"এসব সংবাদপত্র আপনাদের দেশে যায় না ?"

"জানি না।"

"এখানে কবে এসেছেন ?"

"গত রাত্রে।"

"কোথায় থাকেন ?"

"ওয়াই. এম. সি. এ-তে।"

"ওয়াই. এম. সি. এ-এর ঘরের চাবি আপনার কাছে আছে ?"

"আছে বৈকি।"

"দেখাতে পারেন ?"

"দেখাব না।"

"তবে দুঃখিত আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।"

"তাই হোক, চলুন কোথায় যাবেন ; আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি ?"

ভদ্রলোক একখানা ব্যাজ দেখালেন, বুঝলাম তিনি গোয়েন্দা।

পকেটে ছোট একটা পিস্তলও রয়েছে। তাঁকে জিগ্যাসা করলাম, "খবরের কাগজ পড়ার অপরাধেই গ্রেপ্তার করা হল বুঝি ?"

"তা নয়, আপনার হাতে মস্কো নিউজ।"

"কোথায় আমার হাতে ? এ যে আপনারই হাতে দেখছি। চলুন কোথায় যাবেন।"

গোয়েন্দা একটু হেসে বল্লেন, "হাঁ আমারই হাতে, তবে এ পার্কে বসে এসব সাহিত্য পাঠের স্বাধীনতা যে নাই, সে কথা বোধ হয় আপনি জানতেন না, এখন জানিয়ে দিলাম, সুতরাং এইটাকে পকেটে পুরুন।" গোয়েন্দা পার্কের বাইরে এসে আমায় বল্লেন, "গুডবাই"। আমি বল্লাম, "একেই বলে আপনাদের দেশের ডিমক্র্যাসি।"

গোয়েন্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, দোকানীর কাছে এসে গোয়েন্দার কথা বল্লাম। দোকানী বল্ল "সে জন্যই দেখ্ছেন না, কাগজটা এরকম চুরি করেই বিক্রি করেছি। এদিকে লিথোলিয়ার যত স্টল আছে, সব কটাতেই "মস্কো নিউজ" পাবেন, আমেরিকানরা এসবের ধার ধারে না। এদের রাতারাতি কোটিপতি হবার যে রকম হুজুগ তেমন হুজুগ আর কারো নাই ; সে জন্যই এরা এত বিপদে পড়েছে।"

"বিপদ বলে ত কিছুই দেখছি না ?"

"পূর্বে এরা কথায় কথায় মিলিয়ন ডলারের কথা বল্ত, এখন এক গ্রাণ্ট (একশত) ডলারকেই বড় মনে করে। এই শহরেই দেখবেন নিকেল, ডায়েম (পাঁচ সেণ্ট, দশ সেণ্ট) নিয়েও লোকে সুখী হয়। এখন আর পূর্বের আমেরিকা নাই। সোনার খনি উজাড় হয়েছে, পেট্রলের মাইন ধনীদের হাতে চলে গেছে, রিয়্যাল এস্টেট অনেক হয়েছে, মজুরী কমেছে, অথচ খরচ পূর্বের মতই রয়েছে। বেকার সমস্যাও কম নয়, কাজ পেলেই লোক যেন বাঁচল।" ঘড়িতে চেয়ে দেখি তিনটা

বাজতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। বাসে করে ওয়াই. এম. সি. এ-তে এসে দেখলাম, মোহিতবাবু তখনও আসেন নি। রিডিং রুমে "মস্কো নিউজ"টা ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পর একজন পাঠক মস্কো নিউজটা হাতে উঠিয়েই ধপ করে তা টেবিলে ফেলে দিলেন, যেন সাপের গায়ে হাত দিয়েছেন। ভাবলাম এ হেন পদার্থ এখানে আনা উচিত হয় নি। তৎক্ষণাৎ মস্কো নিউজটা নিজের হাতে নিয়ে পাঠ করতে লাগ্‌লাম। যে ভদ্রলোক নামটা দেখেই আঁৎকে উঠেছিলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

"এটা কি আপনার ?"

"হাঁ।"

"আপনি কি কমিউনিস্ট্ মত পোষণ করেন ?"

"এখনও ঠিক করি নি।"

"এ সব কাগজ পাঠ করবেন না, ভগবানে ভক্তি থাকে না।"

"আমাদের দেশে চার্বাক বলে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি ভগবান বলে কিছু মানতেন না।"

"সেরূপ দার্শনিকের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, রুশরা ডিমক্র্যাট নয়, তারা ডিক্টেটরের নির্দেশ মত চলে।"

"আপনারা ?"

"আমাদের দেশে ডিমক্র্যাসি পূর্ণমাত্রায় আছে।"

"সেইজন্যই নিগ্রোরা পথে বার হলে লান্‌চিত ও অপমানিত হয়, বুভুক্ষুর দল ইমপিরিয়েল ভ্যালীতে মরছে। ডিমক্র্যাসী বলতে আপনি কি তাই বোঝেন ?"

"ওয়াই. এম. সি. এর বৈঠকখানায় পাঁচশো লোক বসে আরাম করে

কথা বলতে পারে। আমাদের কথার সময় অন্তত পক্ষে শতাধিক লোক সেখানে ছিল তারা সবাই আমার কথা শুনবার জন্য কাছে এসে পড়ল। নানা লোক নানা প্রশ্ন তুললেন, তার যথাযথ উত্তর দিতে লাগলাম। মোহিত ঘোষ এসে দেখলেন আমি বেশ আলাপ জমিয়ে তুলেছি। যা হোক, তাঁর সংগে বাইরে আসতে হল। তিনি জিগ্যাসা করলেন---

"এরা আপনার কথা বুঝতে পারে ?"

"পারে বলে ত মনে হয়।"

"এতদিন আমেরিকায় থেকেও আমরা আমেরিকানদের সংগে মিশবার সুযোগ পাই নি।"

নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন এবং অন্যান্য স্থানে দেখেছি, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক সাদা লোকের সংগে মিশবার সাহস রাখেন না, অথচ আমাদের দেশের যারা খালাসী, তারা ইউরোপীয়ানদের সংগে একবার মিশতে পারলে শ্বেতকায়দের তাদের মতই ভাবে এবং সমানে সমানে ব্যবহারও করে এবং পেয়েও থাকে।

দুবৎসর আগে আমাদের দেশের কয়েকজন খালাসী ডারবান্ গিয়েছিল। তারা চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে যখন দেখল যে চা দেওয়া হচ্ছে না, তখনই তারা চায়ের দোকান ভাংতে লাগল, দোকানীকে প্রহার দিল এবং অনেক টাকার লোকসান করল। বিচারে তাদের কোন শাস্তি হল না, কারণ তারা বুঝিয়ে দিল যে, তাদের অপমান করা হয়েছে। তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার রেস্তরাঁতে লেখা থাকে "অন্‌লি ফর্ ইউরোপীয়ান"।

চিকাগোর এক নিগ্রো পাড়ায় আমার থাকার স্থান ঠিক হল। যে ব্লকে আমি থাকতাম, সেখানে আমরা কয়েকজন ছাড়া সকলেই আমেরিকান্ শ্বেতকায়। আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি একজন

হিন্দু। তাঁর পূর্বপুরুষ আকের চাষ করবার মজুর হয়ে প্রথম ত্রিনিদাদে যান—তাঁরই বংশের শিক্ষা এবং চালচলনে নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই শ্বেতকায়দের ব্লকে স্থান পেয়েছেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হিন্দু পরিবারের সংগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কারণ এরাও নিগ্রোদের ঘৃণা করে। তাঁদের এই নিগ্রো-বিদ্বেষ যাতে বেশী না দেখতে হয়, সেজন্যে বাইরে বাইরেই সময় কাটাতে লাগলাম। দুপুরে একটার সময় ঘুম থেকে উঠে বের হতাম, রাত চারটার আগে ফিরে আসতাম না। সমস্ত শহরটাকে একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছা হল। এই শহর খুন ও ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত। এখানে চোর আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মিউজিয়াম আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কশাইখানা আছে। এই শহরের বিশেষত্ব হল, এখানে অনেক বৈগ্যানিক ও সাহিত্যিক থাকেন। বৈগ্যানিক এবং সাহিত্যিকেরা এই নগরকেই তাঁদের প্রধান আস্তানা করে নিয়েছেন, তার একটা কারণ আছে। সাধরণত যাঁরা সাহিত্য এবং বিগ্যান চর্চা করেন, তাঁরা নির্জনতাপ্রিয় এবং দারিদ্র্য তাঁদের চিরসংগী। এই নগরে অনেক বাড়ি আছে, যেখানে সস্তায় থাকা যায়। সেজন্যই দরিদ্র বৈগ্যানিক এবং সাহিত্যিকদের এখানে এসে থাকতে হয়। এদেশে অনেক সাহিত্যিক সাহিত্যকে পেশা করেন না, সাহিত্য তাঁদের সাধনার বস্তু। তাদেয় পাড়ায় একদিন গিয়েছিলাম।

বেলা তখন তিনটা। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। এক দিকের ফুটপাথের ছায়ায় বসে একদল ছেলে জুয়া খেলছে। তাদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন তাদের জুয়া খেলা দেখতে আমি ভয়ানক ইচ্ছুক। তাদের একজনকে জিগ্যাসা করলাম, এখানকার যিনি সবচেয়ে বড় লেখক, তিনি কোথায় থাকেন বলতে পার ?

ছেলেটি বলল, নিশ্চয়ই, তবে তিনি আজ সকালেই লস্-এন্জেলস্ চলে গেছেন, ফিরতে এক সপ্তাহ দেরি।

আর কোন লেখক কাছাকাছি কোথাও আছেন কিনা জিগ্যাসা করায় ছেলেটি আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল, "এই বাড়িতে অনেক লেখক আছেন, যাঁদের পেশাই হল বই লেখা।" বাড়িটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম।

দোতালা বাড়ি। নিচের তলায় বৈঠকখানা। বাইরে থেকেই কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলাম অনেকগুলি লোক বসে বই পড়ছে। ভিতরে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে জিগ্যাসা করলাম, "এখানে আপনারা কি সকলেই লেখক ?"

একজন বললেন, "হাঁ, আপনার জন্যে কিছু লিখতে হবে কি ?" কথাটা শুনেই আমার রাগ হল, কিন্তু সবিনয়ে বললাম, "লেখকদের দর্শন পেতেই এসেছি, কিছু লেখাতে নয়।" আমার কথা শুনে প্রথমে সকলেই হেসে উঠল। আমার পরিচয় দিবার পর কেউ আর বিশ্বাস করল না যে, আমি একজন হিন্দু। একজনকে জিগ্যাসা করলাম, "আমার জাত সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ এখনও দূর হয়নি বলে মনে হচ্ছে।"

একজন প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন যে, আমি নিগ্রো ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না। আমি সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললাম, হইনা আমি নিগ্রো, তবুও আমাকে পরিব্রাজক বলে আপনাদের বিশ্বাস করতে হবেই।

জায়গাটি বেশ ভাল লাগল। সকলেই আমাকে অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্যে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। সর্বপ্রথমেই বললাম যে, যারা নিজেদের লেখক বলে পরিচয়

দেয়, অথচ একজনের মুখ দেখে বুঝতে পারে না লোকটি কোন্‌দেশের এবং কোন্ জাতের, সেই লেখকরা করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। উপসংহারে বলতে বাধ্য হলাম, যাদের মাঝে নিগ্রোবিদ্বেষ রয়েছে, তারা কি করে লেখক হতে পারে, তাও বিবেচ্য বিষয়। লেখকগণ আমার কথা শুনে আমাকে অপমান করতে প্রবৃত্ত হননি। তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, হয়ত তাঁদের লেখার কিছু খোরাক আমি জুগিয়েছিলাম। লেখকগণ যে দেশের লোক হন না কেন, অন্তত নূতন কিছু জানবার আগ্রহ তাদের থাকেই। কথাটা মনে রেখেই এত কথা বলতে সাহস করেছিলাম।

চিকাগো আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর, অন্তত পক্ষে তিনমাস যদি থাকতাম, তবে অনেক কিছুই জানতে পারতাম আর অনেক কথাই বলতেও পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমার হয়ে উঠেনি। যে কয়দিন ছিলাম, বুঝতে চেয়েছিলাম, চিকাগোতে এত দস্যুবৃত্তি হয় কেন। এই সাহসিকদের সম্বন্ধে এখানে অনেক কাহিনী শোনা যায়। অনেকে বলেন, যারা অলস, তারাই এসব দুরন্ত কাজ করে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে ঠিক তা নয়।

এব্রাহাম্ লিন্‌কন প্রচারিত ‘কাজ কর, ভিক্ষা করো না’ নীতিতে কাজের ফল ভোগ করে পুঁজিবাদী, এবং মজুরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা সামান্য কিছু দিয়ে থাকে মাত্র।

যারা লিন্‌কনের মত মেনে দরজায় দরজায় ‘কাজ দেও’ বলে ঘুরে বেড়াত, তারা কাজ পেত বটে কিন্তু সে কাজ করে মান ইজ্জত বজায় থাকত না। তা হ’ত অন্য ধরণের কেনা গোলামী। উপযুক্ত গুণ থাকলেও ঠিকমত বেতন পাওয়া যেত না। যারা গোলামী করতে

রাজি হ'ত না তারা মনের দুঃখে বনে গিয়ে যিশুগুণগানে সময় কাটাত না, হাডসন নদীতে গিয়ে ঝাঁপ দিত না, নিজকে গুলি করে মারত না। তারা বীরের মত দল বেঁধে ডাকাতি করত। ভাড়াটে লেখক তাই রং ফলিয়ে লেখত আর দেশ বিদেশে সেই গল্পগুচ্ছ চালান দিত। আমাদের দেশেও তা আসত। আমরা তাই পড়তাম আর বলতাম আমেরিকার চিকাগো শহরের লোক প্রায়ই "ক্রিমিনেল"। ছায়াচিত্রে সেই রং ফলানো গল্প লহরী সজীব করে সর্বত্র পাঠানো হ'ত। তা দেখে লোক অবাক হ'ত।

সময়ের পরিবর্তন হ'ল। মজুর ধর্মঘট করতে শিখল। ডাকাতি বন্ধ হ'ল। মজুরের গোলামী আমেরিকা হ'তে কিছুটা কমল। মজুর দেখল, ডাকাতি করে যা পাওয়া যায় তা সকল সময় ভোগ করা যায় না। রবিন্ হুডের মত বিতরণও করা যায় না, সেজন্য বড় বড় ডাকাত, মজুরের সর্দার হ'ল মজুরী যাতে বাড়ে তার চেষ্টা করতে লাগল। আমি যখন চিকাগোতে গেলাম তখন দেখলাম চিকাগোতে ডাকাত নাই, পেশাদার ভিখারী আছে। লোকে বলল চিকাগোর ডাকাতের দল সকলেই কালিফরনিয়ায় চলে গেছে। যখন কালিফরনিয়াতে গেলাম তখন দেখলাম ঐ ডাকাতের দল মজুরে রূপ নিয়ে কটন পিকারর্ম যাতে বেশি রোজনা পায় তারই জন্যে চেষ্টা করছে। যারা পরের জন্য জীবনের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেয় তাঁদের পুঁজিবাদীরা ডাকাত বলে আখ্যায়ীত করে।

চিকাগো থেকে বিদায় নিবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম কারণ নগরের সকলেই যেন আলাদিনের প্রদীপ হাতে করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাতারাতি বড়লোক হবার জন্যে। চিকাগোর সম্বন্ধে আমার একটা বেশ ভাল ধারণা ছিল, কিন্তু চিকাগো দেখবার পর আমার

সে ধারণা চুরমার হয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড নগর, বুভুক্ষা রাক্ষসী যেন হাঁ করে আছে।

চিকাগো আমেরিকার দ্বিতীয় নগর। এখানে পায়ে হেঁটে অলিতে গলিতে বেড়ানো কঠিন কাজ। এক দুমাসে চিকাগোর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু চিকাগো হ'তে বিদায় নিবার পূর্বে এখানে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিচিহ্ন কি আছে তা দেখতে ইচ্ছা হল। চিকাগোর একখানা গাইড বই নিয়েছিলাম। তাতে অন্যান্য ধর্ম স্থানের উল্লেখ ছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন অথবা বেদান্ত সোসাইটির উল্লেখ ছিল না। এদিকে মোহিত বাবুর সংগেও দেখা হচ্ছিল না। তা বলে আমি বসে থাকিনি। অনেক লোকের সংগে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলাম। এমন কি স্থানীয় পালস্ এবং গ্রকদের সংগে এ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়েছিল।

পোলস্ অল্পে তুষ্ট এবং গল্পপ্রিয়। গ্রকরা ভারতবর্ষকে সোনার দেশ বলেই মনে করে। সকলেই আমার সংগে প্রাণ দিয়ে কথা বলল কিন্তু কেউ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারল না। অবশেষে মোহিতবাবু আমাকে চিকাগোর বেদান্ত সোসাইটিতে নিয়ে যান। সেখানের বেদান্ত সোসাইটির সংগে যদি কলকাতার রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের বেদান্ত সোসাইটির তুলনা করা যায় তবে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের বেদান্ত সোসাইটির অবস্থা দশ গুণ ভাল বলব। চিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি দেখার পর ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আমার বেশ রাগ হয়েছিল। তাঁরই লেখা প্রথম ভাগ আমার পাঠ্য ছিল। তিনি শিখিয়েছেন "যত কয় তত নয়, সব ভয় কর জয়"। সব ভয় জয় করা যায় এবং তাতে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলাম বলেই মনে হয় কিন্তু "যত কয় তত নয়" এই সত্য বাক্যটি

তার প্রথম ভাগে লেখা ভাল হয়নি। ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে কতকগুলি বিচারবুদ্ধি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। সেই বিচার বুদ্ধি আমার মনে সবদাই জাগ্রত। সেই বিচারবুদ্ধির দ্বারাই বলছি, জগতের "ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি "যত কয় তত নয়" সত্যটি প্রয়োগ করা চলে। চিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বেদান্ত সোসাইটির দ্বারে গিয়ে মৃদু করাঘাত করলাম। একজন মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে প্রবেশ করলাম। সমস্ত ঘরটা চল্লিশ হাত লম্বা এবং পনর হাত প্রশস্ত। এতেই পার্টিশন দিয়ে রুম করা হয়েছে। স্বামিজীর শারীরিক অবস্থা সেদিন ভাল ছিল না। তিনি সেজন্য বেশি কথা বললেন না। বিদায়ের সময় স্বামিজীকে বললাম, "দেখুন এখানের আশ্রমটা আরও একটু বড় করুন" স্বামিজী সে কথার উত্তর দিলেন না। আমি এবং মোহিতবাবু দুঃখিত মনেই ফিরে আসলাম। আমি মোহিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কোথাও কি এঁদের কোন প্রতিষ্ঠান আছে?" তিনি বললেন, "বোস্টন, এবং সেনফ্রান্‌সিস্‌কোতেও আছে।" বোস্টন আমি যাইনি, সেনফ্রান্‌সিস্‌কোতে গিয়েছিলাম। হলিউডের আত্মকথায় সেনফ্রান্‌সিস্‌কোর আশ্রম সম্বন্ধে বলা হবে।

চিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীতে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। দুঃখের বিষয় এখানে এসে মাত্র দুজন ভারতীয় ছাত্রের নাম শুনতে পেলাম। একজন হলেন আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার তারকনাথ দাস এবং অন্যজন হলেন ডাক্তার শর্মা। উভয়েই পৃথিবীবিখ্যাত নর্থ ওয়েস্টারেণ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাস করেন। ডাক্তার দাস দেশে ফিরে আসেন এবং ডাক্তার শর্মা আমেরিকাতেই চাকুরি জোগাড় করেন। সুখের বিষয় আমেরিকাবাসী ডাক্তার শর্মার গুণের আদর

করেছিল। তিনি আমেরিকার একটি প্রথম শ্রেণীর হস্‌পিতালের কার্যনির্বাহক ছিলেন। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আমেরিকার নগরিক করে নেওয়া হয়।

চিকাগোর এক দিকের সংবাদ অনেক বলা হয়েছে। আমি শুধু ধনী এবং বিদ্বানদের সংস্পর্শে এসেই সুখী হতাম না। আমার মত লোকও কোথাও আছে কিনা তা জানবার চেষ্টা করতাম। নিগ্রো পাড়াতে চার জন ভারতীয় দন্তচিকিৎসকের সংগে সাক্ষাৎ হয়। এঁরা কেউ কোনরূপ পরীক্ষা পাস না করেই আমেরিকায় যান এবং চিকাগোতে গিয়ে নিজের অধ্যবসায়ে দন্তচিকিৎসা কাজটি শিক্ষা করে ব্যবসা আরম্ভ করেন। যদিও তাদের থাকার এবং ব্যবসায়ের স্থান প্রথম শ্রেণীর নয় তবুও তাদের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিতে হবেই।

গুড্‌ লাক্ (Good Luck) বলে একটা জিনিস চিকাগোতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভারতের ধূপ চিকাগো শহরে গুড্‌লাক্ বলে বিক্রি হয়। যাদের চাকরি চলে যায়, যারা নানা রকমে এসংসারে মাথা উঁচু করতে পারে না তারা আজ আর স্বামী বিবেকানন্দের মত লোকের বাণীর অপেক্ষা করে না, তারা চায় গুড্‌ লাক্। একজন বাংগালী ভদ্রলোক সে গুড্‌লাক্ তাঁর নিজে ফেক্টরীতে তৈরী করে শ্বেতকায় এবং নিগ্রো এজেন্টের সাহায্যে বিক্রি করান।

লোক যখন কাজ পায় না তখনই তাদের নানারকমের দুর্বলতা এসে দেখা দেয়। ভারতীয় গুড্‌ লাক্ ব্যবসায়ী দরজায় এসে নক্ করে বলে, "ভয়ের কারণ নাই, আপনার জন্য 'হিন্দু গুড্‌ লাক' এনেছি, আপনার কাজ সত্বরই হয়ে যাবে। এটা সকাল সন্ধ্যায় জ্বালাবেন, দেখবেন সাতদিনের মাঝেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। আমি এখন

যাই, সাত দিন পর এসে হিন্দু গুড্ লাকের দক্ষিণা অর্দ্ধ ডলার নিয়ে যাব।” এই ব্যবসা করে চিকাগোতে অন্তত পক্ষে দশ হাজার লোক সুখে এবং সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়। অবশ্য আমাদের জাতভাইএর তাতে কিছুটা যে থাকে না তেমন নয়। আমাদের দেশে আজকাল প্রত্যেক বাংগালী ব্যবসায়ীর ঘরে “গণেশ” এসে ঢুকেছে, পূর্বে এটা মারওয়ারীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজকাল গণেশের সংগে উড়ে পৈতাধারী ফুলচন্দন ছিটকিয়ে, খেয়ে দেয়েও বাঁচে। চিকাগোর গুড্ লাককে যদি উপহাস করা হয় তবে এসবকে আগে ছাড়তে হবে নতুবা উপহাস করা অন্যায় হবে। আর্থিক দুর্বলতা মানুষকে কত রকমে হীন করে তার প্রমাণ স্বদেশে এবং বিদেশে সর্বত্র সমান।

সুখের বিষয় আমেরিকার সর্বত্র প্রগতিশীল লেখক এবং প্রগতিশীল লোকের দল গঠন হয়েছে। তাঁরা সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে করে আমেরিকার লোক কুসংস্কারে ডুবে না থাকে, আর্থিক গোলামী হতে মুক্ত হয়ে সংসাহিত্য পাঠ করে গ্যান অর্জন করতে পারে। আমার ইচ্ছা ছিল এই সংগে আমেরিকা সরকারের সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম হিপোক্রেসী রূপী ডিমোক্রেসী সর্বত্র সমান। তার রূপ যদি বিষদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয় তবে দেখতে পাওয়া যায় কোথাও উনিশ আর কোথাও বিশ। এই ভেবেই আমেরিকা সরকার সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হ'ল না। তা বলে আমেরিকা সরকারকে ভুল করে যেন কোনও পরাধীন দেশের সংগে তুলনা করা না হয়, একথা সকল সময় মনে রাখতে হবেই। আমি আমেরিকার যত দোষ এবং গুণের কথা বলেছি শুধু গ্রেট বৃটেনের সংগে তুলনা করে। এমন কি জাপান অথবা জার্মানীর

সংগেও আমেরিকাকে তুলনা করিনি কারণ এসব দেশ আমেরিকা হতে অনেক নীচস্তরের; পরাধীন দেশের কথা এখানে উঠতেই পারে না।

আমেরিকার নিগ্রোরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেরও ভোট দেয়। যদিও আজ পর্যন্ত কোন নিগ্রোই মেয়র পদবী পায়নি, তবে মেয়র হবার জন্য অনেক সময় কেন্‌ডিডেট দাঁড় করান হয়েছে। পল্টনে নিগ্রোরা শ্বেতকায়দের সমান মাইনে পায়। নিগ্রোদের মাঝে অনেক লেপ্‌টেনাণ্ট কর্নেল আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সওদাগরী জাহাজের পাচকের কাজ নিগ্রোদের এক চেটিয়া বললেও দোষ হয় না। তবে নিগ্রোরা এত চেচামেচী করে কেন? চেচামেচী করার প্রথম কারণ হ'ল, ফেক্‌টারীতে নিগ্রো মজুর অতি অল্পই নেওয়া হয় এবং তাদের মাইনেও শ্বেতকায়দের চেয়ে কম দেওয়া হয়। এজন্যই তারা এত চেচামেচী করে, তারপর বর্ণ-বৈষ্যম ত আছেই।

ইংলণ্ডে দরিদ্র পাড়াতে আমি থেকেছি এবং ধনী পাড়াতে গিয়েও সেখানের অবস্থা বেশ ভাল করেই অনুভব করেছি। ইংলণ্ডের ধনী পাড়ার লোক যে ভাবে থাকে তার চেয়ে অন্তত কুড়িগুণ ভাল ভাবে থাকে আমেরিকার নিগ্রো পাড়ার লোক। আমেরিকার বাড়ি এবং রুমের গঠন প্রণালী সর্বত্র সমান। আলোর জন্য ইলেক্‌ট্রিক্‌, কয়লার জন্য গ্যাস, ঠাণ্ডা হতে বাঁচবার জন্য হিটার, স্নানের জন্য গরম এবং ঠাণ্ডা জলের পাইপ, রেস্ট রুম এবং শুইবার জন্য উত্তম বিছানা। বাড়ি হলেই এসব হবে, কেবিন হলেও হবে। যে বাড়িতে এসব নাই, আমেরিকার সেনেটারী বিভাগের লোক এসে তা তিন দিনের মাঝে ভেংগে ফেলবার অধিকার রাখে। ইংলণ্ডের কথা বলে লাভ নেই। স্নান করতে হলে তিন পেনী দিতে হয়, ঠাণ্ডা জল কে গরম করে তাই

ব্যবহার করতে হয়, সকল বাড়িতে আবার বিজলি বাতির ব্যবস্থা নাই, গ্যাসের ব্যবস্থা নাই, গ্যাসের আলো ব্যবহার করতে হয়।

নিগ্রোরা এসব সুবিধা হতে বাদ যায় না। আমেরিকা হতে যেদিন আর্থিক এবং অন্যান্য হিসেবে বর্ণবৈষম্য লোপ হবে সেদিন আমেরিকা ডিমোক্রেটিক দেশ বলে যদি গর্ব করে তবে সে গর্বের মূল্য হবে।

চিকাগো শহর ছেড়ে আসার পর আমরা পথে তেমন কোন বড় শহর পাইনি। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে এসেই আমরা দেখতে পেয়েছি, প্রাইভেট হোটেল, ট্রেভেলারস্ হোটেল এবং কেবিন রয়েছে কিন্তু সল্ট লেক সিটি না পৌছান পর্যন্ত আমরা কোথাও রাত কাটাবার স্থান পাইনি। পথিকের জন্য এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোন সুবিধা হল না, যেহেতু আমাদের রং সাদা নয়। প্রত্যেকটি হোটেল, ইন্, ক্যাবিন্ যেন আমাদের বলছে 'এস না'। হয়তো আমি একাকী থাকলে কোন কষ্টই হত না, কারণ আমি সাদা লোকের মনাকর্ষণ সহজেই করতে পারতাম। কিন্তু এ যে সোনায় সোহাগা, তিনজনেই হিন্দু এবং তিনজনই একরংগা। একজনের অপমানে তিনজনকেই কষ্ট পেতে হচ্ছে। অপমান একলা নীরবে সহ্য করা যায়। কিন্তু পরিচিত লোকের সামনে তা অসহ্য হয়।

ক্রমাগত মোটর চালিয়ে আমরা সল্টলেক্ সিটিতে এসে বিশ্রাম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই বিশ্রামের তুলনা হয় না। একটানা বারঘণ্টা ঘুমিয়েও যেন ঘুমের শেষ হয়নি। ঘুম থেকে উঠে অপমানের কথা ভুলে গিয়ে মরুভূমির উপর হলিউডের ষ্টুডিও দেখতে গিয়েছিলাম। ষ্টুডিও দেখবার জন্যে বেশ লোক সমাগম হয়ে থাকে। ষ্টুডিওগুলিতে মরুভূমির চিত্র উঠাবার মত বন্দোবস্ত যা আছে, তা প্রচুর নয় বলেই

মনে হল—তবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়াতে মরুভূমির ছবি তুলবার আরও ভাল বন্দোবস্ত আছে।

সল্টলেকের পাশ দিয়ে বেশ সুন্দর পিচ্ দেওয়া পথ চলে গেছে। পথের পাশেই স্বচ্ছ জল সে জলের স্বাদ বড়ই তিক্ত যে কোন লোক গিয়ে সেখানে সাঁতার কাটতে পারে। জলে ডুবে যাবার ভয় মোটেই নাই। রাবণ হ্রদের জলে মানুষ ডোবে না শুনেছিলাম, কিন্তু তা দেখবার সুযোগ হয়নি। সল্টলেক্ দেখে বুঝলাম, বাস্তবিকই জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ রয়েছে, সেখানে লোক জলে ডুবে নীচে যেতে পারে না। আমি তিরিশ হাত জলের নীচ হতে ডুব দিয়ে মাটি উঠাতে পারি, কিন্তু এই হ্রদের জলে তিন হাত নীচে গেলেই দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়।

হ্রদের তীরে কোথাও একফুট, কোথাও অর্ধফুট উঁচু হয়ে লবণ পড়ে আছে। কিন্তু আমেরিকার লোক এখনও তত গরীব হয়নি যে এখান হতে লবণ উঠিয়ে সেই লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবে।

অনেকক্ষণ হ্রদে এবং হ্রদের তীরে অবস্থিত ষ্টুডিওগুলিতে ভ্রমণ করে আমরা সামনের পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হলাম। রকি এবং আন্দিজ পর্বতমালার নাম পৃথিবীতে সুপরিচিত। আমরা এই পর্বতমালার উপর দিয়ে চললাম।

আমেরিকাতে রকি এবং আন্দিজ পর্বতমালা দেখবার জন্য সবাই ব্যগ্র। এই পর্বতমালার ঢালুতে অবস্থিত হলিউড, লস্এন্জেলস্, সেনফ্রান্সিস্কো, সিয়েটেল প্রভৃতি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। পূর্ব দিকের লোক যখন কালিফরনিয়া দেখতে আসে তখন তাদের মস্তবড় একটা পর্বত পার হতে হয়, সেই পর্বতই রকি। আমি এবং মোহিতবাবু সেই পর্বতের উপর দিয়ে মোটরে করে চলছিলাম।

মোটর কারে বসেও কত উঁচুতে চলছি তা বুঝা যায় যদি একটি যন্ত্র থাকে। সেই যন্ত্রটি ছোট একটি ঘড়ির মতই তবে তা আমাদের কাছে ছিল না, তাই মনে হচ্ছিল মামুলী পাহাড়ে পথেই চলেছি। অনেক স্থানে আবার সমতল ভূমি। সেই সমতল ভূমিতে যে সকল উদ্ভিদ্ জন্মে তা দেখলে মন অপ্রসন্ন হয়। দেখতে মোটেই ইচ্ছা করে না। এরূপ সমতল ভূমি অনেকক্ষণ চলে আবার আমরা একটু পাহাড়ে স্থানে আসলাম। পাহাড়ের দুপাশে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামগুলিকে কেম্প বললেও চলে। লোকসংখ্যা কত তা গ্রামের বাইরে মস্ত একটা সাইন বোর্ডে লেখা থাকে। গ্রামে যদি দুজন লোকও এসে রাত্রে থাকে তবে বলা হয় গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়ল অথবা যদি কোন লোক গ্রাম হতে অন্যত্র যায় তবে বলা হয় গ্রামের লোকসংখ্যা কমল। প্রিমিটিভ ধরনে সেই গ্রামগুলি তৈরী করা হয়েছে। এমন কি কেবিন যাকে আমারা বলি তাও এর চেয়ে ভাল বললে দোষ হয় না।

আমরা একটি গ্রামে আসলাম। গ্রামের লোকসংখ্যা দুজন। আশা করেছিলাম এঁদের সংগে সাক্ষাৎ হলে একটু কথা বলব কিন্তু গ্রামের দুই জন বাসিন্দার কেউই তখন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না সেজন্য আমাদের শূন্য গ্রামেই বেড়াতে হয়েছিল। আমি বলেছি গ্রাম আদিম যুগের প্রথামতে প্রস্তুত। তার মানে এমন কিছু নয় যা নিয়ে আমরা বেশ হাসতে পারি। গ্রামে চারটি বাড়ি। দুটি বাড়ি তিন তলা আর একটি দু তলা অন্যটি এক তলা। প্রত্যেক বাড়ি কাঠের তৈরী। কাঠগুলি অর্ডার দিয়ে কেনা হয়নি। কাঠগুলি হয় পথ হতে কুড়িয়ে আনা হয়েছে নয়ত কোন কেবিন ভেংগে পড়েছিল যা হতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘরের অনেক স্থানে বেনজিনের টিন কেটেও লাগান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘরগুলি দেখলেই মনে হয়

কোন ভবঘুরের দল কোন এক সময়ে এখানে আড্ডা গেড়েছিল, তাদের পরিত্যক্ত জিনিষ দিয়ে ঘর কখানা তৈরী হয়েছে। সবচেয়ে বড় ঘরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দশ স্কোয়ার ফুটের বেশি নয়। প্রত্যেকটি তলা আবার সাত ফুটের বেশি উঁচু নয়। ঘরগুলি একই লাইনে অবস্থিত এবং চারটা ঘরের লোক যারা এসে বাস করেন তাদের জলের কোন ব্যবস্থা দেখলাম না। প্রত্যেকটি ঘরের পেছনে স্তূপাকৃতি পুরান টায়ার টিউব, দুধ, মাছ, মাংস, মাখন এসবের খালি টিন পড়ে রয়েছিল। আমেরিকার নগরে, শহরে এবং গ্রামে কেউ টিনের দুধ ব্যবহার করে না। কাগজের এক রকম বোতল হয় তাতেই দই, দুধ, ঘোল বিক্রি হয়ে থাকে। দুধের টিন দেখেই মনে হল, অনেক দূর হতে যারা আসে এবং নানা অসুবিধায় পতিত হয় তারাই এই গ্রামে থাকতে বাধ্য হয়। এরূপ গ্রাম বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, লোকজন নাই, জল নিশ্চয়ই কোথাও আছে নতুবা কেউ এসে এখানে থাকতে পারত না যদি বলি তবে ভুল হবে, কারণ এদিকে যেই আসে তারই সংগে কিছু জল থাকেই। গ্রামের কাছে জল না থাকলেও বৈজ্ঞানিক যুগে জলহীন গ্রামে মানুষ থাকতে পারে না তা নয়। তবে আমি জানতাম রকি পর্বতের উপর দিয়েই আমরা চলেছি। জল নিকটে কোথাও আছেই। আমরা গ্রাম পরিদর্শন করে গাড়িতে এসে বসলাম আর আমি ভাবতে লাগলাম আমেরিকার সিনেমার কথা। অনেকগুলি সিনেমায় দেখেছি এরূপ গ্রামের চিত্র এবং লোকসংখ্যা কমতি এবং বাড়তির সংবাদ।

দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সামনে আসছিল আর চলে যাচ্ছিল। তারপর আসছিল কালিফরনিয়ার দৃশ্য। সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা যেন একটা কচ্ছপের পিঠে ধীরে উঠে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে

যাচ্ছিলাম! কিন্তু তার পূবে একটি ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা হল আমাদের একমাত্র ড্রাইভার মিঃ মোহিত বাবুর ক্রমাগত ঘুম পাচ্ছিল আর হাত দুখানা অবশ হয়ে আসছিল। দুরাত্র দুদিন ক্রমাগত বেচারী মোটর চালিয়েছেন। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বুঝে নিন কালার বারের কত শক্তি। কোথাও রাত্র কাটাবার স্থান পাইনি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল স্বদেশের একটি ঘটনা। দেশের কথা বলতে মুখে বাধে। মুখে দেশের কথা আটকে যাবার দুটি কারণ। যাদের কথা বলতে যাচ্ছি তারা হয়ত অপমানিত হয়েছে বলে রাগ করবে, আর যাদের অন্যায় আচরণের কথা বলব তাদেরই স্বধর্মে আমি জন্মেছি। অতএব ভারতের অত্যাচারিত শ্রেণীর লোক তোমাদের কথা তোমরাই বল, আমি তোমাদের কথায় সায় দিব কিন্তু তোমরা যতদিন তোমাদের দুঃখের কথা না বলছ ততদিন আমি মনে করব তোমাদের দুঃখ বলতে কিছুই নাই। মহাত্মাগণ অপরের দুঃখে দুঃখিত হন, কিন্তু তোমরা এমনই স্তরে রয়েছো যে, তোমাদের দুঃখের কথা যদি তোমাদের স্বদেশবাসী বলে তবে তোমরা অপমান বোধ কর। অতএব এক্ষেত্রে আমি নীরব থাকাই পছন্দ করি।

আমরা একটি সুন্দর স্থানে এসেছি। তথায় একটি গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে তিনটি মাত্র স্ট্রীট। দুটি স্ট্রীট সমান্তরাল হয়ে এসে তৃতীয় স্ট্রীটে মিশেছে। গ্রামের স্ট্রীটে এস্‌ফাল্‌ত অথবা সিমেণ্ট করা নাই। গ্রেভেল দেওয়া পথের উপর ইট ভেংগে দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে খালি পায়েও হাঁটা যায়। গ্রামে একখানা ইহুদীর হোটেল ছিল। ইহুদী বড়ই সাহসী। সে এন্‌টিফেসিস্ট এবং কমিউনিষ্ট। কমিউনিষ্ট হলেই লোকগুলি একটু উগ্র, কর্মঠ এবং সাহসী হয়। সে আমাদের অনুরোধ এক কথায় মেনে নিল। সে বলল, মানুষ মানুষই, কালা ধলা বিচার্য

নয়। মিঃ হরিদাস মজুমদার হলেন কমিউনিষ্টদ্রোহী, তাঁর এ হোটেলে মন উঠছিল না, কিন্তু যারা তাঁরই মত জাতীয়তাবাদী তারা তাঁকে তাদের হোটেলে স্থান দেয়নি ভবিষ্যতেও দিবে না। তাঁর মতবাদ এখানে আমরা বজায় রাখতে পারলাম না। আমরা শুইতে চাই। তাঁর বিনা অনুমতিতেই হোটেলে গিয়ে উঠলাম এবং রেঁস্তোরাতে খেতে গেলাম। রেঁস্তোরার লোক খাদ্য বিক্রয় করল বটে কিন্তু একজন নয় বলল, "এরা নিশ্চয়ই কনিউনিষ্ট নতুবা কমিউনিষ্ট হোটেলে যাবে কেন?" মিঃ হরিদাস সে কথার প্রতিবাদ করলেন এবং বেশ উচ্চস্বরেই বললেন তিনি নেশনেলিষ্ট। আমি বললাম, "যারা কালারবার মানে না, শ্বেতকায় হয়ে অশ্বেতকায়দের রুম ভাড়া দেয় তারা বাস্তবিকই সৎলোক এবং নমস্য। আমি আমেরিকার কমিউনিস্টদের নমস্কার করছি।" মিঃ মজুমদার আমার প্রতি বেশ করে একটা কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমি তাঁকে ইংলিশেই বললাম, ভাগ্যে আজ আমরা কমিউনিষ্টদের হোটেলে উঠেছিলাম, তাই রাত্রে শোব এটা একরূপ নিশ্চয়ই, কিন্তু মিঃ হরিদাস গত দুরাত্রের কথা ভাবুন। একটুও ঘুম হয়নি, পা ব্যথা করছে আর আমাদের বন্ধুর শরীর অবশ হতে চলেছে। আমেরিকার যারা নেশনেলিষ্ট তারাই আমাদের এই দুর্দশার কারণ, এতক্ষণ ঘুরে কোথাও স্থান পাননি সে কথা কি এরই মাঝে ভুলে গেলেন? আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। কিছু খেয়ে নিন তারপর বিছানাতে গিয়ে শুতে হবে, বিছানা কি আরামের হবে, কেমন হাত পা ছড়িয়ে আমরা শুইতে পারব।" আমি যখন বিছানার কথা বলে লেকচার দিচ্ছিলাম তখন একজন আমেরিকান বললেন, "লোকটা কতই না অত্যাচারিত হয়েছে তাই বিছানার কথায়ই মত্ত, কত পরিশ্রান্ত হলে লোক এমন করে একই কথা বার বার

বলে ?" আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে আমরা বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা আমরা নব উদ্যমে পথে আসবার পূর্বে, হোটেল, ওয়ালাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আমি বললাম, বেঁচে থাক, সুখী হও। হোটেলওয়ালা আমাদের প্রত্যেকের সংগে করমর্দন করে বলে উঠল কালারবার ধ্বংস হউক। আমরাও তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করলাম। তারপর আমাদের ছোট মোটরকারও যেন কালারবার ধংস হউক কথার প্রতিধ্বনি করে পথে বেড়িয়ে পড়ল।

আমাদের দুদিকে আংগুরের সুন্দর সাজানো বাগান। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে আংগুরের বাগান অনেক দূরে চলে গেছে। আমাদের মোটরের তৈলের নলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ এরই মাঝে ঢালু শুরু হয়েছে।

দুদিকের সুন্দর দৃশ্য ক্রমেই অদৃশ্য হতে লাগল তারপর এল আঁকা-বাঁকা পথ। পথের দুদিকে সুন্দর শহর। শহরের লোক সবাই তখন কাজে ব্যস্ত ছিল। মাঝে মাঝে দুএকটা ঘরের ভিতরের দৃশ্য চোখে এসে পড়ছিল। আমেরিকার স্বাধীন রমণী যেমন স্বামীকে ধমকাতে পারে, কান ধরে ঘর হতে বার করে দিতে পারে তেমনি স্বামীকে সেবাও করতে পারে। স্ত্রী যদি শুধু ঘরের রাণী হয় এবং স্বামীর অন্তরের রাণী না হয় তবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক হয় না। সেরূপ সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে উভয় পক্ষেরই উভয় পক্ষের সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়ার দরকার। আমেরিকার স্বাধীন রমণীকে ঘর মুছতে, বৈগ্যানিক প্রথায় কাপড় কাচতে, এবং দরকার হলে পরিশ্রমের কাজও করতে হয়। তারপর যখন ধীরে নীচে নেমে আসছিলাম তখন দেখতে পেলাম নীল সমুদ্র নীল আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে।

প্রাচ্যের প্রশান্ত সাগর দেখা যাচ্ছে। একথাটি বলেই অনেক অবান্তর কথা টেনে আনতে পারতাম, কিন্তু আমার মত ও পথ পৃথক সেজন্য প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বিশেষভাবে বল্‌লাম না শুধু সেই দৃশ্যটি দেখে একটা আনন্দ মনে এসে দেখা দিয়েছিল। তারপর দেখলাম একটা প্রকাণ্ড সেতু। সেতুটি ট্রেজার আয়লেণ্ডের উপর দিয়ে চলেছে ফ্রিস্কোর দিকে। আমরা যখন সেতুর উপর এসে একটু দাঁড়ালাম তখন বাস্তবিকই এক অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। আমি ভাবছিলাম আজই আমার পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত হবে। বাস্তবিক সেইদিনই বিকাল বেলা আমার পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত হয়েছিল।

মিঃ মোহিত ঘোষ আমাকে ক্লে স্ট্রীট-এর কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার আপনার হোটেল আপনি ঠিক করে নিন।" কম করে পনেরোটি হোটেলে খোঁজাখুঁজির পরও কোথাও জায়গা পেলাম না। অগত্যা মিঃ মোহিত ঘোষের কাছেই ফিরব বলে স্থির করেছি, এমন সময় একজন লম্বা ধব্‌ধবে সাদা যুবক আমাকে জিগ্‌গাসা করলেন,—

"কি চাই আপনার ?"

"হোটেলে থাকবার জায়গা, কিন্তু এদেশে যে আমাদের জায়গা পাওয়াই মুস্কিল হয়ে উঠেছে।"

যুবক আমাকে বিনাবাক্যব্যয়ে একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন, নাম তার ইন্‌টারনেশনেল হোটেল। সে হোটেলের মালিক একজন ফরাসী ভদ্রলোক। আমার দেশ ও জাতির পরিচয় না জেনেই তিনি আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। মোহিতবাবুর কাছ থেকে আমার যথাসর্ব্বস্ব পুঁটলিটা এনে ঘরে রাখলাম। তারপর তাঁকে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। তিনি যাবেন শান্তিয়াগো।

শেষ